নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল

গবেষক

মোঃ আহমেদুল কবির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল

গবেষক

মোঃ আহমেদুল কবির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল

গবেষক

মোঃ আহমেদুল কবির

নিবন্ধন ক্রম : ৩৭/২০১৪-২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আহমেদুল কবির রচিত 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য জমা দেননি কিংবা কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

উপাচার্য
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ (ডেপুটেশন)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া যাচ্ছে যে, 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার একক রচনা। এই অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ আমি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য জমা দেইনি কিংবা কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি।

মোঃ আহমেদুল কবির

গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ
৩৭/২০১৪-২০১৫
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

চিত্রসূচি		॥ I–III
প্রসঙ্গকথা		॥ ১–৩
অবতরণিকা		॥ ৪–১৯
প্রথম অধ্যায়	: নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র	॥ ২০–১১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	: বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল	॥ ১১৩–২৩৬
২.১	প্রথম পরিচ্ছেদ : আতাউর রহমান	
২.২	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মামুনুর রশীদ	
২.৩	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লাকী ইনাম	
২.৪	চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসরাফিল শাহীন	
তৃতীয় অধ্যায়	: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা	॥ ২৩৭–২৮৬
উপসংহার		॥ ২৮৭–২৮৯
গ্রন্থপঞ্জি		॥ ২৯০–২৯৫
পরিশিষ্ট- ১	: চিত্রমালা	॥ ২৯৬–৩১৫
পরিশিষ্ট- ২	: প্রশ্নমালা	॥ ৩১৬–৩২১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

ছকচিত্র :

ফুল ফ্রন্ট ॥ ২৮
প্রোফাইল ॥ ২৯
থ্রি-কোয়ার্টার ॥ ২৯
পেছন-ফেরা ॥ ৩০
ছকচিত্রে স্থানিক পরিসর ॥ ৩১
ছকচিত্রে মঞ্চ বিভাগ ১ ॥ ৩১
ছকচিত্রে মঞ্চ বিভাগ ২ ॥ ৩২
ছকচিত্রে মঞ্চ বিভাগ ৩ ॥ ৩২
ছকচিত্রে মঞ্চ বিভাগ ৪ ॥ ৩৩
ছকচিত্রে মঞ্চ সমতল ॥ ৩৪
মঞ্চে দণ্ডায়মান অভিনেতা ॥ ৩৫
রেখাচিত্রে অভিনেতার অবস্থান ১ ॥ ৩৫
রেখাচিত্রে অভিনেতার অবস্থান ২ ॥ ৩৫
মঞ্চে বসা অবস্থায় চার অভিনেতা ॥ ৩৬
চারজন অভিনেতার রেখারূপ ॥ ৩৬
মঞ্চে বসা অবস্থায় তিনজন অভিনেতা ॥ ৩৬
তিনজন অভিনেতার ত্রিভুজ রেখারূপ ॥ ৩৬
মঞ্চ বিন্যাসে ত্রিভুজ রেখারূপ ১ ॥ ৩৭
মঞ্চ বিন্যাসে ত্রিভুজ রেখারূপ ২ ॥ ৩৭
ছকচিত্রে বৈপরীত্য ॥ ৩৮
ছকচিত্রে দৃঢ় অভিনেতা ১ ॥ ৩৯
ছকচিত্রে দৃঢ় অভিনেতা ২ ॥ ৩৯
ছকচিত্রে আলোর সাহায্যে অভিনেতার দৃঢ়তা ॥ ৪০
ছকচিত্রে অভিনেতার আনুক্রমিক সম্পর্ক ॥ ৪১
ছকচিত্রে একাধিক অভিনেতার দৃশ্যগত ঐক্যসূত্র ॥ ৪৩
রেখাচিত্রে অভিনেতার দৃশ্যগত ঐক্যসূত্র ॥ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ছকচিত্রে ভারসাম্য ১ ။ ৪৭

ছকচিত্রে ভারসাম্য ২ ။ ৪৭

ছকচিত্রে ভারসাম্য ৩ ။ ৪৭

দলগত অভিনেতার সাহায্যে ভারসাম্য ။ ৪৯

দ্রব্য-সামগ্রীর সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা ။ ৪৯

দ্রব্য-সামগ্রীর সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা ။ ৫০

দৃশ্যায়নে অভিনেতার অবস্থান ။ ৫৪

আলোকচিত্র :

বাংলার মাটি বাংলার জল–

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ ။ ২৪০
- পোস্টমাস্টার ও রতন ১ ။ ২৪১
- পোস্টমাস্টার ও রতন ২ ။ ২৪৩
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ ။ ২৪৩
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে সাধারণের সম্পর্ক ။ ২৪৪
- বৃদ্ধাকে সাহায্য করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ။ ২৪৫
- সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ী দোলনায় দোল খাচ্ছে ။ ২৪৬
- উচ্চতার অসামঞ্জস্য প্রয়োগ ။ ২৪৭
- নৌকার অসামঞ্জস্য ব্যবহার ။ ২৪৮
- পালকি ব্যবহারে অসামঞ্জস্য গভীরতা ။ ২৪৮
- একই রেখায় তিনজন অভিনেতার অবস্থান ။ ২৪৯

টার্গেট প্লাটুন–

- টার্গেট প্লাটুন নাটকে বিন্যাস ။ ২৫২
- দৃশ্যায়নে টার্গেট প্লাটুন ။ ২৫৩
- হানাদার এবং এদেশীয় দোসর ။ ২৫৪
- মেজর ও এদেশীয় দোসর ။ ২৫৪
- হানাদার বাহিনীর মেজর ။ ২৫৫

- চরিত্রের ছন্দ ॥ ২৫৭
- যুদ্ধের প্রস্তুতি ॥ ২৫৮
- যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নির্বাক অভিনয় ॥ ২৫৯
- বাবুর্চির হাঁটা ॥ ২৬০

বিদেহ–

- বিদেহ নাটকে হালিমা ও শান্তিকুমারী ॥ ২৬৪
- অভিনেত্রীদ্বয়ের সমান্তরাল বিন্যাস ॥ ২৬৫
- হালিমা ও শান্তিকুমারী ॥ ২৬৬
- ছন্দ ১ ॥ ২৬৮
- ছন্দ ২ ॥ ২৬৮
- আগন্তুকের চলন ॥ ২৬৯
- হালিমা ও শান্তিকুমারীর সংলাপহীন ক্রিয়া ॥ ২৭১
- আগন্তুকের অনুপ্রবেশ ॥ ২৭২

সিদ্ধান্ত–

- কম্পোজিশনে সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স ॥ ২৭৫
- অভিনেতার উচ্চতার ব্যবহার ॥ ২৭৫
- অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক প্রকাশভঙ্গি ॥ ২৭৬
- চরিত্রায়ণে ছন্দের প্রয়োগ ॥ ২৭৭
- সর্দার দাঁড়িয়ে এবং কুলিরা চালের বস্তা টানছে ॥ ২৭৮
- সর্দার ও কুলিগণ ॥ ২৭৯
- গান শুরুর পূর্বমুহূর্তে দুই অভিনেত্রী ॥ ২৮০
- উঁচু স্তরে দুই অভিনেত্রী গান শুরু করছেন ॥ ২৮০
- কমান্ডারগণের শক্তিশালী চলন ॥ ২৮১
- কমরেডের কৌণিক চলন ॥ ২৮২
- মৃতদেহের সামনে টুপি খুলে শ্রদ্ধা প্রকাশ ॥ ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যচর্চায় এ পর্যন্ত যে সকল গবেষক, সমালোচক, শিক্ষক, নির্দেশকসহ অন্যান্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যারা 'নির্দেশনা' বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রন্থ/প্রবন্ধ রচনা অথবা নাট্য নির্মাণ-বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ অবদান রেখেছেন 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' শীর্ষক এই গবেষণা তাঁদের উত্তরসূরি। পূর্বসূরিরা প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে 'নাট্য-নির্দেশনা' ও 'নির্দেশনা-কৌশল' প্রসঙ্গকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ঐ সকল মানুষের নাট্য ভাবনার সাথী হতে পেরে এবং তরুণ প্রজন্ম যাঁরা অবিরাম শ্রম আর মেধার বিনিময়ে নাট্যের চাকাটিকে নিয়ত প্রাণবন্ত রেখেছেন তাঁদের সহযাত্রী হতে পেরে পরম আনন্দ বোধ করছি। নাটক একটি মিশ্রশিল্প। তাই এই শিল্পের অংশ হিসেবে 'নাট্য-নির্দেশনা' বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা ও আবেগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নাট্যকলা' বিভাগের ছাত্রাবস্থা থেকেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাট্যকর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যায়ের নাট্যচর্চায়, প্রশিক্ষণে, পরিচালনায়, নাট্য-নির্দেশনায়, নাট্য-নির্মাণে, পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নির্দেশনা পদ্ধতিরই সর্বাধিক ব্যবহার ও চর্চা লক্ষ করি। কিন্তু আমাদের দেশের নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব 'কর্ম-কৌশল', 'পদ্ধতি' ও 'প্রক্রিয়া' সম্পর্কে কোথাও কোনো আলোচনা প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যায়ে গড়ে ওঠেনি। এই কারণে খুবই অস্বস্তি বোধ করি; কারণ পাঠাগারে এ বিষয়ে যে সমস্ত বই রয়েছে তার প্রায় সবই পাশ্চাত্যের 'পদ্ধতি' ও 'কৌশল' নির্ভর। এই অবস্থা থেকেই আমার বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নাট্য-নিদের্শকগণের নিজস্ব কোনো 'পদ্ধতি' বা 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'কৌশল' প্রয়োগে সক্ষম এমন কিছু 'পদ্ধতি' ও 'সূত্র' অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছি। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই অনুসন্ধান আকাঙ্ক্ষাকে সুনির্দিষ্ট করে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

গবেষণার শুরু থেকে শেষাবধি বিভিন্ন পর্যায়ক্রমগুলোর সুষ্ঠু সম্পাদনে একাধিক ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই আমি গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সফল হতে পেরেছি। এ জন্য প্রথমেই যাঁদের প্রতি আমার অন্তরের গহিন থেকে শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই তাঁরা হলেন আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের চারজন নাট্য-নির্দেশকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার কালে নির্দেশকগণ তাঁদের নাট্য-নির্দেশনার 'কর্মপন্থা', 'নির্দেশক' ও 'নির্দেশনা' বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে গবেষণার কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং অসীম ধৈর্য সহকারে

Dhaka University Institutional Repository

আলাপচারিতায় মত্ত হয়েছেন, যখন যা কিছু বুঝতে চেয়েছি, জানতে চেয়েছি বলেছেন নিঃশঙ্ক চিত্তে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি জমাদানের প্রাক্কালে আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের আমার শিক্ষক এবং সহকর্মীদের প্রতি। আমার এই গবেষণা বিষয়ে তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত মতামত, মন্তব্য, পরামর্শ আমাকে উত্তর উত্তর সমৃদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে শুরুতেই স্মরণ করতে চাই আমার শিক্ষক এবং নাট্যগুরু অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ ও অধ্যাপক ইসরাফিল শাহীনের প্রতি। কেননা তাঁদের ছাত্র না হলে এরকম দুরূহ কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারতাম কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকে। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার শিক্ষক ওয়াহিদা মল্লিক এবং রহমত আলীসহ তরুণ সহকর্মী সুদীপ চক্রবর্তী, আবুল বাশার, আশিকুর রহমান, শাহমান মৈশান, কাজী তামান্না হক, সাইদুর রহমান, আহসান খান, অমিত চৌধুরী প্রমুখ সকলের প্রতি, যাঁদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ এবং পরামর্শ আমাকে এই কাজে নিরবধি থাকতে সহায়তা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বন্ধুবর দ্রাবিড় সৈকত এবং মাসুম হাওলাদরের প্রতি যাঁরা গবেষণার জন্য চিত্রাঙ্কন করে আমাকে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভে বেশকিছু আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যা নির্বাচিত চারজন নির্দেশকের পরামর্শ এবং অনুমতিক্রমে বিভিন্ন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়। আর এইক্ষেত্রে যাঁরা আলোকচিত্রগুলো প্রদান করে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ক্ষেত্র-সমীক্ষা সম্পাদন পর্বে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এই পর্যায়ে আমি সস্নেহে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর এবং আমার প্রিয় মেধাবী ছাত্র তানভীর নাহিদের প্রতি। গবেষণা সহযোগী হিসেবে ক্ষেত্র-সমীক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে নাহিদ সাংগঠনিক বা কৌশলগত দায়িত্ব পালনেই কেবল আন্তরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার অনুসন্ধিৎসু চিন্তা, শিল্প-ভাবনা ও সম্ভাবনা যাচাই কার্যক্রমের একজন সৃজনশীল সহযাত্রী। তাঁর বিশেষ সক্রিয়তার কারণে গবেষণার পুরো সময়টাতে আমরা ক্রমাগতভাবে বিশ্লেষণী বাহাসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হই এবং এই অনুসন্ধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পথে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাই। এছাড়া থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের মেধাবী ছাত্র রামকৃষ্ণ সাহার প্রতি স্নেহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। রামকৃষ্ণ আমার গবেষণা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকারগ্রহণ, রেকর্ডিং, ভিডিও এবং ইমেজ-ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে কৌশলগত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ছিলেন। গবেষণার শুরু থেকে শেষাবধি বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ক্রমগুলোর সুষ্ঠু সম্পাদনে এই ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই আমি গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সফল হতে পেরেছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা না পেলে এ কাজটি করা প্রায় অসম্ভব হতো। গবেষণার কাজে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও এতদ্ সংশ্লিষ্ট নানারকম গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করতে মোটেও কার্পণ্য করেননি। থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উচ্চমান সহকারী জনাব ফজলুল হক ও সিনিয়র সুপারভাইজার জনাব মনোহর চন্দ্র দাস প্রমুখের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এইক্ষণে আমার সহধর্মিণী সুমাইয়া মনিকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই। যাঁর অসীম ধৈর্য আর ঈর্ষান্বিত ত্যাগের কল্যাণে আমি আমার গবেষণা কার্যক্রমের এই দীর্ঘ পথে একাগ্র থাকতে সক্ষম হয়েছি। তিনি পরিবারের সকল দায়িত্ব এবং জটিলতা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে গবেষণাকর্মে নিরবচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, তার তাগিদে অভিসন্দর্ভের কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বার বার তত্ত্বাবধায়কের শরণাপন্ন হয়েছি।

সবশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করতে চাই আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ স্যারের প্রতি। স্যারের মমতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সান্নিধ্যে গবেষণাকালীন সৃষ্ট সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর বিশ্লেষণী সাহচর্য, জ্ঞানতাত্ত্বিক উপদেশ আর সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং পদ্ধতিগত পরামর্শের ওপর ভিত্তি করেই আমি আমার গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের পথে অবিচল থেকে অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পাদনে সক্ষম হয়েছি। স্যারের প্রতি আজীবনের কৃতজ্ঞতা ও অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করতে পেরে আমি গর্বিত।

(মোঃ আহমেদুল কবির)

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চা নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যায়ে চর্চিত হয়ে সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছে। এর পেছনে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত এক শ্রেণির সংস্কৃতি-প্রেমী গবেষক এবং বিশেষজ্ঞের প্রদত্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বাঙলা নাট্যকলা 'লোক/দেশজ নাট্যে'র অনুষঙ্গ, বিষয়, আঙ্গিকের সাথে পাশ্চাত্য নির্ভর নাট্য-চিন্তা ও জ্ঞানের সেতুবন্ধ সুদৃঢ় হয়। এবং পরিবেশনামূলক সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গের আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নতুন এক ধরনের শিল্পরূপ ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এর মধ্যেই 'নাট্যকলা' বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নাট্যকর্মী হিসেবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত হই। নাট্যকর্মী হিসেবে যুক্ত হয়ে নাট্য-নির্দেশনা, নাট্য-কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ নাটকের বিভিন্ন কাজে আন্তরিকভাবে যুক্ত থেকেছি। এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন খ্যাতিমান নাট্য শিক্ষকের ক্লাসে এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়া খ্যাতিমান নাট্য-নির্দেশকের 'নির্দেশনা-কৌশল' পর্যবেক্ষণ করেছি। পর্যবেক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যায়ের নাট্যচর্চায়, প্রশিক্ষণে, পরিচালনায়, নাট্য-নির্দেশনায়, নাট্য- নির্মাণে, পঠন-পাঠন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নির্দেশনা পদ্ধতিগুলোই সর্বাধিক ব্যবহার ও চর্চা লক্ষ করি।

ঠিক তখনই নাট্যকর্মী হিসেবে আমি শূন্যতার মধ্যে পতিত হই এবং প্রশ্ন উত্থাপন করি তাহলে বাংলাদেশের নাট্য- নির্দেশকগণের নিজস্ব বা সৃজনশীন কোনো নাট্য-নির্দেশনা 'পদ্ধতি' বা 'কৌশল' কি নেই? না কি পাশ্চাত্য- নির্ভরতাই তাঁদের প্রধান অবলম্বন। নিজের এইরূপ মনোভঙ্গির বিপরীতে নিজেই নিজেকে পুনরায় প্রশ্ন করি যে– ইউরো-আমেরিকান নাট্য-নিদের্শনা পদ্ধতিগুলোর প্রায়োগিক উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা যদি প্রতিষ্ঠা পেয়েই থাকে, তবে এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কী যুক্তি থাকতে পারে? তাছাড়া এই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আদতে আমি কি পাশ্চাত্যের নির্দেশনা 'পদ্ধতি' ও 'কৌশলের' বিপরীতে অবস্থান করছি না? আসলে এই প্রশ্নের সরল উত্তর হচ্ছে – না। প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো 'পদ্ধতি' বা 'কৌশল' খারিজ করার নিমিত্তে নয় অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকে গৌণ গুরুত্বে প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে এই গবেষণা নয়। বরং বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নাট্য- নিদের্শকগণের নিজস্ব কোনো 'পদ্ধতি' বা 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'কৌশল' প্রয়োগে সক্ষম এমন কিছু পদ্ধতি অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হচ্ছে, যা কার্যত বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নব দিগন্ত সূচনা করতে পারে। আরও সহজ করে বললে যা দাঁড়ায় তা হলো– নাট্য-নিদের্শনায় 'পদ্ধতি' ও 'কৌশলের' দৈন্যদশা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার সূত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং পাশ্চাত্য অনুসৃত নাট্য-নির্দেশনার প্রক্রিয়ার সমান্তরালে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশকদের নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটি নতুন নির্দেশনা শৈলীর সৃষ্টি হোক। একজন সার্বক্ষণিক নাট্যকর্মী হিসেবে নাট্যচর্চার

সাথে দীর্ঘ পথ চলার এবং মহড়াকক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, কর্মশালার অংশগ্রহণ করে উপলব্ধি হলো– বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নাট্য-নির্দেশককের নিজস্ব নির্দেশনা 'কৌশল' ও 'পদ্ধতি'র অভাববোধ থেকেই বর্তমান গবেষণা সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ করি।

আধুনিক থিয়েটারে নির্দেশকের ভূমিকা অপরিসীম। একজন নির্দেশকের পরিচয় অন্তত আধুনিক নাট্যচর্চার অঙ্গনে আজ কারোই অজানা নয়। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা সবারই আছে। সামগ্রিক বিষয়কে সমন্বিত করে নাটককে সুষ্ঠু সম্পাদন তথা শৈল্পিক উৎকর্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়াই তাঁর মূল দায়িত্ব। এক কথায় তিনি হলেন দর্শকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চলমান, দৃশ্যমান, অভিনেয় নাটকটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যিনি নাটকের পাণ্ডুলিপি হৃদয়ঙ্গম করে, প্রয়োজনবোধে নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ কৌশলে দর্শককে একটি সফল প্রযোজনা উপহার দিতে প্রয়াসী হন। তাই সফল ও রসোত্তীর্ণ প্রযোজনার কৃতিত্ব অনেকখানি নির্দেশকের ভাগ্যে জুটে যায়, তেমনি অসফল প্রযোজনার দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়। চলচ্চিত্রশিল্পেও নির্দেশক বা পরিচালক সমভাবে প্রধান ব্যক্তি। বর্তমান থিয়েটারে নির্দেশক নামকরণে যে শিল্পীকে পাওয়া যায়, তার ধারণা ইউরোপ থেকেই প্রথম আসে। আঠারো শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনিশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় থিয়েটারে ব্যাপক পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়, যা ছিল মূলত অভিজাততন্ত্রের বৃত্ত থেকে বের করে থিয়েটারকে গণমানুষের নিকটবর্তী করার এক অপূর্ব প্রয়াস। এই পরিবর্তনকালে (ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকে) একজন ভিন্ন ব্যক্তিকে নাটক প্রযোজনায় নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সে সময়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অভিনয়সহ থিয়েটারের অন্য দিকগুলোকে পর্যবেক্ষণ, পরিশোধন ও সমন্বয়সাধন করা। বিংশ শতাব্দীতে নির্দেশক সত্তাটি আরো পরিশীলিত ও পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। এমনকি সমকালীন প্রযোজনার নান্দনিকতা ও সফলতা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও চিন্তা-চেতনার ফসল বলেই ধরা যায়। এক কথায় আধুনিক মঞ্চনাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সিংহভাগের দায়-দায়িত্ব নির্দেশকের। প্রত্যেক নির্দেশকই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও সৃজনশীল। এঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত নির্দেশনা পদ্ধতি ও প্রয়োগ-কৌশল থাকে যা বিচিত্র, অভিনব, অদ্ভুত, চমকপ্রদ ও মজার।

সমগ্র নাট্য-ইতিহাসে 'নির্দেশক'-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে 'করীজিয়াসকে'[১] পাওয়া যায়। এর অর্থ হতে পারে গ্রীক নাট্যকলায় কোরাসের প্রশিক্ষক। কোরাস প্রশিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র নৃত্যকৌশলের উৎকৃষ্ট সাধনই নয় বরং মূল ঘটনা, দেহ-ভঙ্গি, চলন, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়বস্তুও তাঁর আওতাভুক্ত ছিল। যখন যুদ্ধের সংলাপ উচ্চারিত হতো তখন যুদ্ধের ভাব ফুটিয়ে তুলতে হতো, আবার যখন কোনো দুঃখের পংক্তি আবৃত্তি হতো তখন নির্দেশককে নৃত্যকৌশলের মাধ্যমে ঐ ভাব ফুটিয়ে তুলতে হতো। যাতে হাজার দশেক দর্শকের অনুভূতিতে

[১]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 22।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ বোধ জাগ্রত হতে পারে। 'যদিও ধারণা করা হয়, সমগ্র দর্শক কোরাসের উচ্চারিত সব সংলাপ শুনতে পেত না। সেক্ষেত্রে করীজিয়াসকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হতো যাতে উচ্চারিত সংলাপ আরও নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার হয় এবং সংলাপে যেন ভাব প্রকাশ পায়।'[২] তার মানে গ্রীক নাট্যকলার সেই করীজিয়াসই হচ্ছে বর্তমান সময়ের 'নাট্য-নির্দেশক'।

তৎকালীন সময়ে করীজিয়াস নির্দিষ্ট কিছু বাচিক প্রশিক্ষণ বাদে মূল চরিত্র বা বক্তাকে নিয়ে কী প্রশিক্ষণ দিত সেটা অনেকটাই অনিশ্চিত। তবে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম সময়ের সাথে সাথে তৈরি হয়েছে, যেমন– 'রাজা মাঝ মঞ্চের বড় দরজা অতিক্রম করে প্রবেশ করবে এবং একটি বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে গুরুত্ব অর্জন করবে। অপেক্ষাকৃত প্রয়োগ-কৌশল থাকে যা বিচিত্র, অভিনব, অদ্ভূত, চমকপ্রদ ও মজার। কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পার্শ্ব থেকে প্রবেশ করে মুখ্য অভিনেতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করবে।'[৩] বাক্শক্তিহীন বা অপ্রধান চরিত্র সম্মুখ মঞ্চের পার্শ্ব থেকে প্রবেশ এবং বেশিরভাগ সময়ে সে অন্যান্য চরিত্রের পার্শ্বে অবস্থান করবে। নাটকের মূল দৃশ্যে তিন-চার জন অভিনেতা নিয়ে যে সমস্যা তা এক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা এবং ধ্বনি বা উচ্চারণের কারণে চলন ছিল অনেকটা স্থির। এমন কি উঁচু জুতো ও মুখোশ পরিহিত অভিনেতারাও মঞ্চে বেশি চলাচল করতে পারতেন না। মূলত তখন অভিনয় ছিল আবেগধর্মী এবং আবৃত্তিমূলক। 'ফরাসী ধ্রুপদী স্কুল বৈপ্লবিকভাবে নিজস্বতার উন্নয়ন ঘটায় 'স্বগতোক্তির' মাধ্যমে। তবে তাদের নির্দেশনা কেবলমাত্র বাচিক প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ততোদিন পর্যন্ত, যতদিন অভিনয়ের শক্তি সংলাপের অন্তর্গত ছিল।'[৪] এমনভাবে অভিনয় হতো যেন তারা গীতিনাট্য করছে।

যদিও গ্যাঁটে আরও বৃহত্তর বাস্তববাদকে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। গ্যাঁটের বাস্তববাদভিত্তিক নিজস্ব কিছু নিয়ম ছিল যা আধুনিক বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। যদিও সেই সময় বাস্তববাদ বিস্তার লাভ করেছিল এবং পর্যায়ক্রমে দুটি বেঞ্চের পরিবর্তে লক্ষ্য করা যায় একটি বেঞ্চ। 'সোফা মঞ্চের এক পার্শ্বে, একটি টেবিল, তিনটি চেয়ারসহ অপর পার্শ্বে।'[5] এই ধরনের হাস্যকর মঞ্চ-পরিকল্পনা শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। যখন গর্ডন ক্রেগ মঞ্চ, আলোক ও পোশাক পরিকল্পনা সম্পর্কে সামগ্রীকভাবে ভাবলেন তখন একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হলো নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে। থিয়েটারে একটা শৈল্পিক বাস্তবতায় রূপ নিল। ১৮৭৪ সালে যখন বার্লিন কোম্পানি 'দ্য ডিউক অফ স্যাকসি মেনজেন'[৬] উপস্থাপন করলো, তখন প্রথমবারের মতো সামগ্রিকভাবে থিয়েটারে প্রযোজনা 'কৌশল' প্রয়োগ হলো। তিনি এমন একটা পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন, যাতে একজন

---

২. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 23।
৩. Ibid, Page 23।
৪. Ibid, Page 23।
৫. Ibid, Page 23।
৬. Ibid, Page 24।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশক দৃশ্যায়ন, পোশাক ও আলোক পরিকল্পনা এবং অভিনেতাকে শৈল্পিক ঐক্যে রূপদান করলেন। বার্লিনসহ সারা ইউরোপ তখন এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করে।

গর্ডন ক্রেগ মূলত সমগ্র বিশ্বের প্রতীকরূপ থিয়েটারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাছে নির্দেশকই ছিল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। এমনকি নাট্যকারও নির্দেশকের অধীন। আর মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্রিয়াকর্মের সবকিছুই নির্দেশকের কল্পনা ও মেধার ভিত্তিতে নির্মিত হবে অর্থাৎ অভিনয় নির্দেশকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর দৃঢ়তা ও অতিরঞ্জন বিষয়াবলীর উপস্থাপন-প্রবণতা মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হবে। তিনি সিম্বলিক থিয়েটারের অসামঞ্জস্যতা উল্লেখ করে বলেন, থিয়েটারের জন্য থিয়েটার। পৃথিবীর দৈনন্দিন নিয়ম-কানুন এখানে অচল অর্থাৎ বাস্তবতা নয়, বরং প্রযোজনাশৈলীই হলো থিয়েটার কথাটি। তিনি অপিয়ার মতো মঞ্চ-পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রযোজনায় উইংস্, ফ্লাই, স্কাই প্রভৃতির নানান মাত্রিক ব্যবহার দেখা গেছে। নির্দেশনা সম্পর্কে যে আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে, তা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় আন্দ্রে আতোঁয়া এবং কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কির কর্মকাণ্ডে। পরবর্তীকালে আতোঁয়া এবং স্তানিস্লাভস্কির প্রভাব সারা ইউরোপে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতোঁয়া প্যারিসে তাঁর থিয়েটার লিবর-এ নব্য প্রকৃতিবাদ, সরলতা, বিশ্বাসযোগ্যতা আনয়ন করেন।

থিয়েটারের ধারাবাহিকতায় প্রযোজনা যখন সর্বোচ্চ উন্নয়নের দিকে যাচ্ছিল তখন অভিনেতা-অভিনেত্রী পূর্ব নিয়ম অনুসারেই অভিনয় করছিল। তারা যতই যোগ্যতার সাথে অভিনয় করুক, তা নাটকের মৌলিক মান উন্নয়নে সহায়তা করছিল না। অভিনয় ছিল প্রথাগত, চলন ছিল কৃত্রিম ও নাটকের মানও অর্থের বিপরীতে যাচ্ছিল। যেভাবে থিয়েটারের অন্যান্য উপাদান বা পরিকল্পনার উন্নয়ন হচ্ছিল সেভাবেই অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয়ের মাধ্যমে সেই মান ও ভাবকে ব্যবহারিকভাবে কার্যকর করাই তাদের লক্ষ হতে পারত। তাই নাটকের সম্পূর্ণ শৈল্পিকতাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য একজন সৃজনশীল নির্দেশক অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে নির্দেশক দৃশ্য পরিকল্পনাকারীর মতো একজন শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর উপাদান হতে পারে অভিনেতা-অভিনেত্রী আর স্থান হতে পারে ক্যানভাসের মতো। তাই নির্দেশক তাঁর দলকে সাজাতে পারেন শিল্পের মৌলিক উপাদান ও বিন্যাসের কথা ভেবে।

পাশ্চাত্য নাটকের ইতিহাসে মিশরের ওসিরিস প্যাশন প্লে, গ্রীক নাট্যকলায় কোরাসের প্রশিক্ষক থেকে দারিও ফো'র ইনভিজিবল থিয়েটার পর্যন্ত নির্দেশকের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকাল থেকে আইখারনেফ্রার্ত, থেসপিস, সফোক্লিস, ডিওক অব সেক্সমেনেন্জাইন, গর্ডন ক্রেইগ, পিসকাটার, এ্যাডলপ্ আপ্পিয়া, কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি, বার্টল্ট ব্রেখট, মায়ারহোল্ড, গ্রোটভস্কি, রবীন্দ্রনাথ, পিটার ব্রুক প্রমুখ বিশ্বনাট্য নির্দেশনার ইতিহাসে ভূমিকা রেখেছেন। অন্যদিকে একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসাবে নাট্য-নির্দেশনার ধারণা সেই

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে প্রচলিত। 'ভরত নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। অনুসন্ধান করলে প্রাথমিকযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ যথা– চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির আড়ালে একজন নির্দেশকের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।'[৭] সুতরাং পাশ্চাত্য নাট্য-নির্দেশনার ন্যায় প্রাচ্যেও যে নাট্য-নির্দেশনার সূত্র বিদ্যমান ছিল তা ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন থেকে উপলব্ধি করা যায়।

পাশ্চাত্য ধারার থিয়েটার বিকাশ লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা অঞ্চলের নাট্য-নির্দেশনার কাজটি হতো পালা বা পাঁচালি ভিত্তিক পরিবেশনার মূল গায়েন কর্তৃক। অর্থাৎ নাট্যাভিনয় পরিবেশনার প্রধান অভিনেতাই নির্দেশনার কর্মটি সম্পাদন করতেন। সে ক্ষেত্রে তিনি একাধারে পালা প্রণেতা, প্রধান অভিনেতা ও নির্দেশক। মধ্যযুগের বিভিন্ন পাঁচালি কাব্য থেকে প্রামাণ্য লভ্য যে, চৈতন্যদেব (আনু. ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত গুণাবলি সম্পন্ন ছিলেন। উল্লেখ, 'চৈতন্য জীবনী নির্ভর পাঁচালির গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস রচিত *শ্রীচৈতন্যভাগবত* (আনু. ১৫৪৪-১৫৫৫ খ্রি.) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* (আনু. ১৬১৫)-এ প্রাপ্ত তথ্য প্রামাণ্য লক্ষণ-এ আলোকে গবেষক চৈতন্যদেবকে একালের সতর্ক বিচারে আধুনিক নির্দেশকের পূর্বসূরি বলে অভিহিত করেছেন।'[৮] অবশ্য ঐতিহ্যবাহী বাঙলানাট্য অভিনয়রীতিতে আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনায় 'নির্দেশক' বা 'পরিচালক' শব্দ যেমন প্রচলিত ছিল না, তেমনি ছিল না পরিচালনার নিমিত্তে পৃথক কোনো ব্যক্তি। 'তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন নাট্যাঙ্গিক পরিবেশনায় স্থান-কাল ভেদে ওস্তাদ, গুরু, সূত্রধার, অধিকারী, মাস্টার, সঙমাস্টার, মোশনমাস্টার প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল প্রধান অভিনেতারূপী দলের মুখ্য ব্যক্তি সম্পর্কে।'[৯] স্মর্তব্য, ভারতবর্ষে তথা প্রাচ্যে প্রধানতম নাট্যবিজ্ঞান গ্রন্থ ভরত নাট্যশাস্ত্রে (খ্রি. ৪-৫ শতক) নাট্যাচার্য বা সূত্রধার অভিধায় যে সকল কর্মপরিধির নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই একালের নাট্য-নির্দেশকের কার্য। অর্থাৎ নাট্য-নির্দেশক সেকালে নাট্যাচার্য বা সূত্রধার রূপে বিদ্যমান ছিলেন। বর্তমানে নির্দেশক বলতে যে কর্ম পরিধি সম্বলিত চিত্র বা অস্তিত্ব ফুটে ওঠে মানসপটে, তা মূলত পাশ্চাত্য ধারার নাট্যচর্চার সুবাদে আবির্ভূত। 'বাঙলা নাট্য প্রযোজনায় নাট্য-নির্দেশনা প্রসঙ্গ বা নাট্য-নির্দেশকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে সন্ধান মেলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে। বলা হয়ে থাকে শিশির কুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) নির্দেশিত *সীতা* (১৯২৩) নাটকে প্রথম দেখা মেলে এদেশে নাট্য-নির্দেশকের।'[১০]

পাশ্চাত্য ধারার বাঙলা থিয়েটারের প্রথম নির্দেশকের মুকুট পরানো হয় শিশির কুমার ভাদুড়ীকে। 'তার নির্দেশনা কৌশল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও প্রযুক্ত করেন 'প্রয়োগনৈপুণ্য' প্রভৃতি বিশ্লেষণাত্মক শব্দাবলী। শম্ভু

---

[৭] মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১।

[৮] রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : ইছামতি প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৪১৮), পৃ. ১৩।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

মিত্রও তাঁকে 'বাংলাদেশের প্রথম প্রয়োগকর্তা' বলে অভিহীত করেছেন।'[১১] কিন্তু ঔপনিবেশিক চিন্তাজাত এদেশের মঞ্চ নাট্যচর্চায় অনেক গুণী নাট্যকার ও অভিনেতার আগমন ঘটলেও সৃজনশীল ও মৌলিক নন্দনভাবনা সম্পন্ন নাট্য-নির্দেশকের দেখা মেলেনি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) পূর্ব পর্যন্ত। 'নাট্য রচনা ও অভিনয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে প্রসেনিয়াম মঞ্চের ঘেরাটোপের বাস্তববাদ প্রভাবিত বাহুল্য সাজ-সজ্জা সম্বলিত থিয়েটারের চর্চা করলেও অভিজ্ঞতার এক পর্যায়ে এসে তিনি ইউরোপের বাহুল্যকে বর্জনপূর্বক কল্পনানির্ভর নিরাভরণ বাঙালির ঐতিহ্যবাহী মঞ্চায়ন কৌশল অবলম্বন করার স্বপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ ও জোরালো ভাষায় মত প্রকাশ পূর্বক নিজের অবস্থান স্থির করেন।'[১২] নাট্যরচনা (*শারদোৎসব, রাজা, মুক্তধারা, রক্তকরবী* প্রভৃতি), অভিনয়, নির্দেশনা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বাঙালির নিজস্ব নাট্যাঙ্গিকের সৃষ্টিশীল স্বরূপের পরিচয়টিও প্রামাণ্য হিসেবে প্রয়োগ করে গেছেন। তিনি তাঁর নাটকের চরিত্রদের *শারোদৎসব* মেলায়, *রাজা*-র বসন্তোৎসব, *অচলায়তনের* দর্ভকপল্লীতে, *মুক্তধারার* ঝর্ণতলে উপস্থিত করেছেন। পক্ষান্তরে অভিনয় ও দর্শকের সাথে নাট্যবিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহের 'অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুর' সম্মিলন ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি নাট্যের মহড়াসহ নাট্যাভিনয় উপস্থাপন করেছেন আমের বনে খোলা আকাশের নিচে। বলা হয়, 'রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব সামগ্রিকভাবে বিশ্বমুখীন অন্তরস্রোতে প্রাচ্য'। বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন, 'রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সকল প্রভাবকে স্বীকার করেও সমগ্র জীবনব্যাপী বাঙালির নাট্যসাধনার একটা যৌক্তিক আধুনিকতা দান করেছেন।'[১৩] বাঙলা থিয়েটারে নির্দেশক হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভু মিত্র প্রমুখের নামটিও উচ্চারিত হয়। এঁদের আবির্ভাবে বাঙলা নাট্য-নির্দেশনা নবদিগন্ত লাভ করে।

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের নাট্যচর্চা এবং নাটকের পদ্ধতিগত প্রয়োগরীতি, প্রকাশ ভঙ্গির ও নির্দেশনা পথিকৃত হলো 'ড্রামা সার্কেল' (১৯৫৬)[১৪]।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল নাট্যোৎসাহী ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই দলটি। দলের দুই প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়োগকর্তা মকসুদ উস্ সালেহীন ও বজলুল করিম-কে স্বীকৃতি দেয়া হয় বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক নাট্য-নির্দেশক হিসেবে। 'নিয়মিত পড়াশুনার মাধ্যমে দলের কর্মীদের বিশ্বনাট্য সম্পর্কে পরিচিত করা, পদ্ধতিগত অভিনয় প্রশিক্ষণ, মঞ্চপরিকল্পনা, পোশাক, আলোক, মেক-আপ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের অনুসরণে মহড়া পরিচালনা, নাট্য মঞ্চায়নে টীম ওয়ার্ক চেতনা প্রভৃতি এদেশের থিয়েটারে 'ড্রামা সার্কেল'-ই চালু করে প্রথম।'[১৫]

---

[১১] রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : ইছামতি প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৪১৮), পৃ. ১৫।

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[১৪] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮), পৃ. ১২৭।

[১৫] রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : ইছামতি প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৪১৮), পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য-নির্দেশনা একটি স্বতন্ত্র শিল্পসত্তা এবং নির্দেশকও একজন সৃজনশীল শিল্পী তিনিই প্রযোজনার প্রধান ব্যক্তি– এই মানসিকতা পূর্ণাঙ্গভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে। ‘ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, রফিকুল ইসলাম প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অন্যান্যের মধ্যে রামেন্দু মজুমদার, আবদুল্লাহ আল মামুন, নাজমুল হুদা, ফেরদৌসী মজুমদার প্রমুখের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার যে ধারা সূচিত হয়েছিল, আশির দশকের শুরুতে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে যেন সেই ধারায় নতুন পাল লেগেছে।’[১৬] মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা একদল তরুণ শিক্ষার্থী দেশগড়ার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করে নাট্যচর্চা। মঞ্চ ও নাটককে তাঁরা সংগ্রামের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর তখনকার নাট্য সম্পাদক মুক্তিযুদ্ধা ম. হামিদের নেতৃত্বে গঠিত হলো ‘নাট্যচক্র’ (১৯৭২)। সহপাঠী সেলিম আল দীন রচিত *এক্সপ্লেসিভ ও মূল সমস্যা* নাটক নির্দেশনার মাধ্যমে ম. হামিদ সূচনা ঘটান নবনাট্যচর্চার যাত্রা।’[১৭] উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, সেলিম আল দীন, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাইসুল ইসলাম আসাদ, সৈয়দ সালাহ্উদ্দিন জাকী, আল মনসুর, হাবিবুল হাসান, বাসন্তী গোমেজ প্রমুখ। ‘বলা যায় বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাট্য প্রযোজনায় উড্ডীন হয়েছিল বিজয়ের নতুন পতাকা। ব্যক্তি অপেক্ষা দলীয় অভিনয় ও কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। নাট্যদলকে একটি আদর্শিক জায়গা থেকে মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা করার মধ্যদিয়ে ‘নাট্যকর্মী’-এই পরিচয় প্রাধান্য এবং মর্যাদা লাভ করে।’[১৮] এদেশের থিয়েটার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে নির্দেশকের এবং প্রযোজনায় অধিক গুরুত্ব লাভ করে নির্দেশনাশৈলী। তাছাড়া এক ধরনের দায়বদ্ধতা বা ‘কমিটমেন্ট’ কাজ করে নাট্যকর্মীদের মাঝে। যার ফলে এদেশে সূচিত হয় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। এই আন্দোলন অল্প সময়েই স্থান করে নেয় এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সারিতে।

উপর্যুক্ত ধারার পাশাপাশি নাট্যচর্চার আরেকটি ধারাও বেগবান হয় স্বাধীনতার উত্তর এদেশের নাট্যচর্চায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় ছিলেন এমন বেশ কয়েকজন অগ্রজ নাট্যচর্চায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ সে সময় কলকাতার অনেক প্রযোজনা দেখেছেন। স্বাধীনতার পর স্বদেশে ফিরে তাঁরা ঐ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শুরু করেন নাট্যচর্চা। ‘কলকাতায় প্রবাসকালে সেখানকার গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত উচ্চমানসম্পন্ন বিবিধ নাট্যের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা কাউকে কাউকে একটি রুচি-দিশা দিয়েছিল।’[১৯] তাই তো কলকাতার কোনো কোনো নামকরা নাট্যদলের মতো এঁরাও ‘ভালো নাটক ভালোভাবে করবো’[২০]– এধরনের অভিপ্রায় নিয়ে নাট্য নির্মাণ শুরু করেন। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম নির্ভর তিন দেয়াল ঘেরা শোবার ঘর বা বৈঠকখানা ধরনের মঞ্চ

---

[১৬]. রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : ইছামতি প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৪১৮), পৃ. ১৭।
[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
[১৯]. ড. বিপ্লব বালা, *বাংলাদেশের নাগরিক থিয়েটার–অনেকান্ত অবলোকন* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫), পৃ. ১২-১৩।
[২০]. রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : ইছামতি প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৪১৮), পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কৌশল প্রাধান্য লাভ করে তাঁদের প্রযোজনায়। 'কোনো কোনো নির্দেশক-অভিনেতা বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথেই স্বীকার করেন কলকাতা কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার প্রেরণালব্ধ প্রযোজনা নির্মিতির কথা। রামেন্দু মজুমদার, আলী যাকের, আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ এ ধারার অন্যতম নির্দেশক-অভিনেতা।'[২১]

একজন নির্দেশকের নির্দেশনারীতি বা পদ্ধতি বলতে তাঁর মৌলিক বা সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন এবং তা প্রয়োগের ধারাবাহিকতার মধ্যে ঐ রীতির উদ্ভাসনকে বুঝায়। তিনি কেবলমাত্র কতগুলো দৃশ্যরূপই তৈরি করেন না বরং মঞ্চের সীমাকে দৃশ্যরূপ দ্বারা অবলুপ্ত করে দেন। ফলে, একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসও আয়োজনের মঞ্চে ঐ দৃশ্য অনিবার্যভাবে মঞ্চনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। 'নির্দেশক পাণ্ডুলিপির অন্তর্নিহিত যে চলমানতা তৈরি করেন তার একটি নৈয়ায়িক ও শৈল্পিক ভিত্তি থাকে। একজন প্রকৃত নির্দেশক তাঁর কর্মের মৌলিকত্ব দ্বারাই সংজ্ঞা-সূত্র স্থাপন করেন। তিনি কখনও প্রচলিত অর্থে পূর্বকৃত ও সংবিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা আবিষ্ট বা পরিচালিত হন না।'[২২] যে কেনো মৌলিক উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রচলিত রীতি বা পদ্ধতি বিবর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে এলে বিধিবদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে যে কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পীর নবপন্থা আবিষ্কার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

'বিশ্বনাটকের প্রাচীন প্রেক্ষিত ও বাঙলা নাটকের উৎস অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, সুপরিকল্পিতভাবে বা লিখিত কোন কাহিনি অবলম্বন করে নয় বরং দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন আর পরম বিশ্বাসের ভিত্তিতে পালিত আচার অনুষ্ঠান থেকে বাঙলা লোক/দেশজ নাট্যের কাহিনির উদ্ভাব ঘটেছে।'[২৩] এজন্য লৌকিক দেব-দেবী, যেমন– মনসা, চণ্ডী, মাকাল ঠাকুর, বুনোবাবা, ইতু ঠাকুর, বনদেবী, গাজী পীর, মানকি পীর, মাদার পীর প্রভৃতি লোক নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে বাঙলার বৈচিত্র্যপূর্ণ লৌকিক আচার, কৃত্য বা ব্রত অনুষ্ঠান যেমন– সেঁজুতি ব্রত, আশোকষষ্ঠ, সুবচনী ব্রত, মহররম প্রভৃতিকে বিষয়বস্তু করেও লোক/দেশজ নাট্য রচিত হয়েছে। 'কালের বিবর্তনে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারায় কিংবদন্তী, পুরাণ, উপকথা, ইতিহাসসহ সমকালের সামাজিক ও লৌকিক কাহিনিও দেশজ নাটক বা ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যে বিভিন্নভাবে স্থান করে নিয়েছে।'[২৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার পাশাপাশি বাঙালীর ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা ও নাট্যরীতি বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। 'এরই প্রভাবে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙলা বর্ণনাত্মক উপস্থাপনা শৈলী। কেউ কেউ একের পর এক লোক কাহিনি নির্ভর নাটক মঞ্চায়ন বা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশন করেছেন আবার কেউবা লোক/দেশজ নাট্যরীতিতে নতুন বিষয়ের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। কেউ

---

২১. রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : ইছামতি প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৪১৮), পৃ. ১৮।

২২. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে লোকজ উপাদান থেকে বাঙলা নাটকের ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকের পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছে।'[২৫] বাংলাদেশে সৈয়দ জামিল আহমেদ, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, আতাউর রহমান, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আলী যাকের, লাকী ইনাম, কামালউদ্দীন নীলু, তারিক আনাম খান, ইসরাফিল শাহীন-এর মতো নাট্য-নির্দেশকগণ পূর্বসূরিদের কর্মপন্থা অবলম্বন ও অনুসরণ করেই নবতর শিল্প সৃজনে ব্রতী হয়েছেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায়, বাংলাদেশের মঞ্চনাটক এখন নিয়মিতভাবে চর্চিত এক শিল্পমাধ্যম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ক্ষেত্রেই নির্দেশনা একটি ধারাবাহিক পদ্ধতিগত কাঠামো ধরে এগিয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নানামাত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশের মঞ্চনাটক। মঞ্চনাটক এক প্রবহমাণ স্রোতধারা। এই স্রোত-প্রবাহে নতুন-নতুন নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা, নাটকের নিয়মিত প্রদর্শনী, দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার অভ্যাস এসব প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। গ্রুপ-থিয়েটারের নানামাত্রিক উৎকর্ষের কারণে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এখন আকৃষ্ট হচ্ছে মঞ্চনাটকের দিকে। সর্বোপরি নাট্যকর্মীদের শ্রমকে স্বীকৃতি দিয়ে সচেতনভাবে এ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করছেন দর্শকেরা। নাট্যবোদ্ধা, দর্শক, সমালোচক সবাই মনে করেন বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে মঞ্চনাটক একটি বিশেষ অবস্থানে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশের মঞ্চনাটক একটি শক্তিশালী মিশ্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'নির্দেশনা-কৌশল'। অভিনয়, সংগীত, আলোক, চিত্র, মঞ্চ ও রূপসজ্জা প্রভৃতি বহু মাধ্যমের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি নাট্য-প্রযোজনা। মঞ্চনাটকের এই সমন্বিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ইতঃপূর্বে মঞ্চের নাটক, নির্দেশক, অভিনেতা, দর্শক, মঞ্চ, পোশাক ও আলোক-পরিকল্পকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ভূমিকা নিয়ে নানামাত্রায় গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু 'নাট্য-নির্দেশনা' তথা নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্রে'র আলোকে বাংলাদেশের মঞ্চনাটক সম্পর্কে, আমার জানা মতে, কোনো গবেষণা হয় নি।

প্রশ্ন আসতে পারে নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' কী? উত্তরে বলা যায় নাট্য-পরিচালনার কতগুলো মূল বিষয় সম্পর্কে ভাবনার ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় একমত এবং অভিন্ন উপায়ে কাজ করেন, স্বাতন্ত্র্য যা কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে নয়, মূল-মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে। মূল বিষয় অর্থে এই বলতে চাই যে– ধরা যাক, আলোর ব্যবহার, কোনো দৃশ্যের ভাব অনুযায়ী কোন রঙের আলো ফেলতে হবে সে-বিষয়ে ব্যক্তি ও দেশভেদে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এ সম্পর্কে সকলেই একমত যে, আলোর উৎসটাকে দর্শকের চোখের আড়ালে রাখতে হবে। তাই সব দেশে সবকালেই দর্শক-চক্ষুর অন্তরাল থেকে ফেলা হয় আলো। ফুট-লাইট ও হেড-লাইট দর্শকের দিকে

[২৫] মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ৩।

আড়াল করা হয়। নাট্য-পরিচালনার কতগুলি মূল-কৌশল সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ পরিচালকেরা অভিন্নভাবে কাজ করেন। সে-কৌশলগুলি আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা *Fundamentals of Play Directing* গ্রন্থে একত্র করে উপস্থাপন করেছেন। সেগুলো হলো– ১.'বিন্যাস' (কম্পোজিশন), ২.'দৃশ্যায়ন' (পিক্চারাইজেশন), ৩.'চলন' (মুভমেন্ট), ৪.'ছন্দ' (রিদম), এবং ৫.'নির্বাক অভিনয়' (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)। নির্দেশনার এই 'কলা-কৌশলে'র পাঁচটি সূত্র নাট্য-জগতের প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। এগুলোকেই বলা হয় নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র'। প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভে নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' ও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য 'চারজন' পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল আলোচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভে যে চারজন পরিচালকের 'নির্দেশনা-কৌশল' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হলো :

আতাউর রহমান : বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যশিক্ষক। আতাউর রহমান লন্ডন একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের মতো উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর বাইরেও তিনি একজন নাট্যকার, অনুবাদক এবং নাট্য-গবেষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো হলো– *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*, *ভেঁপুতে বেহাগ*, *মাইলপোস্ট*, *কবর দিয়ে দাও*, *সাজাহান*, *গণনায়ক*, *গোডোর প্রতীক্ষায়*, *গ্যালিলেও*, *ঈর্ষা*, *হিম্মতী মা*, *রক্তকরবী*, *অপেক্ষমান*, *বাংলার মাটি বাংলার জল* ইত্যাদি। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তক বলে বিবেচিত।

মামুনুর রশীদ : আরণ্যক নাট্যদলের প্রাণপুরুষ ও সমমনা সক্রিয় নাট্যদলগুলির প্রযোজনাভিত্তিক সমন্বয়ের পথিকৃৎ এক নাট্য-ব্যক্তিত্ব। তিনি মুক্তনাটক ও বাঙলা থিয়েটার–এর সংগঠক ও নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা। আরণ্যক নাট্যদলের প্রযোজিত অধিকাংশ নাটকের রচনা ও নির্দেশনা তাঁরই। 'নাটক হোক শ্রেণী সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার' মামুনুর রশীদ তথা আরণ্যক নাট্যদলের এটাই মৌল আদর্শ। এই আদর্শের ফলেই তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলো ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো হলো– *জয়জয়ন্তী*, *ওরা কদম আলি*, *ইবলিশ*, *নানকার পালা*, *রাঢ়াঙ*, *স্বপ্নপথিক*, *সংক্রান্তি*, *টার্গেট প্লাটুন*, *এবং বিদ্যাসাগর*, *গিনিপিগ*, *কন্যাপ্রকৃতি* ইত্যাদি।

লাকী ইনাম : নাগরিক নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রথম নারী সদস্য ও অন্যতম অভিনেত্রী। বেতার ও টেলিভিশনে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী হিসাবেও জনপ্রিয়। তাঁর রচিত বেতার নাটকের সংখ্যা প্রায় ৩০টি এবং টেলিভিশন নাটকের সংখ্যা ১৫টি। তাঁর নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো– *সরমা*, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, *স্বপ্ন*,

সুদূরে দিগন্ত, *সুলতানার স্বপ্ন*, *বিদেহ* ইত্যাদি। তিনি একাধিক প্রযোজনার পোষাক-পরিকল্পনা, আবহ সংগীত ও নৃত্য পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে তিনি নাগরিক নাট্যাঙ্গনের প্রধান সংগঠক।

ইসরাফিল শাহীন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। আরণ্যক নাট্যদলের নাট্যকর্মী হিসেবে তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয়। তিনি দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশের ও ভারতের পথনাটক বিষয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর 'নির্দেশনা-কৌশলে' নিজস্ব অভিনয় 'দক্ষতা' ও গ্রামপর্যায়ে মুক্তনাটক নিয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশিষ্ট এই নির্দেশক বাংলাদেশের নাট্য-পরিচালনায় নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হলো– *পুতুল খেলা*, *টুয়েলফথ নাইট*, *রোমিও এন্ড জুলিয়েট*, *ইদিপাস*, *উরুভঙ্গম*, *এ ডলস হাউজ*, *ওয়েটিং ফর গডো*, *ম্যাকবেথ*, *সিদ্ধান্ত* প্রভৃতি।

একটি নাট্য-প্রযোজনা কোনো তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তিমাত্র নয়। নাটক দর্শকের সম্মুখে মঞ্চস্থ হওয়া তাই শুধু মঞ্চকালীন নির্মাণও নয়। একটি নাটকের আত্মপ্রকাশের পূর্বে রয়েছে একটি ধারাবাহিক, লক্ষ্যাভিমুখী, পদ্ধতিগত, উদ্ভাবনাময় প্রক্রিয়ার নানা স্তর। আর এসব প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হলেন 'নাট্য-নির্দেশক'। নির্দেশক একটি নাট্য-প্রযোজনার বহুমুখী উদ্যোগের সৃজনশীল, সাংগঠনিক ও কারিগরি সকল দিককে কেন্দ্রীয় চিন্তায় সংহতিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ করেন। নাট্য-প্রযোজনার জন্য শৈল্পিক অভিলক্ষ্যের বাস্তবায়ন তথা অনুশীলন ঘটে 'নাট্য-নির্দেশনার' 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং এই প্রক্রিয়ার সৃজনশীল সমন্বয়ক, সংগঠক, উদ্ভাবক ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব হলেন 'নির্দেশক'।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চার শেকড় সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে লোক/দেশজ নাট্য আঙ্গিক নিয়ে বেশ পঠন-পাঠন, রীতি-পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং নাট্য-নির্মাণে বেশ কিছু 'তাত্ত্বিক নির্মিতি' নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই সুনির্দিষ্ট অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত এক শ্রেণির সংস্কৃতি-প্রেমী নাট্য-গবেষক এবং বিশেষজ্ঞের প্রদত্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় নাট্যকলা– 'লোক/দেশজ নাট্য' উপাদান, অনুষঙ্গ, বিষয়, আঙ্গিকের সাথে পাশ্চাত্যনির্ভর নাট্য-চিন্তা ও জ্ঞানের সেতুবন্ধ সুদৃঢ় হয় এবং পরিবেশনামূলক সাংস্কৃতিক উপাদান, অনুষঙ্গের আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নতুন এক ধরনের শিল্পরূপ ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে যা 'শেকড়সন্ধানী' নাটক, 'দেশজ নাট্যরীতি', 'বাঙলা নাট্যাঙ্গিক' প্রভৃতি একাধিক বিশেষণ ও তাত্ত্বিক বয়ানে পরিচিতি লাভ করে। বলা যায় শহরকেন্দ্রিক নাট্যে যুক্ত হওয়া নতুন এই প্রবণতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকার নাট্যচর্চায় ঔপনিবেশিক আনুকূল্যে সৃষ্ট কলকাতাকেন্দ্রিক পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অন্ধ 'অনুকরণ' প্রবণতার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে এক নতুন নাট্যভাষা নির্মাণ করেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বাঙালির শেকড়সন্ধানী নাট্যচর্চার গবেষণা

প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যায়ে ইতোমধ্যে বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে, যার প্রয়োগ বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় লক্ষ্যণীয়।

কিন্তু বিপরীতভাবে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় 'নাট্য-নির্দেশকে'র ভূমিকা, সৃজনশীলতা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সর্বোপরি নির্দেশক বিষয়ে গবেষণা দুস্প্রাপ্য। বাংলাদেশে অদ্যাবধি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিভিন্ন প্রয়োগশিল্পী অপ্রতুল পাশ্চাত্য পুস্তকের সহযোগে নিজস্ব ভাবন-চিন্তা কিংবা দীর্ঘদিনের ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে নাট্য-নির্দেশনার পথ সৃষ্টি করেছেন। ইতঃপূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের *থিয়েটার স্টাডিজ* পত্রিকায় অধ্যাপক রশীদ হারুন 'নির্দেশকের ব্যবহারিক কৌশল' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত করেছেন। এ লেখায় নির্দেশনার 'সূত্র' হিসেবে মাত্র পাঁচটি কৌশল অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি অধ্যাপক রশীদ হারুন *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা–নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি* শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেছেন। যেখানে সেলিম আল দীনের নাট্য-নির্দেশনা সর্ম্পকিত নন্দনভাষ্য এবং গুণকীর্তনই মুখ্য বিষয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের 'নাট্য-নির্দেশনা' বিষয়ে কোনো রূপরেখা অন্বেষণ সম্ভব নয়। মূলত এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রশীদ হারুন সেলিম আল দীনের প্রতি তাঁর গুরুদক্ষিণা নিবেদন করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যশিক্ষক আতাউর রহমান 'নাট্য-নির্দেশনা' বিষয়ে দুই-একটি লেখা লিখেছেন। যেমন– 'নাট্য প্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা' ও 'নাট্য নির্দেশনা ও আমার ধারণা' নামে। যেখানে আতাউর রহমান পাশ্চাত্য ধারণা নির্ভর নির্দেশকের দায়িত্ব-কর্তব্য, ভূমিকা ও নির্দেশক সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন করেছেন। ইতোপূর্বে কলকাতা থেকে বাংলা ভাষায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক 'নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকায় নির্দেশনার সূত্র হিসেবে মাত্র পাঁচটি কৌশলের বিষয় আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। এছাড়া কলকাতা থেকে বাংলা ভাষায় ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য রচিত 'নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা' শীর্ষক অন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে সাধন কুমার ভট্টাচার্য নাট্য বিষয়ে কিছু রচনার পাশাপাশি পাশ্চাত্য আদলে নাটক পরিচালনার পদ্ধতি ও নাট্য পরিচালনার পাঁচটি মৌল সূত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করেছেন। তাছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আফসার আহমদ-এর তত্ত্বাবধানে মোঃ আরশাদ হোসেন 'বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪ ইং'–শীর্ষক পিএইচ. ডি. গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ গবেষণায় মূলত মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চ, মঞ্চ উপকরণ ও নাট্য-নির্দেশনার ধারার পাশাপাশি বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের চার নির্দেশকের কর্মপদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশল তুলে ধরেছেন। এছড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুঃ মঈনউদ্দিন আহমেদ-এর তত্ত্বাবধানে এস, এম, ফারুক হোসাইন 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৭২-২০০০)'-শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা সমাপ্ত করেছেন। এই গবেষণায় গবেষক স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমি ও গ্রুপ থিয়েটার কার্যক্রম, নাট্য-নির্দেশনার পদ্ধতি, প্রস্তুতি ও নির্দেশকের ভূমিকা, বিভিন্ন ধারার নির্দেশনা ও নির্দেশক, সর্বোপরি নির্দেশকের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনাসহ সবকিছুই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে 'নাট্য-নির্দেশনা' বিষয়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা এবং নির্মাণ-বিনির্মাণের খতিয়ান। গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক এই সকল কর্মের মধ্যদিয়ে অধ্যাপক রশীদ হারুন 'নির্দেশকের ব্যবহারিক কৌশল' অর্থাৎ বিভিন্নকালের শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের প্রয়োগগত পদ্ধতির একটি সাধারণীকৃত কর্মসূত্র উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক 'নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র' শীর্ষক পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তভাবে নাট্য-নির্দেশনার 'কৌশল' বা কলা-কৌশলগুলি সাধারণ নিয়ম বলে সর্বত্রই স্বীকৃত 'পাঁচটি সূত্র' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক মোঃ আরশাদ হোসেন 'বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪ ইং'-শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য চার জন নাট্য-নির্দেশকের কর্মপদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল উঠে এসেছে। সুতরাং এই সকল উদ্যোগের মধ্যদিয়ে নিশ্চিতভাবেই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় 'নাট্য-নির্দেশনা'র বিষয়গুলোর সাথে স্বল্প পরিসরে হলেও ক্রম-পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সম্পাদিত এই সকল উদ্যোগ মধ্যদিয় নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' এবং নাট্য-নির্দেশকদের 'নির্দেশনা-কৌশল' তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এমনটা দাবি করা যায় না। ফলে সম্পাদিত সকল গবেষণাকর্মের মধ্যদিয়ে 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' গবেষণার গুরুত্ব ও চাহিদাকেও সময়ের দাবি করে তোলে।

নাটক একটি মিশ্রশিল্প। এ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে নাট্য-নির্দেশনা বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা ও আবেগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ছাত্রাবস্থা থেকেই। বর্তমানে শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলাদেশের একজন নাট্যকর্মী হিসেবে নির্দেশনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সবসময় অনুভব করছি। নির্দেশনা সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্তবোধের স্তরকে আরও উন্নত পরিশীলিত করাই এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সফল গবেষণা উৎসাহী নাট্য-কর্মীদের চেতনার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের রূপরেখা নির্ণয় করা ও পাশ্চাত্য নাট্য-নির্দেশনা অর্থাৎ নির্দেশনায় যে পঞ্চ-সূত্রের বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের ছাপ, তা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে তাও অনুসন্ধান করা হবে। এই পঞ্চ-সূত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের নাট্য-নির্দেশনায় বিশেষ করে নাট্য-নির্দেশকগণের শৈল্পিক নাট্যকর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খোঁজা হবে। এই গবেষণার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশকগণের নিজস্ব কর্ম-কৌশল ও পদ্ধতিরও পরিচয় পাওয়া যাবে। সর্বোপরি, এই গবেষণার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার নিজস্ব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের নাট্য-গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যশিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে– এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশে বর্তমান নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য চারজন নাট্য-নির্দেশকের নির্দেশনার 'কর্ম-কৌশল' অনুসন্ধান করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে। নির্বাচিত চারজন নাট্য-নির্দেশকের কর্ম-কৌশলের মধ্যে 'পঞ্চ-সূত্রে'র প্রয়োগ, তাঁদের নিজস্ব নাট্য-নির্দেশনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খোঁজা এবং এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক রূপায়ণ অনুসন্ধানই প্রস্তাবিত গবেষণার পরিধি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকর্মীরা নির্দেশনায় আগ্রহ প্রকাশ করছেন। সেই আগ্রহের কথা চিন্তা করে আমি অনুসন্ধান করতে চাই বাংলাদেশের খ্যাতিমান চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নাট্য-নির্দেশক কোন প্রক্রিয়ায় নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং তাঁদের 'নির্দেশনা-কৌশল'ই বা কী? এর ফলে তরুণ নাট্যকর্মীবৃন্দ, যাঁরা নির্দেশনায় আগ্রহী তাঁরা নাট্য-নির্দেশনার জন্য নির্দেশনা-কৌশল সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের চারজন নাট্য-পরিচালকের 'নির্দেশনা-পদ্ধতি', 'কৌশল' ও নেপথ্যে থাকা এই কুশীলবদের ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের কার্যকারিতা বিবেচনা করেই নাট্যশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' চিহ্নায়ন ও অনুসন্ধানই এই অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়। ভবিষ্যৎ নাট্য-নির্দেশকদের কর্ম ও ভাবনার পথকে অভিসন্দর্ভে প্রতিপাদ্য প্রামাণ্য আরো সুদৃঢ় ও সুগম করবে বলে বর্তমান গবেষকের বিশ্বাস।

বর্তমান গবেষণাটি নির্বাহের জন্য বিশ্লেষণাত্মক ও অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক সূত্রের ক্ষেত্রে প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নাট্য-নির্দেশকগণের নির্দেশিত নাটক দেখা, ধারণ করা এবং লিখিত বক্তব্য (সাক্ষাৎকার, জরিপ) সংগ্রহের মধ্যদিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজটি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা রচিত *Fundamentals of Play Directing* গ্রন্থের 'পঞ্চ-সূত্র' এবং বিভিন্ন নাট্য-নির্দেশক, নাট্যবোদ্ধা এবং গবেষকের রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহকে দ্বৈতীয়িকসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি গৃহীত পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রামাণ্যস্বরূপ অডিও, ভিডিও এবং স্থির চিত্র ধারণ করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচন এবং তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য 'ক্ষেত্র সমীক্ষণ পদ্ধতি' এবং 'সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি'র ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে দেশের শহরায়তনিক নাট্যচর্চায় ইতঃপূর্বে যে সব গবেষক/সমালোচক গবেষণামূলক কাজ করেছেন, তাঁদের গ্রন্থ/প্রবন্ধ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও নাট্যকলায় পাশ্চাত্য নির্ভর 'তত্ত্ব' ও প্রায়োগিক 'ডিসকোর্স' এবং 'তাত্ত্বিক নির্মিতি'সমূহ গবেষণায় প্রয়োগ হয়েছে পাশাপাশি এই বিষয়ে রচিত বিভিন্ন গবেষণা

গ্রন্থ এবং দেশি-বিদেশি পারফরম্যান্স জ্ঞানকাণ্ডীয় 'ডিসকোর্সে'র ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ।

এই গবেষণার বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এই যে– সংখ্যাগত দিক থেকে মাত্র চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নাট্য-নির্দেশককে অন্তর্ভুক্ত করা। কারণ এই নির্দেশকদের বাইরেও বাংলাদেশে অনেক খ্যাতিমান 'নাট্য-নির্দেশক' রয়েছেন। গবেষক হিসেবে এই চারজনকে বেছে নেয়ার কারণ যা ছিল তা হলো, উপর্যুক্ত চারজন নির্দেশকই বেশিরভাগ সময় প্রসেনিয়ামভিত্তিক নাট্য-নির্দেশনায় যুক্ত আছেন। যেহেতু বর্তমান গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র', বাংলাদেশের চারজন নির্দেশকের নাটকে ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেটি 'পঞ্চ-সূত্র' আলোকে পর্যবেক্ষণ সেহেতু প্রসেনিয়ামভিত্তিক নাট্য-নির্দেশক বেছে নিতে গিয়ে উপরোক্ত চার জন নির্দেশককে গবেষণার সুবিধার্থে নির্বাচন করেছি। এছাড়া এই গবেষণা প্রক্রিয়াটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিইচ. ডি. কোর্সের নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তাই সময়ের বন্ধনকেই এক অর্থে একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন প্রত্যেকেই খুব ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন তাই প্রত্যেককে যথাসময় পাওয়া ছিল গবেষণার জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতা। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা ব্যতীত অন্য একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে বাংলাদেশে নির্দেশনা বিষয়ে গবেষণা গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্তি।

'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' শীর্ষক বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভটি 'উপসংহার' ও 'পরিশিষ্ট' ব্যতীত মোট তিনটি অধ্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র'। নাট্য-পরিচালনার কতগুলি মূল-কৌশল সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ পরিচালকেরা অভিন্নভাবে কাজ করেন। সে-কৌশলগুলি আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা *Fundamentals of Play Directing* গ্রন্থে একত্র করে উপস্থাপন করেছেন। সেগুলো হলো– ১. 'বিন্যাস' (কম্পোজিশন), ২. 'দৃশ্যায়ন' (পিক্‌চারাইজেশন), ৩. 'চলন' (মুভমেন্ট), ৪. 'ছন্দ' (রিদম), এবং ৫. 'নির্বাক অভিনয়' (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)। নির্দেশনার এই কলা-কৌশলের পাঁচটি সূত্র নাট্য-জগতের প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। এগুলোকেই বলা হয় নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র'। সুতরাং 'পঞ্চ-সূত্র' সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ এ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল'। চারজন নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব 'কর্ম-কৌশল', 'পদ্ধতি' ও 'প্রক্রিয়া' সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানই বক্ষ্যমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই অধ্যায়ে যে চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা হলেন– আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম এবং ইসরাফিল শাহীন। নির্বাচিত

নাট্য-নির্দেশকের ‘নির্দেশনা-কৌশল’ বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তাঁদের নির্দেশনা শৈলী এবং তার আলোকে নির্দেশকদের নাট্য-নির্দেশনা ‘সূত্র’ ও ‘তত্ত্ব’ অনুসন্ধানের বিষয়টি অনুপুঙ্খভাবে অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত ‘পঞ্চ-সূত্রে’র মধ্য দিয়ে গবেষণার নাট্য-নির্দেশকগণের শৈল্পিক নাট্যকর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার নিজস্ব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা’। এই অধ্যায়ে নির্দেশনা কৌশলের ‘পঞ্চ-সূত্র’ ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের যে ছাপ, তা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে তা উক্ত গবেষণার চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নির্দেশকের চারটি প্রযোজনা সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার নিজস্ব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সর্বশেষে অর্থাৎ অভিসন্দর্ভের উপসংহার অংশে গবেষণার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনায় গবেষণা প্রশ্নের উত্তর প্রদান, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ গবেষণাক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র

বাংলাদেশের মঞ্চনাটক এখন নিয়মিতভাবে চর্চিত এক শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নানামাত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশের মঞ্চনাটক। মঞ্চনাটক এক প্রবহমাণ স্রোতধারা। এই স্রোত-প্রবাহে নতুন-নতুন নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা, নাটকের নিয়মিত প্রদর্শনী, দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার অভ্যাস– এসব প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। গ্রুপ-থিয়েটারের নানামাত্রিক উৎকর্ষের কারণে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এখন আকৃষ্ট হচ্ছে মঞ্চনাটকের দিকে। সর্বোপরি নাট্যকর্মীদের শ্রমকে স্বীকৃতি দিয়ে সচেতনভাবে এ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করছেন দর্শকেরা। নাট্যবোদ্ধা, দর্শক, সমালোচক সবাই মনে করেন বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে মঞ্চনাটক একটি বিশেষ অবস্থানে উপনীত হয়েছে– বাংলাদেশের মঞ্চনাটক একটি শক্তিশালী মিশ্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে।

নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে নির্দেশকের ভূমিকা অপরিসীম। এই ভূমিকা সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা সংশ্লিষ্ট সবারই আছে। সামগ্রিক বিষয়কে সমন্বিত করে মঞ্চনাটককে সুষ্ঠু সম্পাদন তথা শৈল্পিক উৎকর্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়াই তাঁর মূল দায়িত্ব। এক কথায় তিনি হলেন চলমান ও দৃশ্যমান অভিনেয় নাটকটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নাট্য-নির্দেশক নাটকের পাণ্ডুলিপি হৃদয়ঙ্গম করে, প্রয়োজনবোধে নিজস্ব উদ্ভাবনা-গুণে দর্শককে একটি সফল প্রযোজনা উপহার দিতে প্রয়াসী হন। তাই সফল ও রসোত্তীর্ণ প্রযোজনার কৃতীত্ব অনেকখানি নির্দেশকের ভাগ্যে জুটে যায়, তেমনি অসফল প্রযোজনার দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়। তারপরেও একটি নাট্য-প্রযোজনা কোনো তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তিমাত্র নয়। নাটক দর্শকের সম্মুখে মঞ্চস্থ হওয়া তাই শুধু মঞ্চকালীন নির্মাণও নয়। একটি নাটকের আত্মপ্রকাশের পূর্বে রয়েছে একটি ধারাবাহিক, লক্ষ্যাভিমুখী, পদ্ধতিগত, উদ্ভাবনাময় প্রক্রিয়ার নানা স্তর। আর এসব প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হলেন নাট্য-নির্দেশক। নির্দেশক একটি নাট্য-প্রযোজনার বহুমুখী উদ্যোগের সৃজনশীল, সাংগঠনিক ও কারিগরি সকল দিককে কেন্দ্রীয় চিন্তায় সংহতিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ করেন। নাট্য-প্রযোজনার জন্য শৈল্পিক অভিলক্ষ্যের বাস্তবায়ন তথা অনুশীলন ঘটে নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহারের মধ্যদিয়ে এবং এই প্রক্রিয়ার সৃজনশীল সমন্বয়ক, সংগঠক, উদ্ভাবক ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব হলেন নির্দেশক। কিন্তু বাংলাদেশের মঞ্চনাটককে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইতঃপূর্বে মঞ্চের নাটক, নির্দেশক, অভিনেতা, দর্শক, মঞ্চ, পোশাক ও আলোক-পরিকল্পকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ভূমিকা নিয়ে নানামাত্রায় গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু নাট্য-নির্দেশনা তথা নির্দেশনার

'পঞ্চ-সূত্রে'র আলোকে বাংলাদেশের মঞ্চনাটক সম্পর্কে জানামতে, কোনো গবেষণা হয় নি। যেহেতু প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভটিতে নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' ও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল আলোচিত হবে। তাই বক্ষ্যমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চ-সূত্র কাকে বলে?

নির্দেশকের নাটক করা বা 'নাট্য-নির্দেশনা' মানে, পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা আছে মঞ্চে জীবন্তভাবে তা প্রদর্শন করতে হবে। একটি গল্প আছে– 'রাজা বিক্রমাদিত্য একটুকরো চকখড়ি পেয়েছিলেন, তা দিয়ে তিনি মেঝের ওপর ছবি আঁকতেন, আঁকার কিছুক্ষণ পরেই ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে মেঝেতে চলা ফেরা করতো।'[১] পাণ্ডুলিপিতে লেখা নাটকের ঘটনাও চরিত্রকে মঞ্চে জীবন্ত করে তোলার ব্যাপারটা অনেকটা তাই। গল্পের রাজা অনেক কিছু করতে পারে। সত্যিকারের রাজা তা পারে না। বিক্রমাদিত্যের ছবি সহজেই জীবন্ত হয়ে উঠতো, কিন্তু সত্যিকারের নাটক সহজেই মঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। তাকে জীবন্ত করে তুলতে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাস্তব চেষ্টায়। তার জন্য মানুষকে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। এই কাজকে সৃষ্টির কাজ বলা হয়। এ ধরনের কাজ এলোমেলোভাবে হতে পারে না। তার জন্য রীতিমতো একটা 'পরিকল্পনা' ও 'প্রক্রিয়া' চাই। একটা বাড়ি বানাবার আগে যেমন কাগজে নক্সা এঁকে নিতে হয় তেমনি সংঘবদ্ধভাবে এই সৃষ্টিকর্মের আগেও একটি 'পরিকল্পনা' চাই। তাই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার জন্য কাজটাকে সুষ্টুভাবে পরিচালনা করা দরকার। এই পরিচালনাকেই– 'নাট্য-নির্দেশনা' বলা হয়। অনেকে মিলে যখন কোনো কাজ করে তখন একজন নেতার দরকার হয়। যুদ্ধ অথবা খেলা পরিচালনা করতে হলে যেমন একজন সেনাপতি চাই, তেমনি নাট্য-পরিচালনার জন্যও একজন 'নাট্য-নির্দেশক' দরকার। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের মন্তব্য :

> নাট্যকার এবং নাট্য-নির্দেশকের মধ্যে পার্থক্যটা তাহলে কী? সাধারণত নাট্য প্রয়োগ বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, নাট্যকার যেখানে 'সাবজেকটিভ' নির্দেশক সেখানে 'অবজেকটিভ'। এই 'সাবজেকটিভ' 'অবজেকটিভ' কথা দুটির কথ্য বাংলা করা খুব কঠিন। তবে বলা যায় নাট্যকারের কাজ ভাব নিয়ে অন্যদিকে নির্দেশকের কাজ বস্তু নিয়ে। নাট্যকার নাটকে যে ভাবনাটা লিখে প্রকাশ করলেন, নির্দেশককে সেই ভাবনাটাকে অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চ, দৃশ্য, আলোক, মেক-আপ, সংগীত, দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি দ্বারা দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হয়।[২]

---

[১]. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৬।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

সুতরাং এক একটা ক্ষেত্রে দেখা যায় নাট্যকারের চেয়ে নির্দেশকের কাজটা আরো কঠিন হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো নাটকে নাট্যকার লিখেছেন– সতেরো বছর পরে, হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা 'আনন্দ-বেদনায়' অধীর হয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললেন– খোকা। নাট্যকার তো লিখেই ক্ষান্তি, লেখার মধ্য দিয়ে দৃশ্যের ভাবটা বোঝা যাচ্ছে। এখানে নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি হচ্ছে। তবে সমস্যা হলো ঠিক ভাবটিকে মঞ্চে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশক কী করবেন? ছেলেকে দেখে মা দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে ধরা গলায় বলেন–'খোকা'। তাহলে মার বেদনাটা প্রকাশ পেল। কিন্তু নাট্যকার লিখেছেন আনন্দ-বেদনা। 'আনন্দ-বেদনা' লিখে ফেলা সহজ, দেখানো খুব কঠিন। সতর্ক অভিজ্ঞ নির্দেশক হলে তিনি প্রথমে মায়ের মনটা বিশ্লেষণ করবেন। 'বিশ্লেষেণে ধরা পড়বে মায়ের মনের অবস্থা– প্রথমত সতেরো বছর আগের হারানো ছেলেকে হঠাৎ সামনে দেখে– প্রথমে তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তার সমস্ত বোধশক্তি যেন সহসা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত কিছুক্ষণ পরে সেই স্তম্ভিত মুহূর্তের বরফ ভেঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে, সঙ্গে-সঙ্গে তার বিগত দিনের সকল দুঃখ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। তৃতীয়ত এক পশলা বৃষ্টির পরে যেমন আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয় তেমনি কান্নার মধ্যদিয়ে দুঃখের প্রাথমিক আবেগ খানিকটা শান্ত হলে এইবার ফিরে পাওয়ার আনন্দটা তিনি অনুভব করছেন।'[৩] এইভাবে বিশ্লেষণ করলে মঞ্চে কীভাবে মুহূর্তটি সৃষ্টি করা যেতে পারে তার বেশ কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিশ্লেষণ থেকে এর মঞ্চরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে এভাবে :

ক. প্রথমে মা স্বাভাবিক গতিতে চলতে-চলতে হঠাৎ ছেলেকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে বিস্ময় মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যেন– স্ট্যাচু।

খ. অস্ফুট কণ্ঠে বললেন– খোকা ! তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

গ. নিঃশব্দ কান্না। এবার খোকার মাথা, পিঠ, চুল সর্বত্র তীব্র আবেগে হাত বুলিয়ে অনুভব করতে লাগলেন– হ্যাঁ এই তো আমার সেই খোকা, এই তো তাকে স্পর্শ করতে পারছি, এ স্বপ্ন নয়– খোকা, খোকা।

ঘ. মার চোখ থেকে জলের ধারা নামছে, আলো চিক-চিক করছে কিন্তু ঠোঁটে ফুটে উঠেছে এক স্নিগ্ধ হাসি। একই সঙ্গে কান্না ও হাসির এই প্রবাহ নাট্যকারের 'আনন্দ-বেদনা' কথাটিকে বাস্তব দৃশ্যগ্রাহ্য সত্যে পরিণত করবে।[৪]

এই দৃশ্যের মধ্যে যে নাট্য মুহূর্ত রয়েছে– উপরোক্তভাবে তার অভিনয়াংশ ঠিক করার পরে এর সঙ্গে মঞ্চ, আলোক, পোশাক, মেক-আপ ও সংগীত যুক্ত করে মুহূর্তটিকে আরো তীব্র করে তোলা সম্ভব। অভিনয়,

---

[৩] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৬-৭।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

আলোক, সংগীত ইত্যাদি'র সঙ্গে ঠিক করতে হবে মঞ্চে কোন স্থানে কীভাবে মা ও ছেলে দাঁড়ালে দর্শকের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হবে, সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে, কী ভঙ্গিতে দাঁড়ালে দৃশ্যের ভাবটি সবচেয়ে ভালোভাবে এবং সুন্দরভাবে প্রকাশিত হবে। কাজেই এই সামান্য একটি দৃশ্যাংশের উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, 'নির্দেশকে'র কাজটা এক-এক সময় কতো কঠিন হয়ে ওঠে। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে নির্দেশককে নাট্য-বিশ্লেষণ করতে হয়। তাকে জানতে হবে নাটক দেখা ও শোনার বিষয়, অর্থাৎ নাটকের আরেক নাম হচ্ছে 'দৃশ্যকাব্য'– তাতে দৃশ্যটা দেখার বিষয় আর কাব্যটা শোনার, শোনানোর ব্যাপারটা নিয়েও যেমন নির্দেশককে ভাবতে হবে, দেখানোর দিকটাও তেমনি ভাবতে হবে।

এই সূক্ষ্ম শিল্পের ব্যাপারটি নির্ভর করছে নির্দেশকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত গুণাগুণের ওপর। কোন দৃশ্যে কীভাবে কী করতে হবে তার তো কোনো বাঁধাধরা ছক নেই, যে নির্দেশক তার সৃজনশীলতা বলে এগুলি আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে পারবেন তিনিই সফল হবেন। যার প্রতিভা নেই তার দ্বারা কিছুই হবে না। কারণ এ কাজ শেখানো যায় না। কিন্তু সত্যি কি তাই?

না ওপরের কথাটি অর্ধেক সত্য অর্ধেক সত্য নয়। একথা সত্য যে নির্দেশকের শিল্পবোধটাই বড় কথা। কিন্তু এতে শেখার কিছু নেই তা সত্য নয়। সারা পৃথিবীর নাট্যজগৎ ঘেটে দেখা গেছে– নাট্য-নির্দেশনার কতগুলি মূল বিষয় সম্পর্কে অনেক চিন্তা ভাবনায় সকলেই প্রায় একমত এবং সকলেই প্রায় একই রকমভাবে কাজ করেন, খুঁটিনাটি বিষয়ে নয়, মূল-মূল বিষয়ে। মূল বিষয় অর্থে ধরা যাক– আলোর ব্যবহার, কোন দৃশ্যের ভাব অনুযায়ী কোন রঙের আলো ফেলতে হবে সে-বিষয়ে ব্যক্তি ও দেশভেদে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এ সম্পর্কে সকলেই এক মত যে, আলোর উৎসটাকে দর্শকের চোখের আড়ালে রাখতে হবে। তাই সব দেশে সব কালেই দর্শক-চক্ষুর অন্তরাল থেকে ফেলা হয় আলো। ফুট-লাইট ও হেড-লাইট দর্শকদের দিকে আড়াল করা হয়।

দেখা গেছে– দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য ইত্যাদির দৃশ্যে সকলেই সাধারণত নীল বা এই ধরনের স্তিমিত আলো ব্যবহার করে। প্রায় কেউই সাধারণত বেদনার দৃশ্যে গোলাপি আলো ফেলেন না। 'সাধারণত' কথাটা বলার কারণ হলো, কোনো প্রতিভাবান নির্দেশক হয়তো এই গোলাপি আলোতেই এমন বেদনা ফুটিয়ে দিতে পারেন যা দশটা নীল আলোতেও আরেকজন পারছেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– 'অন্ধকার ঘরে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী তলোয়ার নিয়ে লড়াই করছে। দৃশ্যটি অভিনেতা-অভিনেত্রী অতি উজ্জ্বল ফ্লাড লাইটে দেখান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দর্শকের মনে হয় যেন সত্যিই ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুধু অনুমান করেই শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার

চালানো হচ্ছে।'[৫] এটা সম্ভব। এটা বিশেষ প্রতিভার মৌলিক সৃষ্টি। কিন্তু এটা বলা যায় না যে, এটাই জগৎ জোড়া সর্বত্র প্রচলিত। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং এই নাট্য-নির্দেশনার মূল যে কতগুলি 'কৌশল' ও 'প্রক্রিয়া' সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্রই বড়-বড় নির্দেশকেরা মোটামুটি একই ভাবে ভেবে গেছেন। সেই কৌশলগুলি একত্র করে দেখা গেছে, এমন 'কৌশল' ও 'প্রক্রিয়া' যা চেষ্টায় শেখা যায়।

তবে অনেকে এই শিক্ষণ-প্রশিক্ষণটাকে বিশেষত ভালো নজরে দেখে না, তাঁরা প্রথম থেকে নিজস্ব উদ্ভাবনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। কিন্তু এর ফলে অযথা বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন নতুন নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ করে দেখা গেল নাটক শেষ হবার পূর্বেই কোনো এক দৃশ্যে নাটক শেষ হয়ে গেছে ভেবে দর্শকরা উঠে পড়ছে। তখন দু-একদিন নাটক মঞ্চস্থ করা বন্ধ করে আবার ভাবনা-চিন্তা শুরু হলো, শেষে ঠিক হলো, যে দৃশ্যে দর্শক উঠে পড়ে তারপর থেকে বাকী নাটকটা কেটে বাদ দিতে হবে। এই ভেবে শেষ দিকে নাটকের বেশ খানিকটা কেটে বাদ দেয়া হলো। এবার মঞ্চস্থ করে দেখাগেল যে আরেক নতুন সমস্যা, এখন নাটক শেষ হবার পরেও দর্শক বসে থাকে, ভাবে আরো আছে। এই দেখে পরের বারে নাটকের শেষ দিকে যেটুকু কেটে বাদ দেয়া হয়েছিল, তার থেকে আরো কয়েকটি সংলাপ ও নাট্যক্রিয়া আবার নাটকে জুড়ে দেয়া হলো। দেখা গেল এইবারে ঠিক হয়েছে, যথাস্থানে হাততালি দিয়ে দর্শকরা উঠে যাচ্ছে।

উপর্যুক্ত উদাহরণ অনুসারে অনেক ভাঙ্গাচূরা করে শেষে যে সাফল্য লাভ হলো এটা নিশ্চয়ই প্রশংসার বিষয় এবং নিঃসন্দেহে নির্দেশকের গুণেরই পরিচায়ক। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে, যদি নাটকটি মঞ্চস্থ করার পূর্বে নাট্য-রচনা, প্রয়োগ-প্রক্রিয়া এবং কৌশল সম্পর্কে কিছু প্রামাণ্য বই-পত্র পড়ে শিখে চেষ্টা করা হতো তবে দেখা যেত এতো কাটাকুটি করে এতো সময় ব্যয় করে যে জায়গায় পৌঁছা গেল বিশ্বের নাট্যবিশারদরা অনেক আগেই এ সমস্যার সমাধান বাতলে গিয়েছেন। নির্দেশক যদি জানতেন যে প্রত্যেক নাটকেই একটা দৃশ্য থাকে তার নাম 'অবলিগেটরী সিন'[৬] এবং সেই সিন বা দৃশ্যটি প্রথমেই খুঁজে নিতে হয় নাটক বিশ্লেষণ করে, তবে এই সময়টা বেঁচে যেত।

তাছাড়া অবশেষে যে সাফল্য আসল এই রকম সাফল্য অর্জন দুভাবে হতে পারে– এক সঠিকভাবে বিষয়টার কারণ ধরতে পারা, আর এক হতে পারে এদিক সেদিক করতে-করতে হঠাৎ ঠিক হয়ে যাওয়া কিন্তু কেনো ঠিক হলো তা নির্দেশকের কাছে এখনো ধরা পড়ে নি। যেমন, 'আমরা বাড়ীতে রেডিও মেরামত করি– রেডিও আওয়াজ দিচ্ছে না, তো ডালা খুলে এদিক-ওদিক ঠুকতে ঠুকতে একসময় হঠাৎ রেডিওটা বেজে উঠল। এও তাই। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় যদি নির্দেশকের সাফল্য আসে তবে বিপদ এই যে, পরের বারে অন্য আর একটি

---

৫. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৮।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

নাটকে যদি এই সমস্যা দেখা দেয় তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন না যে এবারও আগের মতোই সাফল্যলাভ হবে।'[৭]

অথচ এ বিষয়ে পড়া শোনা করলে নির্দেশক যেনে যেত যে, সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, নাটক তার শুরুতে দর্শকের মনে একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। পরে যে দৃশ্যে দর্শকের এই প্রত্যাশ্যা পূরণ হয় সেটিই শেষ 'অবলিগেটারী সিন'। ধরা যাক একটি নাটকে দেখা গেলো– পুলিশ প্রশাসন ঠিকমতো কাজ করে না এই অভিযোগে স্থানীয় থানার একজন সৎ পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করা হলো। অফিসার যে সৎ এটা দর্শক ঠিক মতো বুঝতে পারলে কাজ না করার অভিযোগটাকে তারা নিতান্ত অজুহাত বা ছুতো হিসেবেই গ্রহণ করবে এবং প্রত্যাশা করতে থাকবে নাটকে এ অন্যায়ের প্রতিকার বা প্রতিকারের একটা উপায় তারা পাবে। নাটকের পরবর্তী যে দৃশ্যে দর্শকের এই প্রত্যাশাপূরণ হবে সেটাকে নাটকের শেষ দৃশ্য হিসেবে সাধারণত দর্শক মনে করে এবং উঠে পড়ে, এর আগে নাটক শেষ হলে দর্শক প্রত্যাশা পূরণের জন্য বসে থাকবে। আর প্রত্যাশা পূরণের পরেও নাটকে আরো কিছু দেখাতে গেলে দর্শক থাকবে না। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা বলা যায় না। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। সাধারণ অভিজ্ঞতা বা নিয়ম তা নয়।

অতত্রব, বহুকাল থেকে নাটক নিয়ে চর্চা করতে-করতে নির্দেশনার যে 'প্রক্রিয়া' ও 'কৌশল' বা কলা-কৌশলগুলি সাধারণ নিয়ম বলে সর্বত্রই স্বীকৃত সেগুলি আগে শেখা উচিত। আর এই প্রাথমিক শিক্ষার পরেই তা অতিক্রম করার প্রশ্ন আসতে পারে। সাধারণত এই ধরনের নির্দেশনা-কৌশলের পাঁচটি সূত্র এ পর্যন্ত নাট্যজগতের সকলেই মেনে নিয়েছেন। এগুলোকেই বলা হয় নাট্য নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র'[৮]। সেগুলো হলো :

১. বিন্যাস (কম্পোজিশন)

২. দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন)

৩. চলন (মুভমেন্ট)

৪. ছন্দ (রিদম)

৫. নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)।[৯]

---

[৭]. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৯।

[৮]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 26।

[৯]. Ibid, Page 109।

১.বিন্যাস (কম্পোজিশন)

নাট্য-বিশেষজ্ঞ আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার মতে কম্পোজিশন হলো :

> Composition is the structure, form, or design of the group. It is not, however, the meaning of the picture. Composition is capable of expressing the feeling, quality, and mood of the subject through color, line, mass, and form. It does not tell the story. It is the technique; it is not the conception।[১০]

কম্পোজিশনের বাংলা বিন্যাস। বিন্যাস কথাটার অর্থ হলো 'সুন্দর সুশৃংখলভাবে রাখা'। নাটকের মঞ্চরূপ দানের ক্ষেত্রে তা হলে বিন্যাসের মানে হচ্ছে– 'নাটকের দৃশ্যে যে কজন অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করবে, মঞ্চে তাদের সুশৃংখল ও সুন্দরভাবে অবস্থান নির্দেশ করা।'[১১] অর্থাৎ সহজ কথায় একটি দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী কে কোথায় দাঁড়ালে বা বসলে ঠিক হবে এবং সেই সঙ্গে সুন্দরও হবে তাই ঠিক করা। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে 'কে কোথায় দাঁড়ালে ঠিক হবে'– এটা ঠিক হবে কোন মানদণ্ডে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে একেবারে মূলে যেতে হয়, বুঝতে হয়, আদৌ কম্পোজিশন বা মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাসের মূল উদ্দেশ্যটা কী? সেই উদ্দেশ্যটা জানতে পারলেই বোঝা যায় কে কোথায় কীভাবে দাঁড়ালে বা বসলে উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে। উদ্দেশ্যই একমাত্র মানদণ্ডে। নাট্যবেত্তার মতে :

> Composition is the physical arrangement of actor-characters in a ground-plan for the purposes of discovering dramatic action and of illustrating it in the simplest possible way through emphasis and contrast. If actors and made aware of basic physical relationships, they will perceive dramatic action in greater depth and be able to transfer this intensity to an audience।[১২]

বিন্যাসের উদ্দেশ্য

নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের একটি বিষয়বস্তু থাকে, একটি মেজাজ থাকে। এক কথায় প্রত্যেক দৃশ্যেই একটি মূল ভাব থাকে। একে বলা হয়– নাট্য-মুহূর্তের 'ভাবমূর্তি'। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো এই নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তিটাকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলা। 'ভাবমূর্তি' কথাটাকে একটু পরিষ্কার বুঝে নেওয়া যাক। দৃশ্যের ভাবমূর্তি বলতে কিন্তু দৃশ্যের সবকিছুকে বোঝায় না। দৃশ্যের মধ্যে একটি গল্প বা কাহিনি

---

১০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 26।

১১. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ১১।

১২. Francis Hodge, *Play Directing- Analysis, Communication and Styie,* Printed in the United States of America, New Jersey 07632, 1994, Page 94।

থাকে, সেই কাহিনির অনেক খুঁটিনাটি বিষয় থাকে, এই বিস্তারিত গল্প বা কাহিনি ভাবমূর্তি নয়। আবার ভাবমূর্তি মানে দৃশ্যের নিখুঁত ছবিও নয়। ভাবমূর্তি হলো দৃশ্যের মূলভাব। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক– 'যারা মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে তাদের কাজে সাধারণভাবে দুটো ভাগ দেখা যায়, প্রথমে তাঁরা একটি খড়ের কাঠামো তৈরি করেন। তার পরে সেই কাঠামোর ওপর মাটি চাপিয়ে মূর্তির আকৃতি দান করেন, রঙ দিয়ে তার চোখ-মুখ সব খুঁটিনাটি যোগ করে তাকে জীবন্ত করে তোলেন। সুতরাং এখানে নাটকের ভাবমূর্তি বলতে ঐ প্রাথমিক খড়ের কাঠামোটাকেই বোঝায়। সম্পূর্ণ দুর্গা প্রতিমা অসুরকে ত্রিশূলে বিদ্ধ করছে– তার বড়-বড় চোখ, দেহের সাজসজ্জা, রঙ ইত্যাদি সব কিছু সেই ত্রিশূল বিদ্ধ করার রনং দেহী মূর্তিকে প্রকাশ করছে। এই রঙ করা নিখুঁত আকৃতির মূর্তি যা প্রকাশ করছে, খড়ের কাঠামো তার সবটা প্রকাশ করে না বা করতে পারে না।'[১৩]

উপর্যুক্ত উদাহরণ অনুসারে তাহলে বলা যায় খড়ের কাঠামো মূল ভাবটি ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করে। মূল ভাব হলো যুদ্ধে একজন শত্রুকে মরণ আঘাত হানছে। খড়ের কাঠামোর দাঁড়ানোর ভঙ্গি বা 'পোজে'র মধ্যে আঘাত করার ভাবটা ধরা থাকে। সুতরাং কম্পোজিশন বা বিন্যাস সম্পূর্ণ কাহিনিও নয়, সম্পূর্ণ ছবিও নয়, তার মূল ভাব প্রকাশক ছক বা কাঠামো মাত্র। এখন প্রশ্ন হলো এই কাঠামো বা বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কী কী প্রকাশ করা যায়? উত্তরে নাট্যবেত্তা আলেকজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– 'Composition is the rational arrangement of people in a stage group through the use of emphasis, stability, sequence, and balance, to achieve an instinctively satisfying clarity and beauty।'[১৪] অর্থাৎ চারটি বিষয়ের দ্বারা এই মূল ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে, যথা :

ক. গুরুত্ব আরোপ

খ. দৃঢ়তা

গ. আনুক্রমিক সম্পর্ক

ঘ. ভারসাম্য

ক. গুরুত্ব আরোপ

নাটকের প্রতি দৃশ্যেই বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত অনুসারে একজন বা একের বেশি অভিনেতা-অভিনেত্রীর গুরুত্ব বেশি থাকে। এখানে সমস্যা হলো মানুষের ভিড়ের মাঝে বিশেষ কাউকে (বা কাউকে-কাউকে) দৃশ্যের ভাবগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী গুরুত্ব দিতে হয়। অর্থাৎ অনেকের মধ্যে একজনকে বা দু-একজনকে এমন ভাবে দাঁড় করাতে

---

[১৩]. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ১১-১২।

[১৪]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 109।

বা বসাতে হবে যাতে সে বা তারাই দর্শকের দৃষ্টি সব চেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করে। দর্শকের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করার জন্য আলেকজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা ৭টি কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হলো :

১. দেহগত অবস্থান

২. বিভিন্ন উচ্চতা

৩. স্থান

৪. মঞ্চ সমতল

৫. রেখা

৬. দৃষ্টি নিক্ষেপ

৭. বৈপরীত্য।[১৫]

১. দেহগত অবস্থান

ক. দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো

ফুল ফ্রন্ট

'মঞ্চে যে অভিনেতা-অভিনেত্রী সোজা-সুজি দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় স্বভাবতই দর্শক তার দিকে প্রথম তাকায়। কারো দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকানো মানেই তাকে আকর্ষণ করা। এটা শুধু মঞ্চে নয়, পথে ঘাটে চলতে-চলতেও বহুলোকের মধ্যে কেউ যদি কোনো একজনের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকে তো দেখা যায় অনেক লোকের মধ্যে সেই লোকটি চোখে পড়ছে।'[১৬]এই সাধারণ সত্যটাকে মঞ্চে কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

[১৫] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 110-114।

[১৬] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ১৩।

খ. পাশে তাকিয়ে দাঁড়ানো

প্রোফাইল

পাশে তাকিয়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ দর্শকের দিকে মুখ না করে মঞ্চের উইংসের দিকে তাকিয়ে দর্শককে ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে রেখে দাঁড়ানো। এই 'প্রোফাইল ফিগার' শুধু মঞ্চে নয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও (বিশেষত ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে) ভাব প্রকাশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'ভারতীয় শিল্পে প্রাণীর প্রাণছন্দ সহজে ধরার জন্য এই প্রোফাইল ফিগারের আশ্রয় নিতে দেখা যায়।'[১৭] অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনোভাব সর্বদাই দর্শকের কৌতূহলের বিষয়। পাশ থেকে এই মনোভাব প্রকাশক ভঙ্গিগুলিসহজেই দেখা যায় বলে এই সব প্রোফাইল ফিগার দর্শকের কাছে গুরুত্ব পায়। উল্লেখযোগ্য যে একজন, বা দুইজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃশ্যেই সাধারণত এই পার্শ্বগত দেহভঙ্গি খুবই কার্যকর।

গ. তিন-চতুর্থাংশ

থ্রি-কোয়ার্টার

ফুলফ্রন্ট আর প্রোফাইলের মাঝামাঝি ভঙ্গিটি হলো থ্রি-কোয়ার্টার। ফুলফ্রন্ট হলে দেহের সামনেটা পুরোপুরি দেখা যায়, প্রোফাইল হলে পাশ থেকে দেহের পুরো ছবিটা দেখা যায়, থ্রি-কোয়ার্টার হলে দেহের তিন চতুর্থাংশ দেখা যায়। 'থ্রি-কোয়ার্টার অনেকটা কোনাকুনি দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি। দুয়ের বেশি অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চে আবির্ভাব ঘটলে এই ভঙ্গি কাজে লাগে।'[১৮]

---

১৭. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ১৪।

১৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 114।

ঘ. পেছন-ফেরা

পেছন-ফেরা

পেছনে ঘুরে অভিনয় করা সচরাচর রীতিবিরুদ্ধ বলে সবারই জানা আছে। কিন্তু চরিত্রের 'ব্যাক পজিশন' অর্থাৎ দর্শকের সামনে পেছন-ফিরে দাঁড়ানো বা বসা আধুনিক মঞ্চে বিশেষ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'মঞ্চে কোনো দৃশ্যে নির্দিষ্ট একজনকে পেছন ফিরে দাঁড় করিয়ে কিংবা বসিয়ে সহজেই উদ্দিষ্ট চরিত্রের ওপর দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব।'[১৯]

২. বিভিন্ন উচ্চতা

বিভিন্ন উচ্চতা বা লেভেল বলতে মঞ্চতলের ওপর অবস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচ্চতাকে বোঝায়। উচ্চতার পার্থক্যের কারণে গুরুত্বেরও পার্থক্য হয়। সাধারণত, 'সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় যে মঞ্চে শুয়ে থাকে সে, তারপর মেঝেতে বসে থাকা, চেয়ারে বসে থাকা, চেয়ারের হাতলে বসে থাকা, মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা, মেঝের কোনো উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা, দুই সিঁড়ি, তিন সিঁড়িতে দাঁড়ানো– এগুলি ক্রমান্বয়ে অধিক গুরুত্ব দাবি করে।'[২০] এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। যখন কোনো দৃশ্যে সবাই উঁচু লেভেলে আছে তখন চরিত্র যদি হাঁটুগোড়ে বসে থাকে বা মেঝেতে শুয়ে পড়ে তাহলে তীব্র বৈপরীতের কারণে হাঁটুগাড়া বা শুয়ে থাকা চরিত্র বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

৩. স্থান

স্থান বলতে এখানে মঞ্চ স্থানের কথা বলা হচ্ছে। 'মঞ্চের ওপর অবস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তার চারদিকের পরিসরের সাহায্যে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য চরিত্র থেকে একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে যদি দূরে দাঁড় করানো হয় তাহলে তার চারদিকে স্থানিক পরিসর বেড়ে যাওয়ার জন্য সে বেশি গুরুত্ব পায়।'[২১] নিম্নের আলোকচিত্রটি দেখা যেতে পারে :

---

[১৯]. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১০৯।

[২০]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 114।

[২১]. Ibid, Page 112।

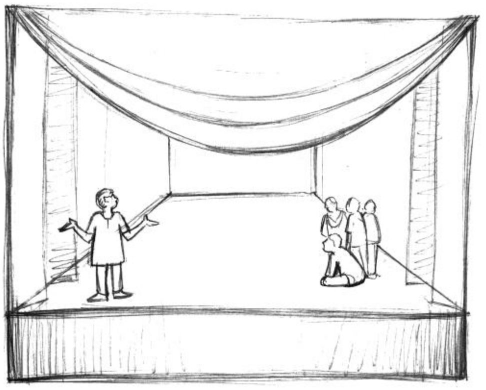

কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দর্শকের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য বেশ সফলভাবেই মঞ্চ-পাটাতনকেও ব্যবহার করা যায়। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করবে, মনে রাখা উচিত, সেই মঞ্চের ঠিক মাঝখানটি (ইংরেজিতে সেন্টার স্টেজ) সবচেয়ে শক্তিশালী স্থান। ওখানটাতেই সাধারণত দর্শকের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয়। তারপরে সাধারণত দেখা যায় মঞ্চের সামনের দিকটাও দৃষ্টি আকর্ষক।

আবার দেখা যায়, দর্শক তার বাঁ দিকেই বেশি তাকায় এটা বোধহয় একটা সহজাত প্রবণতা। এর পেছনে শরীরবিজ্ঞানগত কারণ আছে। এইজন্যেই বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যখন বই পড়ে তখন বাঁ দিক থেকে পড়তে শুরু করে। যখন লেখে তখনও কাগজের বাঁ দিক থেকেই প্রথম লিখতে শুরু করে। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি ডানদিক থেকেই পড়তে ও লিখতে হয়। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রমই। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাকেন্দ্রিক পঠন ও লেখার ধরণ যেহেতু বাম থেকে শুরু হয় সেহেতু এর জন্যেই মঞ্চের সামনের অংশের ডানদিকটা (দর্শকের বাঁ দিক) গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে বিবেচনা করেই মঞ্চ-বিজ্ঞানীরা মঞ্চ-পাটাতনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই ভাগগুলি এইরকম, প্রথমেই হচ্ছে কেন্দ্র :

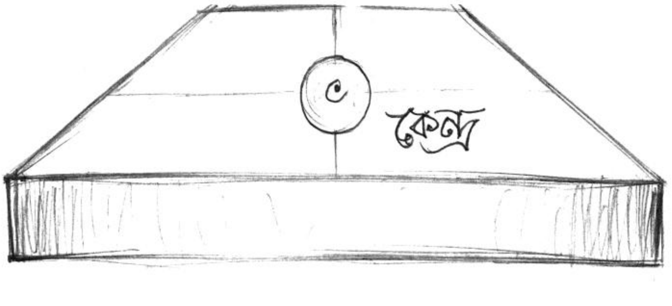

দ্বিতীয়– এই কেন্দ্রবিন্দুর থেকে আবার মঞ্চকে ওপর ও নীচ এই দুভাগে ভাগ করা হয়। নীচ মানে দর্শকের দিকে মঞ্চের সম্মুখভাগ, ওপর মানে পেছনের অংশ। যথা :

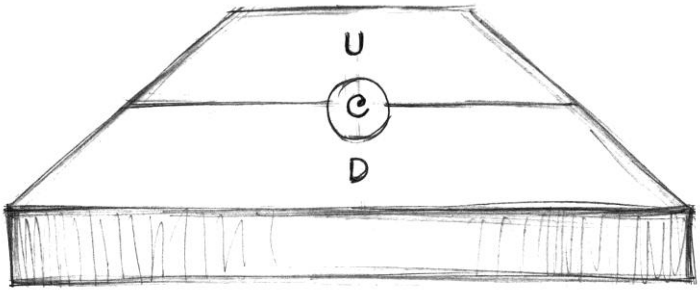

ইংরেজিতে কেন্দ্র হলো সেন্টার, সংক্ষেপে C, আর নীচের ভাগ হলো ডাউন স্টেজ, সংক্ষেপে D, ওপরের অংশ হলো আপ স্টেজ, সংক্ষেপে U।

তৃতীয়– কেন্দ্রের ডানদিক ও বাদিক ধরে মঞ্চপাটাতনকে আরো দুভাগ করা হয়। যথা :

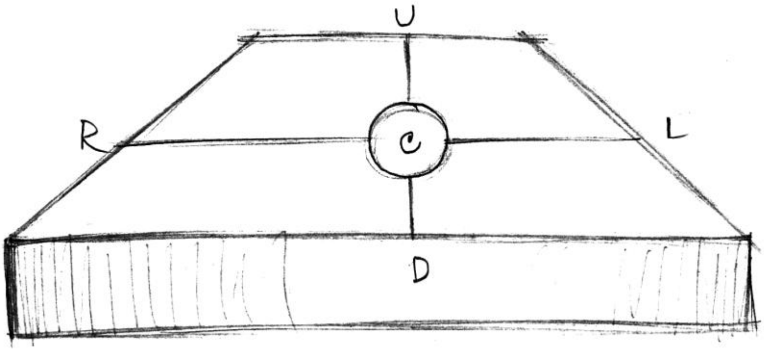

ইংরেজিতে মঞ্চের ডানদিককে বলা হয় রাইট স্টেজ, সংক্ষেপে R, বাঁদিককে বলা হয় লেফট স্টেজ, সংক্ষেপে L। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে অনেকেই ধাঁধায় পড়ে যায় যে মঞ্চে ডান, বাঁ বলতে ঠিক কী বোঝায়, কারণ দর্শকদের দিক থেকে যেটা মঞ্চের বাঁ, অভিনেতার দিক থেকে সেটাই মঞ্চে ডান অতএব মঞ্চে ডান বা বাঁ বলতে কোনটা বুঝব? এখানে মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চ-বিজ্ঞানে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিক থেকেই ডান, বাম ধরা হয়।

চতুর্থ– মঞ্চের এই চার ভাগের ওপরে আরো ভাগ করা হয়। এবারে মঞ্চের নীচের অংশকে তিন ভাগ, এবং সেই রকম ওপরের অংশকেও তিন ভাগ করা হয়, যেমন :

নিচের অংশ :

১. নিম্ন-ডান (ডাউন রাইট D R)

২. নিম্ন-কেন্দ্র (ডাউন সেন্টার D C)

৩. নিম্ন-বাম (ডাউন লেফট   D L)

ঠিক তেমনি ওপরের অংশেও :

১. ওপর ডান (আপ রাইট U R)

২. ওপর কেন্দ্র (আপ সেন্টার U C)

৩. ওপর বাম (আপ লেফট U L)

সমগ্রভাবে তাহলে মঞ্চ বিভাগ হলো নিম্নরূপ :

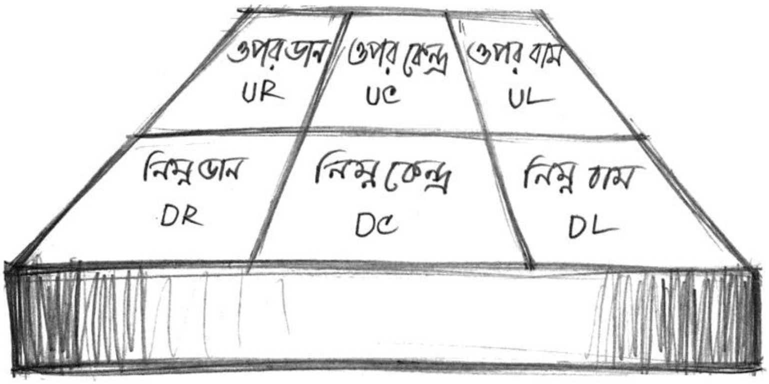

'মঞ্চের এই অংশগুলির দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা এক নয়। কোনোটার বেশি, কোনোটার কম। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এলাকা DC এবং তার পর DR, DL, পরবর্তী সময়ে UR, UC, UL। সবচেয়ে কম শক্তি UL এর।'[২২] এর যে ব্যতিক্রম হয় না তা নয় তবে এটাই সাধারণ নিয়ম। চরিত্রের গুরুত্বের মাত্রা অনুসারে এই স্পেসকে ব্যবহার করা দরকার।

বলা দরকার যে স্পেসের ব্যবহার সম্পর্কে এখানে যা বলা হলো তাই চূড়ান্ত নয়। শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে যতটুকু না হলে নয় তাই বলা হলো। এই স্পেস ব্যবহারের বিষয়টি আরো অনেক জটিল। সৌন্দর্যবোধ এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে এই জটিলতাকে আয়ত্ত করতে হয়। এর সবটা অঙ্কের মতো ছক কেটে শেখানোর কোনো পদ্ধতি এখনো কেউ আবিষ্কার করেছেন বলে জানা যায় না। এই স্পেসের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে, দূরত্বের সম্পর্ক আছে, বুদ্ধি ও আবেগেরও সম্পর্ক আছে। চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও এই স্পেস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক টুকরো চৌকোণা সাদা কাগজের ওপর একটি পরিকল্পনা করতে গেলে, বা কোনো বর্ণনাত্মক ছবি আঁকতে গেলে দর্শকের দৃষ্টিকে সৌন্দর্য সম্মতভাবে আকর্ষণ করতে হলে কাগজের কোথায় জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত, কোথায় জায়গা ছাড়া আদৌ উচিত নয় এটা ঠিক করার জন্য চাই একটি অভিজ্ঞ শিল্পী-মন। মঞ্চের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। এগুলি এক মুহূর্তেই হবার নয়। প্রাথমিক স্তরের অনুশীলনজাত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যথা সময়ে তা আয়ত্তে আসবে আশা করা যায়।

[২২] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ১৭-১৮।

৪. মঞ্চ সমতল

মঞ্চকে সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত অর্থাৎ পাদ প্রদীপের কাছ থেকে পেছনের পর্দা পর্যন্ত কতকগুলি সমান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :

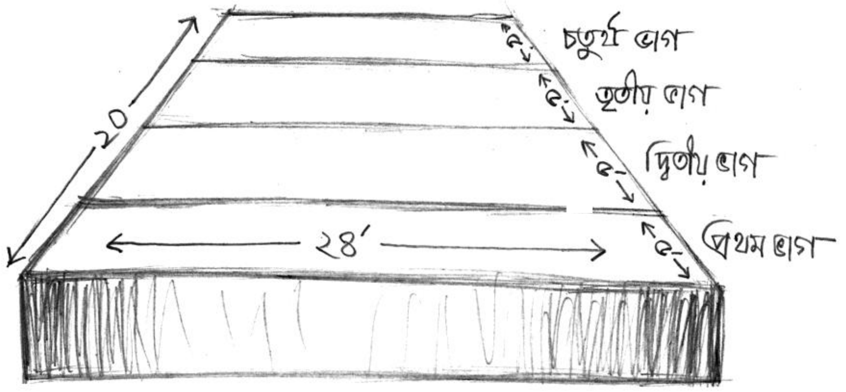

মনে করা যাক, মঞ্চটি দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট এবং প্রস্থে ২০ ফুট। এবার প্রান্তের দিকে মঞ্চটিকে ৫ ফুট করে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এগুলি কাল্পনিক ভাগ। এখানে দর্শকের সামনে পাদ প্রদীপের কাছে যে ভাগটি তাকে প্রথম ভাগ ধরে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাগ ধরা যায়।

এই বারে নিয়মানুসারে গুরুত্ব আরোপের দিক থেকে সামনের এই প্রথম ভাগটা হচ্ছে (এই স্থানকে নাট্যবিজ্ঞানে ডাউন স্টেজ বা নিম্ন মঞ্চ বলে) সব চেয়ে শক্তিশালী। সাধারণত দেখা যায় যে মঞ্চের একেবারে সামনে যে অভিনেতা-অভিনেত্রী এসে দাঁড়ান পেছনে দাঁড়ানো অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে তিনি দর্শকের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে। 'এদিক থেকে বুঝতে হবে প্রথম ভাগ থেকে চতুর্থ ভাগ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব বা দৃষ্টি আকর্ষণ শক্তি কমে যায়।'[২৩]

৫. রেখা

রেখার সাহায্যেও অভিনেতা-অভিনেত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আগে বলা দরকার মঞ্চ বিন্যাসের ক্ষেত্রে রেখা বলতে ঠিক কী বোঝায়। 'রেখায় দেখা' বলে একটা কথা ছবি আঁকার জগতে চালু আছে। দুনিয়ার সব জিনিষই ইচ্ছে করলে মনে-মনে রেখায় পরিবর্তিত করে দেখা যায়। যেমন ধরা যাক নীচের ছবিটি :

[২৩] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ১৯।

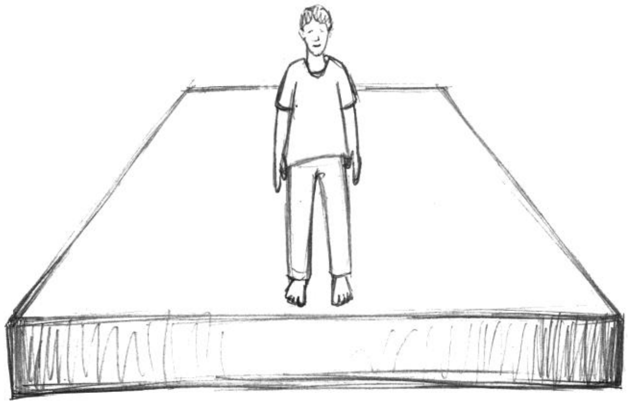

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি লোক একটি পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবিটাকে যখন রেখায় দেখা হয় তখন দাঁড়ায় ––

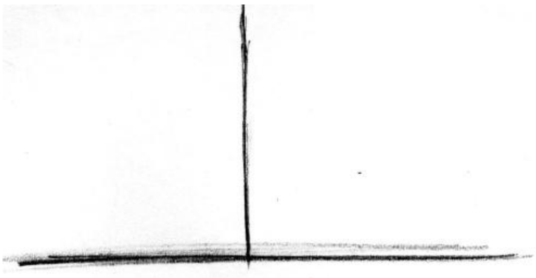

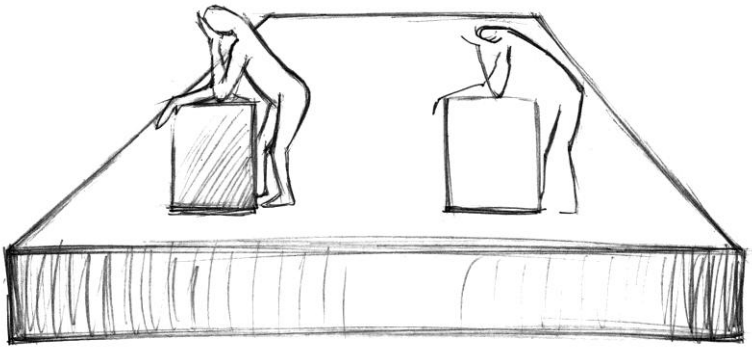

এইভাবে ইচ্ছা করলে শুধু মানুষের স্থির হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিই নয়, মানুষের চলনের গতিও রেখায় কল্পনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক, 'একটি লোককে বন্য শূকরে তাড়া করেছে। শূকর সোজা লাইনে ছাড়া দৌড়াতে পারে না এইটা জেনে তাড়া খাওয়া লোকটি এঁকে-বেঁকে দৌড়াতে লাগল।'[২৪] এই ঘটনার রেখা এইভাবে হতে পারে :

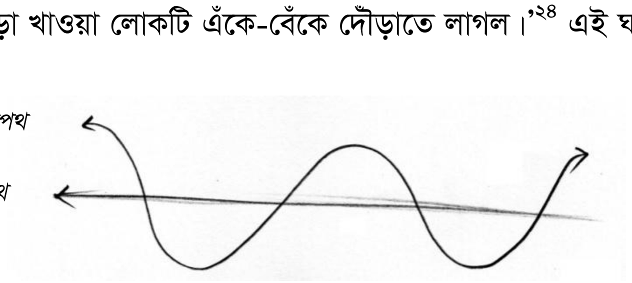

[২৪]. মোঃ আহমেদুল কবির, নাট্য পরিচালনায় কম্পোজিশন বা বিন্যাস, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (সম্পাদক : আফরোজা পারভিন), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঊনত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ২০১১, পৃ. ১৯।

একাধিক লোক কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে আছে-এও রেখায় কল্পনা করা যেতে পারে। যেমন :

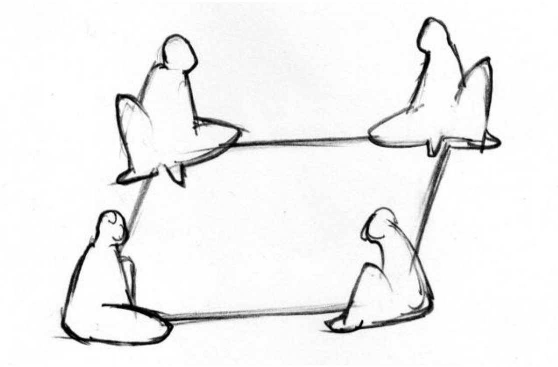

এই বসার রেখা-রূপ হতে পারে একটি বর্গক্ষেত্রাকার

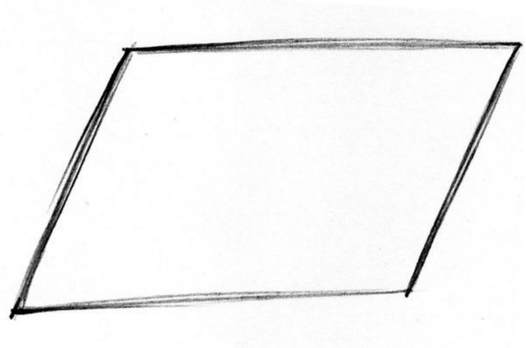

অথবা

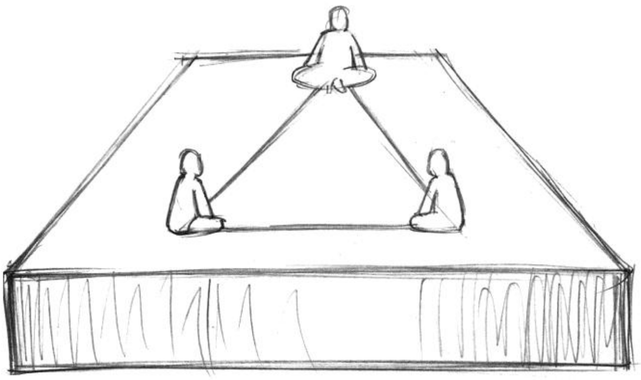

এর রেখা-রূপ হতে পারে একটি ত্রিভুজ

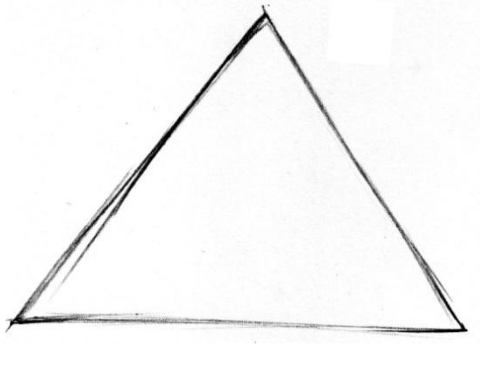

মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাসে গুরুত্ব আরোপ করার ক্ষেত্রে এই রেখা অনেক সময় কাজে লাগে। এই রেখার ছক অনেক সময় ধরিয়ে দেয় কোথায় কে বসলে বা দাঁড়ালে বেশি গুরুত্ব পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চার কোণে চারজন বসে তাস খেলছে-এর রেখা-রূপ বর্গক্ষেত্র বুঝিয়ে দেয় চারজনের কেউই বেশি বা কম গুরুত্ব পাচ্ছে না। বর্গক্ষেত্রের চার রেখা যেমন সমান মাপের, তেমনি মানুষগুলিরও সকলের সমগুরুত্ব বা গুরুত্ব একই মাপের। আবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখা যায় শীর্ষ কোণটি তুলনায় বেশি গুরুত্ববহ–

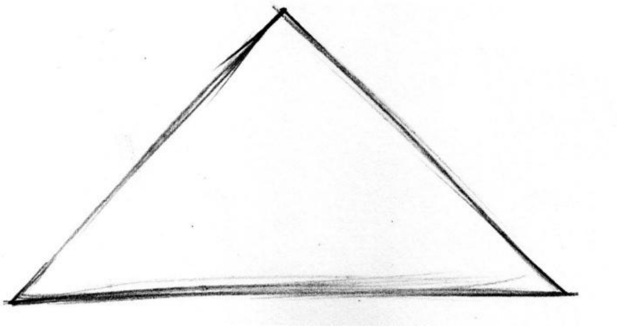

মঞ্চে এইভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাস করলে দেখা যায় এই শীর্ষে বসা অভিনেতা-অভিনেত্রীই দর্শকের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। মনে করা যাক, একটি দৃশ্যে বুদ্ধ তাঁর দুই শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন– ত্রিভুজ রেখায় তখন অবশ্যই শিষ্যদের নীচের কোণে রেখে বুদ্ধকে শীর্ষকোণে বসাতে হয়।

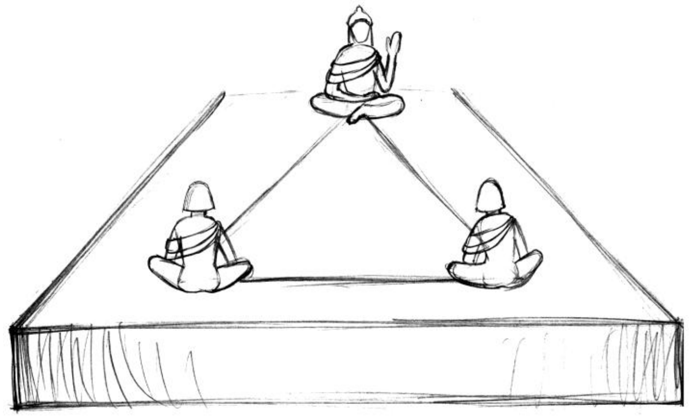

তাই শীর্ষ কোণ খুবই শক্তিশালী। এতো শক্তিশালী যে মঞ্চের অনেক আইনকে এটি বাতিল করতে পারে। যেমন, আগে 'প্লেইন' বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে U স্টেজ থেকে D স্টেজ গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী অর্থাৎ ওপর মঞ্চ বা আপ স্টেজ থেকে নিম্নমঞ্চ বা ডাউন স্টেজ শক্তিশালী। এখানে বুদ্ধ ওপর মঞ্চে আছেন শিষ্যরা নীচের মঞ্চে আছে। উপরোক্ত নিয়মে শিষ্যদেরই অধিক গুরুত্ব পাবার কথা। কিন্তু ত্রিভুজ রেখার শীর্ষ এমনি শক্তিশালী যে ঐ আইনকে বাতিল করে এখানে ওপর মঞ্চে থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধকেই প্রধান করে তুলেছে।

৬. দৃষ্টি নিক্ষেপ

এটা সর্বজনবিদিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে সেই দিকেই সবাই দৃষ্টি দেয়। যদি দেখা যায় যে, 'একদল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তাহলে সবাই তাকে অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। থিয়েটারের দর্শকও তেমনি তাকিয়ে থাকে অভিনেতা-অভিনেত্রী যেদিকে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। এ ধরনের গুরুত্বদানকে থিয়েটারের ভাষায় দৃষ্টিনিক্ষেপ বা ভিসুয়াল ফোকাস বলে।'[২৫] যখন কোনো প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃষ্টি পড়বে এবং তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তখন ঐ প্রধান চরিত্র গুরুত্ব পায়।

৭. বৈপরীত্য

বৈপরীত্য হলো, সবাই যা করছে তার বিপরীত বা উল্টো কিছু করা। এতে যে উল্টো কিছু করলো সকলের থেকে আলাদা হয়ে সে দর্শকের দৃষ্টিতে গুরুত্ব পায়। ধরা যাক, 'সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকের দিকে মুখ করে। তার মধ্যে একজন ঝুঁকে পড়লো দর্শকের দিকে স্বভাবতই দর্শকের দৃষ্টিতে সে গুরুত্ব পাবে। কিম্বা, মঞ্চের ডানদিকে একসারি অভিনেতা-অভিনেত্রী দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের বাঁ দিকে তাকিয়ে, আর তেমনি বাঁদিকে একসারি অভিনেতা-অভিনেত্রী দাঁড়িয়ে আছে ডান দিকে তাকিয়ে এবং দুই সারির মাঝখানে একজন দাঁড়িয়ে আছে দর্শকের দিকে পেছন ফিরে।'[২৬] স্বভাবতই পেছন ফেরা লোকটি সকলের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করবে। এইভাবে কোর্ট মার্শালের দৃশ্যে যাকে গুলি করা হচ্ছে তাকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

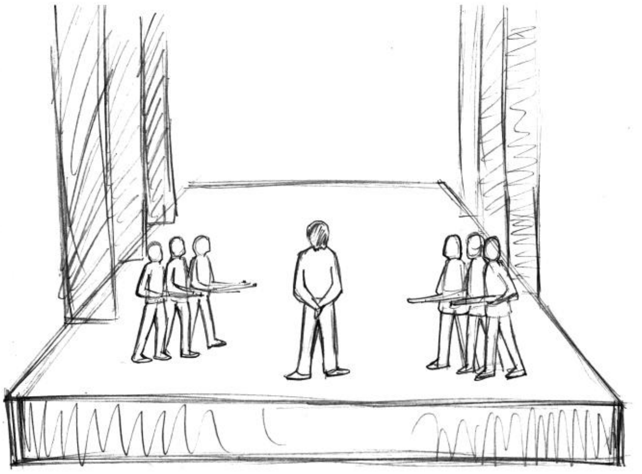

কম্পোজিশন বা বিন্যাসের চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ গুরুত্ব আরোপের 'কৌশল' সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন আলোচ্য দ্বিতীয় উপাদান– 'দৃঢ়তা' বা স্টেবিলিটি।

---

[২৫] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ২২-২৩।

[২৬] মোঃ আহমেদুল কবির, নাট্য পরিচালনায় কম্পোজিশন বা বিন্যাস, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (সম্পাদক : আফরোজা পারভিন), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, উনত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ২০১১, পৃ. ২০।

খ. দৃঢ়তা

চিত্রশিল্প সম্পর্কে ধারণা না থাকলে দৃঢ়তার ব্যাপারটা উপলব্ধি করা বেশ দুরূহ। তাই দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করার আগে ছবির কথা বলা প্রয়োজন। ছবি আঁকার জায়গা হলো একখানা চারকোণা কাগজ বা ক্যানভাস। যাই আঁকা হোক না কেনো ঐ চারকোণা কাগজের ওপরই আঁকতে হয়। কিন্তু ঐ চারকোণা কাগজের যে কোনো জায়গায় সুন্দরভাবে এঁকে দিলেই তা ছবি হয়ে ওঠে না। ঐ চারকোণা কাগজের চারপাশে একটা ফ্রেম কল্পনা করে নিয়ে এমন জায়গায় এমনভাবে ছবির সাবজেক্ট বা বিষয়টি আঁকতে হয় যাতে ফ্রেমটা ভরাট মনে হয় অর্থাৎ ছবি আর ফ্রেমটা যেন আলাদা-আলাদা বা বিচ্ছিন্ন বলে কিছুতেই মনে না হয়। ফ্রেমটা অযথা কিছু নয়, ফ্রেমের মধ্যে সাবজেক্ট দৃঢ়বদ্ধ হয়ে অবস্থান করবে। নিচের ছবি দেখলেই বিষয়টা অনুধাবনে সুবিধা হবে।

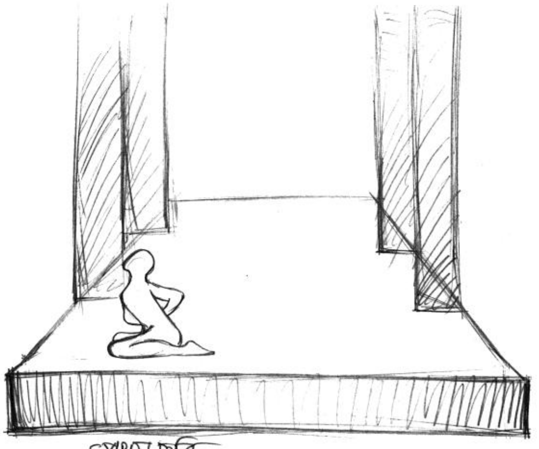

প্রথম ছবি

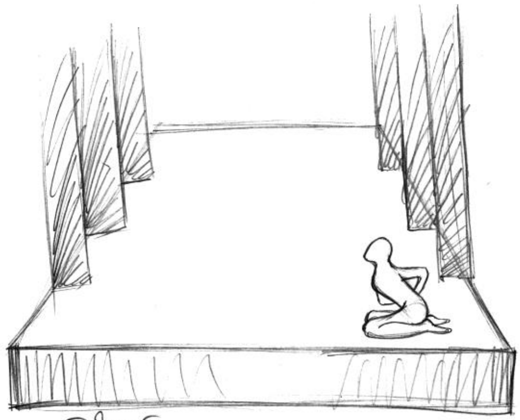

দ্বিতীয় ছবি

প্রথম ছবিতে বন্দি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ফ্রেমের যেখানে বসানো হয়েছে তাতে ফ্রেমের সঙ্গে খাপ খায় নি। তার কারণ অভিনেতার পেছনে ফ্রেমের মধ্যেকার অনেকখানি জায়গা পড়ে আছে যা অযথা ও অর্থহীন, ছবির বিষয়ের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এই অর্থহীনতার জন্যই এটা বেখাপ্পা লাগছে। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটাতে তা হয় নি। বন্দি মুক্তির আশায় সামনে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। বন্দির সামনে ফ্রেমের খালি জায়গাটা তার আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা ভবিষ্যতের ব্যঞ্জনায় ভরাট হয়ে আছে। জায়গাটা খালি হওয়া সত্ত্বেও অর্থময় হয়ে ভরাট হয়ে উঠল। একেই বলে 'দৃঢ়বদ্ধতা' বা স্টেবিলিটি।'[২৭] তাহলে এবার মঞ্চের প্রসেনিয়ামকে ফ্রেম কল্পনা করে ছবির সাবজেক্ট-এর জায়গায় বন্দি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বসালে দেখা যায়, পুরো দৃশ্যটাই ভরাট হয়ে উঠছে।

[২৭] মোঃ আহমেদুল কবির, নাট্য পরিচালনায় কম্পোজিশন বা বিন্যাস, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (সম্পাদক : আফরোজা পারভিন), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, উনত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ২০১১, পৃ. ২০।

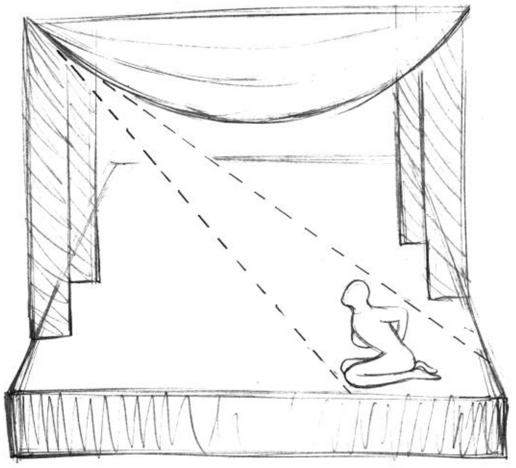

আলোর সাহায্যে এই ফ্রেমকে আরো ভরাট বা দৃঢ়বদ্ধ করে তোলা যায়। ছবিতে আলোটা দেখা যেতে পারে। কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে এই দৃঢ়তা শিল্পের দিক দিয়ে খুবই প্রয়োজনীয়, এর মধ্যে সৌন্দর্য এবং অর্থপূর্ণতা বা ভাব প্রকাশের ব্যাপার এক সঙ্গে জড়িত।

উল্লেখযোগ্য যে একজন বা দু'তিন জন অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চে থাকলে এই দৃঢ়তা আনা খুব কঠিন হয় না। মঞ্চ ভরাট করার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মঞ্চে ভুল অবস্থানে রাখলেও অনেক সময়ই দেখা যায় মঞ্চ ভরাট হয় নি বলে দর্শক মনে করেন না। তার কারণ ঐ একজন দু'জন অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চের কোনো একটি মাত্র এলাকায় অবস্থান করেন। দর্শক ওদের অভিনয়ের বিষয়েই আগ্রহী তাই দর্শকের চোখ আটকে থাকে মঞ্চের ঐ এলাকাতেই। মঞ্চের অন্যান্য অংশ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বলে ভুল হলেও তাতে দর্শকদের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু যখন একদল অভিনেতা-অভিনেত্রী পুরো মঞ্চ জুড়ে থাকেন তখনি খুব হিসেব করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চে অবস্থান করাতে হয়, তা না হলে মঞ্চ ভরাট হয় না। এরকম ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুসারে পূর্বোক্ত ডি আর (DR) ডি এল (DL) প্রভৃতি মঞ্চ এলাকাকে তার ওজন ও গুরুত্ব অনুসারে ব্যবহার করতে হয়।

গ. আনুক্রমিক সম্পর্ক

অনুক্রম বা ইংরেজিতে যাকে 'সিকোয়েন্স' বলে তার মানে হলো মঞ্চে উপস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছড়ানো ছিটানো দলগুলিকে মঞ্চস্থানের সাহায্যে একটা ঐক্য বন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসা। এখানে বিশেষভাবে বোঝার বিষয় হলো– মঞ্চে উপস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক থাকেই। বিন্যাস কৌশলের দ্বারা এই একটা কিছু সম্পর্ককে প্রকাশ করতে হয়। ইতিপূর্বে লাইন বা রেখার কথা বলা হয়েছে। যখন মঞ্চে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী উপস্থিত থাকেন তখন সাধারণত ঐ লাইনের সাহায্যেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধন বোঝানো সম্ভব। এই ভাবেই চতুর্ভুজ রেখার ব্যবহার করে চারজন তাস

খেলোয়াড়ের সম্পর্ক বন্ধন বা ত্রিভুজের সাহায্যে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক বন্ধনটি পূর্বে বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে। লাইন বা রেখারও তেমনি একটা সীমা আছে। যখন মঞ্চে তিন বা চার বা পাঁচজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে কোনো সত্যিকারের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে তখনি শুধু রেখার সাহায্যে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব। এছাড়া নয়। 'রেখা দিয়ে সম্পর্ক বোঝানো'[২৮]– কথাটাকে একটু পরিষ্কার করা দরকার। এখানে 'সম্পর্ক' বলতে পূর্ণ সম্পর্ক অর্থাৎ খুঁটিনাটিসহ সমগ্র সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে না।

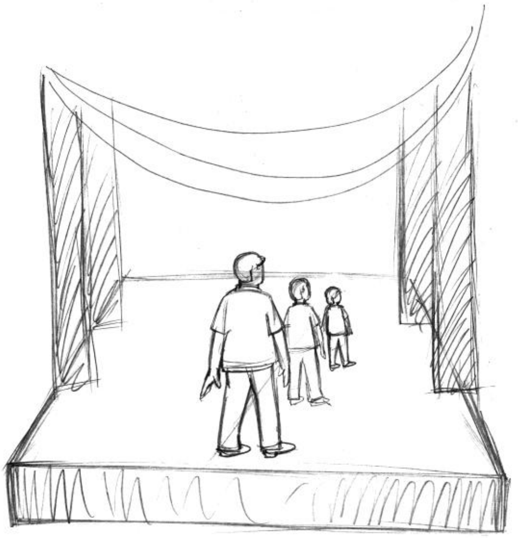

ওপরের ছবিটার দিকে তাকালে দেখা যায়– মঞ্চের ওপর তিনজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দাঁড় করানো হয়েছে সরলরেখায়। এর মধ্যে নাটকের কাহিনি অনুযায়ী তিনটি লোকের মধ্যে নানা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে পারে। হতে পারে এরা তিন ভাই, হতে পারে এর তিন বন্ধু বা অন্য কিছু। রেখার সাহায্যে এই খুঁটিনাটি সম্পর্ক প্রকাশ করা যায় না। রেখা শুধু সম্পর্কের আভাস দিতে পারে। উপরোক্ত মঞ্চ-চিত্রটি দেখলে এটা বোঝা যায় যে এই সরলরেখায় দাঁড়ানো লোকগুলির মধ্যে যা হোক একটা কিছু গভীর সম্পর্ক আছে। 'রেখা দিয়ে সম্পর্ক বোঝানো' বলতে তাই সম্পর্কের আভাস বোঝানোর কথাই বলা হচ্ছে।

যখন অর্থের দিক দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে সত্যিই কোনো সম্পর্ক থাকে তখনি রেখা কার্যকর হতে পারে। কিন্তু মঞ্চে যখন এমন দৃশ্য দেখাতে হবে যেখানে একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী বা তাদের দলের মধ্যে নাটকের অর্থ অনুযায়ী কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ সকলকে মঞ্চে উপস্থিত করতেই হচ্ছে তখন আর রেখা দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। 'নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে ভারাক্রান্ত বিয়েবাড়ির দৃশ্য, টি-পার্টিতে সমবেত মানুষের দৃশ্য ইত্যাদিতে এই সমস্যাটা দেখা দেয়। অর্থের দিক থেকে দেখলে এই সব দৃশ্যের পাত্রপাত্রী বা পাত্রপাত্রীর দলগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র এবং একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য। মঞ্চস্থ দৃশ্যকে অর্থের দিক ছাড়া আরো

---

[২৮] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ২৬।

একটা দিক থেকে দেখার দায়িত্ব নির্দেশকের থাকে– সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বিন্যাসের দিক। বিন্যাস বা কম্পোজিশনের দিক থেকে দেখলে এই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা দলগুলিকে একটি এককে সংহত করার প্রয়োজন বোধ হয়। বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে যেখানে রেখার সাহায্যে সম্পর্কিত করা যায় না সেখানে স্পেস বা স্থানের সাহায্যে ঐ সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। স্পেস বা স্থানের সাহায্যে স্বতন্ত্র এককগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের নামই আনুক্রমিক সম্পর্ক বা সিকোয়েন্স।'[২৯]

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে, অর্থের দিক থেকে যাদের মধ্যে প্রকৃত কোনো সম্পর্ক নেই স্থান বা স্পেসের সাহায্যেই বা কেনো তাদের একটি এককে বাঁধতে যাব? এর উত্তর পেতে গেলে পূর্বে 'বিন্যাস বা কম্পোজিশন' অংশে যা বলা হয়েছে তা আর একবার স্মরণ করা দরকার। সেখানে বিন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, দৃশ্যের ভাব-মূর্তি প্রকাশ করার জন্যই মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এছাড়া সেখানে প্রথমেই বলা হয়েছে– বিন্যাস মানে 'সহজ কথায় একটি দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কে কোথায় দাঁড়ালে বা বসলে ঠিক হবে এবং সুন্দর দেখাবে তাই ঠিক করা'। এখানে লক্ষ্য করলে 'ঠিক হবে' এবং 'সুন্দর দেখাবে' এই দুটো কথা খুব হিসেব করে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাস কীভাবে করলে 'ঠিক হবে' সেটা নির্ধারণ করতে হবে দৃশ্যের অর্থের দিক থেকে। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিন্যাস কীভাবে চোখে দেখতে সুন্দর হবে সেটা নির্ভর করবে বিন্যাসকারীর শিল্পবোধের ওপর। যেখানে দৃশ্যের অর্থ প্রকাশের প্রশ্ন আসছে সেখানে এই 'ঠিক হওয়া' আর 'সুন্দর হওয়ার' মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অবশ্যই করতো হবে। 'ঠিক না হয়ে' শুধু সুন্দর হলে দৃশ্য অর্থের দিক থেকে মার খাবে কিন্তু যেখানে দৃশ্যের অর্থ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না, অথবা অর্থপ্রকাশ খুব সামান্যভাবে করলেও চলে সেখানে সুন্দরের প্রয়োজনটা থেকেই যাচ্ছে, বা সুন্দরের প্রয়োজনটা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিখ্যাত নাট্যবিদ আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা তাঁদের সিকোয়েন্স-বিষয়ক আলোচনায় দুটো কথা ব্যবহার করেছেন– একটি হচ্ছে 'from the point of view of meaning'[৩০] আর একটি হচ্ছে 'from a compositional point of view'[৩১] অর্থাৎ অর্থ প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ– এই দুই দিক থেকেই নির্দেশককে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চাবস্থান ঠিক করতে হয়। কাজেই যেখানে প্রকৃত সম্পর্ক বন্ধন নেই সেখানেও স্পেসের সাহায্যে বিছিন্ন দৃশ্যগুলোকে একটি এককে বাঁধতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– কীভাবে বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে দৃশ্যগত ঐক্যসূত্রে বাঁধা হয়? এর যেকোনো বাঁধাধরা নিয়ম বা পদ্ধতি আছে তা বলা যায় না, এটা নির্দেশকের শিল্পবোধের ওপরই নির্ভর করে, সাজানোর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত

---

২৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 154।
৩০. Ibid, Page 154।
৩১. Ibid, Page 154।

হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেই বোধশক্তির কিছু না কিছু বিকাশ ঘটবেই। নিয়মকানুন না থাকলেও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিজ্ঞ নির্দেশকেরা প্রায় একই রকম করে সাজান। এঁদের এই সাজানোর প্রক্রিয়া অবলম্বন করে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, ধরা যাক, 'একটি কারখানার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করার কাহিনি। একটি দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে যে প্রথমে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ছিল না, কিন্তু একজন শ্রমিক নেতার বক্তব্য শুনে ধীরে-ধীরে তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা দিচ্ছে।'[৩২]

এখানে দৃশ্যের গতি হচ্ছে অনৈক্য থেকে ঐক্যের দিকে। কাজেই প্রথমে দেখাতে হবে মঞ্চ জুড়ে (কারখানা ঘরে) বহু শ্রমিক নানাভাবে বসে দাঁড়িয়ে কাজ করছে কিন্তু তারা (অর্থের দিক দিয়ে) ঐক্য সূত্রে বদ্ধ নয়, কেউ-কেউ ছোট গ্রুপ হিসেবে কাজ করছে, কেউ একাই। এইভাবে তারা মঞ্চময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছে। এই ছড়ানো ছিটানো গ্রুপ ও ব্যক্তিকে পৃথক বা বিছিন্ন রেখেও দৃশ্যকে সৌন্দর্যের ঐকতানে বাঁধতে হলে এইভাবে বাঁধা যেতে পারে :

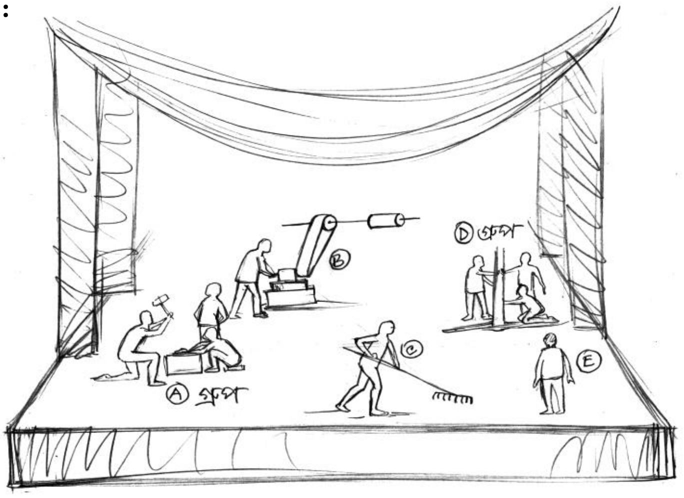

এখানে দেখানো হচ্ছে একটি কারখানা ঘরে নয়জন শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যে আছে তিনজন করে দুটি গ্রুপ আর তিনজন একক ব্যক্তি।

A. তিনজনের গ্রুপ, একজন সাঁড়াশি দিয়ে গরম লোহার টুকরো ধরছে অন্যজন তাতে হাতুড়ি পেটাচ্ছে, তৃতীয় শ্রমিক কোমরে হাত দিয়ে এদের কাজ দেখছে আর মাঝে মাঝে ফোঁপর-দালালি করছে।
B. একা সাফটিং বেল্ট মেরামতি করছে।
C. হন-হন করে ডানদিক থেকে বাঁদিকে যাচ্ছে।
D. তিনজনের গ্রুপ, দু'জনে একটা ভারী লোহার পাইপ ধরে আছে অন্যজন বসে তাতে ফুটো করছে।
E. একা উংইসের দিকে তাকিয়ে আছে।[৩৩]

---

৩২. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ২৭।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

এখানে দলগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেখাবার জন্য প্রথমেই ফোকাস বা 'দৃষ্টি নিক্ষেপ' সম্পর্কে সতর্ক হতে হয়। বিভিন্ন গ্রুপ ও একক ব্যক্তি যেন একে অন্যের দিকে না তাকায় বা সকলে ঘাড় ফিরিয়ে কোনো বিশেষ একদিকে না তাকায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হয়। প্রত্যেক গ্রুপ নিজেদের মধ্যেই ফোকাস নিবদ্ধ রাখবে। এক গ্রুপ আর এক গ্রুপের দিকে তাকালে তৎক্ষণাৎ তাদের বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং দুই গ্রুপে সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

দ্বিতীয়ত– 'এখানে দূরত্বের মাপ হিসেব করে ব্যবহার করা হয়েছে। A থেকে B যে দূরত্বে আছে, B থেকে C তার দ্বিগুণ দূরত্বে আছে। C থেকে D তার তিনগুণ দূরত্বে আছে। আবার D থেকে E প্রায় সমদূরত্বে আছে। দূরত্বের এই আনুপাতিক মাপের জন্যই এরা ফোকাস বিনিময় না করেই মঞ্চ ভরাট করে একটি এককে পরিণত হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে পরস্পর বিচ্ছিন্নতার ভাবটি রক্ষা করছে।'[৩৪]

এছাড়া এখানে 'ছন্দোবদ্ধ স্থান' বলেও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সিকোয়েন্সের অর্থই হলো– 'মঞ্চস্থানের সাহায্যে ছড়ানো ছিটানো গ্রুপ ও ব্যক্তিকে একটি ঐক্য বন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসা। এই ঐক্য সৃষ্টির মধ্যে ছন্দ আনতে পারলে আরো ভালো হয়। সরলরেখায় গ্রুপ সমাবেশ করলে সবসময় ছন্দ সৃষ্টি হয় না। এর জন্য ত্রিকোণ, সুসমঞ্জস আকৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয় এবং বিশেষ অনুপাতে পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন হয়।'[৩৫] এখানে যে ছবি দেওয়া হয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাতে মঞ্চপাটাতনের বিভিন্ন স্থানে যে গ্রুপগুলি ও ব্যক্তি ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটি আনুপাতিক ছন্দও আছে। তা এইরকম :

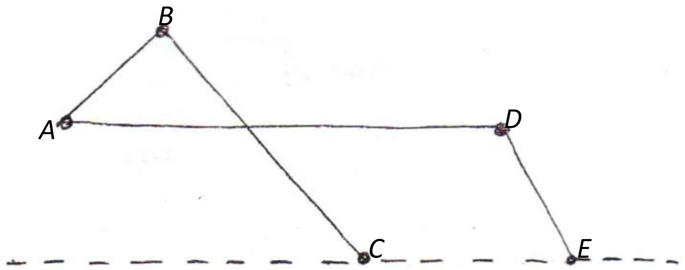

A = তিনজনের গ্রুপ	D R নীচে ডান মঞ্চে
B = একক	U R ওপরে ডান মঞ্চে
D = তিনজনের গ্রুপ	U L ওপরে বাঁ মঞ্চে
E = একক	D L নীচে বাঁ মঞ্চে
C = একক	D C নীচে কেন্দ্রে

---

৩৪. মোঃ আহমেদুল কবির, নাট্য পরিচালনায় কম্পোজিশন বা বিন্যাস, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (সম্পাদক : আফরোজা পারভিন), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঊনত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ২০১১, পৃ. ২৪।

৩৫. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ২৯।

(C কেন্দ্রে থাকায় মঞ্চ ভরাট হয়ে যায়। C কে বাদ দিয়ে দেখলে মঞ্চ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে এবং ছন্দ পতন হয়)

এইবারে দৃশ্যের দ্বিতীয় স্তরে যাবার ভূমিকা প্রস্তুত। অর্থাৎ যে সুষম অনৈক্য দেখানো হলো তাতেই ঐক্য দেখাবারও সুবিধা হলো। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় C কে দিয়ে নীচে কেন্দ্র যখন মঞ্চ ভরাট করা হলো তখন U C বা ওপর কেন্দ্র ফাঁকা রাখা হয়েছে (অথচ সেটা দর্শকের চোখে পড়ে না)। এইবার শ্রমিক নেতা এসে ঐ U C বা ওপর কেন্দ্রে একটু উঁচু জায়গায় যদি দাঁড়ান এবং সেই সঙ্গে যদি মঞ্চের সকলের ফোকাস বা দৃষ্টি একসঙ্গে ঐ নেতার দিকে ঘুরে যায়, তবে মুহূর্তে বিচ্ছিন্নতা কেটে গিয়ে মনে হবে মঞ্চে সব শ্রমিক মিলে একটি গ্রুপ আর U C বা ওপর মঞ্চে নেতা তাদের ঐক্যসূত্রের কেন্দ্র। এইভাবে অনুপাত যুক্ত ছন্দোবদ্ধ অনুক্রম সম্পর্ক স্থাপন করা যায় মঞ্চ স্থানের সাহায্যে।

ঘ. ভারসাম্য

ভারসাম্য সম্পর্কে নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার অভিমত :

> When one part of the stage composition is equalized in weight with the other, the composition is said to have balanc.This is an important factor in giving a pleasurable and satisfying effect− the constant purpose of composition।[৩৬]

ভারসাম্য মানে ভরের সমতা। সবদিকে ভার সমান না হলে দুনিয়ার কোনো কিছু ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। একদিকে ভার বেশি হলে সেই দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে। কেনা-বেচার বাজারে দাঁড়ি-পাল্লার দুদিক সমান হওয়া চাই নইলে কেনা-বেচা অচল হয়ে যায়। একটা বহুতল বিশিষ্ট বাড়ির চারদিকে ভারসাম্যের সমতা না রাখলে সে বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে না। গতিশীল বস্তুর ব্যাপারেও ভারসাম্য নষ্ট হলে গতি হোঁচট খায়। মানুষ যখন হাঁটে তখন যে তার হাত দুখানা হাঁটার তালে-তালে অনবরত সামনে পেছনে দুলতে থাকে তা ঐ ভারসাম্যেরই কারণে। 'পায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরীরের গতিশীল ভারকে সমতা দানের জন্যই একটা হাত যখন সামনের দিকে প্রসারিত হয় তখন আপনা-আপনি আর একটা হাত পেছন দিকে চলে যায়। হাঁটবার সময় দুটি হাত সমানভাবে একই দিকে দুলিয়ে হাঁটলে হাঁটা খুবই কঠিন কাজ। সারা জগৎটাই আসলে ভারসাম্যের খেলা। নাটকও জগতের বাইরের কিছু নয় তাই এক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'[৩৭]

---

৩৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 157।

৩৭. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩০।

নাট্য রচনা থেকে উপস্থাপনা পর্যন্ত সর্বত্রই ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। গুরুগম্ভীর নাটকেও দেখা যায় দু'একটি হাস্যরসের দৃশ্য থাকেই। এর কারণ হচ্ছে নাটকে দুঃখ, ক্রোধ, সংগ্রাম– এইসব যখন খুব গুরুতর আকার ধারণ করে তখন দর্শকের মনেও খুব চাপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একতরফা চাপের ভারে দর্শকের মন তখন একদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কষ্ট পায়। এই কষ্টের চাপটাকে কমিয়ে দুই দিকে ভারসাম্য আনার জন্যই মাঝে-মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করে দর্শক মনকে সুখ দিতে হয়। এই জন্যই ট্র্যাজেডিসহ প্রভৃতি নাটকে এইসব লঘুভার দৃশ্যকে ইংরেজিতে 'ড্রামাটিক রিলিফ'[৩৮] আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নাট্য রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ, কার্যকলাপ সবকিছুতেই লক্ষ্য রাখতে হয় কোনো কিছুরই যেনো একপেশে আধিক্য না হয়। সবকিছু একটা স্তর পর্যন্ত যাওয়ার পর সংযমের দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করতেই হয়।

নাটক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য বজায় রাখা আরো বেশি জরুরি হয়ে ওঠে এই কারণে যে, মঞ্চে উপস্থাপিত নাটক মন দিয়ে বোঝার সঙ্গে-সঙ্গে চোখে দিয়ে দেখা এবং কান দিয়ে শোনার ব্যাপারটাও এসে পড়ে। কাজেই এখানে দেখাবার ও শোনাবার যা কিছু আছে তাতে ভারসাম্য এনে সামঞ্জস্য রক্ষার দায় বর্তায় নির্দেশকের ওপরে। মঞ্চোপস্থাপনার ক্ষেত্রে– 'ক. অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাস খ. মঞ্চ গ. দ্রব্য-সামগ্রী ঘ. পোশাক ঙ. আলোক– এই পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।'[৩৯]

মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কোথায় কীভাবে দাঁড়াবে বা বসবে তা ঠিক করার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যে মঞ্চের একদিক ভারি ও আরেক দিক খালি না দেখায়। মঞ্চের কেন্দ্র লাইন ছাড়া অন্য কোনো এলাকায় যদি একসঙ্গে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী ভীড় করেন তবে অন্যান্য অংশগুলি ফাঁকা দেখায়। সুতরাং চেষ্টা করতে হবে একাধিক শিল্পীর দৃশ্যে যাতে পুরো মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (দৃশ্যের ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে) ছড়িয়ে পরিকল্পনা করা যায়। এই ছড়ানো দু'রকমের হতে পারে– (১) সুসমঞ্জস্য বা সিমেটরিক্যাল,[৪০] (২) অসমঞ্জস্য বা এসিমেটরিক্যাল।[৪১] সুসমঞ্জস্য অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাস হলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কয়েকটি গ্রুপ বা দলে এমন ভাবে ভাগ করা যাতে প্রত্যেক দলেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা মোটামুটি সমান থাকে এবং তার পরে সেই গ্রুপগুলিকে দৃশ্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মঞ্চে বিভিন্নভাবে বিন্যস্থ করা যাতে মঞ্চটা ভরাট বলে মনে হয়। ধরা যাক একটি দৃশ্যে নয়জন অভিনেতা-অভিনেত্রী আছে, তাদের তিনজন করে তিনটি করে তিনটি গ্রুপে নীচের ছবির মতো সাজানো যেতে পারে :

---

৩৮. মোঃ আহমেদুল কবির, নাট্য পরিচালনায় কম্পোজিশন বা বিন্যাস, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (সম্পাদক : আফরোজা পারভিন), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, উনত্রিংশবর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ২০১১, পৃ. ২০।

৩৯. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩০।

৪০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 157।

৪১. Ibid, Page 159।

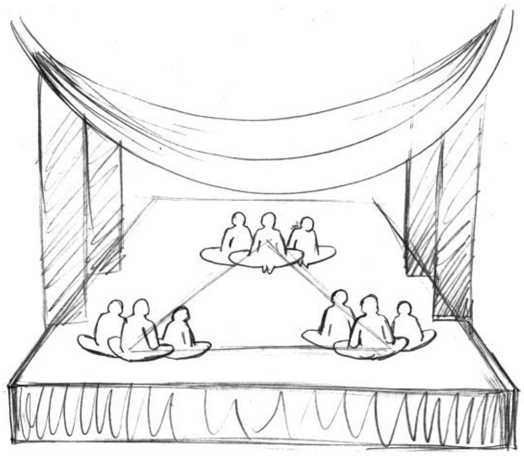

আবার যদি এমন হয় যে ঐ দৃশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা নয় না হয়ে দশ হলো, তাহলে নীচের ছবির মতো সাজালেও তাতে সিমেট্রি বা সামঞ্জস্য থাকবে :

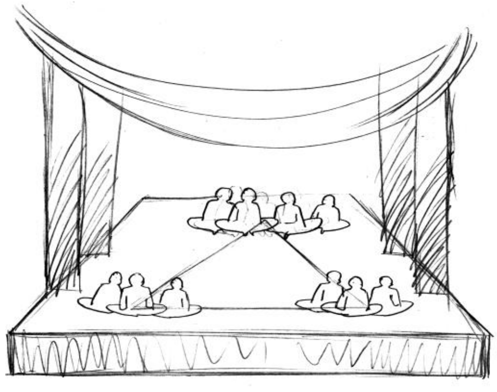

এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ৩+৩+৪ এই সংখ্যায় ভাগ করা হয়েছে। তিনজনের দুই গ্রুপকে মঞ্চে DR ও DL এ সাজিয়ে ৪ জনের গ্রুপকে কেন্দ্রে (বা UC-তে) সাজিয়ে ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। চারজনের গ্রুপে একজন বেশি আছে বলেই তাকে ত্রিকোণের শীর্ষে দিতে হয়েছে। তা না হলে বিন্যাসটা যে দর্শকের চোখে বেখাপ্পা দেখাবে তা নিচের ছবিটা দেখলেই বুঝা যায় :

কিন্তু সব সময় এভাবে সিমেট্রি বা সামঞ্জস্য রাখা যায় না। একটা সভা, বা রাজসভার ক্ষেত্রে এইভাবে সিমেট্রিক্যাল ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব বা জোনাল এ্যাকটিং-এর ক্ষেত্রে কিংবা কোনো একটা ঘটনা ঘটার পরে মানুষ গ্রুপ-গ্রুপ হয়ে সেই ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করছে ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিমেট্রি রাখা যেতে পারে। কিন্তু এমন দৃশ্যও তো আছে সেখানে মানুষের অস্থিরতাটাই প্রধান যেমন একটা ঝড়ের দৃশ্য যেখানে মানুষ ছুটোছুটি করছে, বা যুদ্ধের দৃশ্য এসব ক্ষেত্রে তো আর হিসেব করে গুছিয়ে অস্থিরতা বা উন্মাদনা দেখানো যেতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ভারসাম্য বা এসিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্সের আশ্রয় নিতে হয়।

'অসামঞ্জস্য ভারসাম্য' কথাটা স্ববিরোধী শোনাতে পারে, কেননা 'ভারসাম্য' মানেই হলো সামঞ্জস্য বিধান। কাজেই যদি 'অসামঞ্জস্য-সামঞ্জস্য' বলা হয় তাহলে কথাটা তো স্ববিরোধীই হলো। আসলে কিন্তু তা নয়। আপাতভাবে উদ্ভট শোনালেও সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় এই অসামঞ্জস্যময় সামঞ্জস্য এক শিল্পিত ঐক্য। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ সাজসজ্জার ক্ষেত্রে 'কেয়ারলেস কেয়ার আর্ট'[৪২] বলে একটা কথা চালু আছে। তাতে মনে করা হয় টিপটপ গোছানো সাজসজ্জার চেয়ে একটু কেয়ারলেস বা এলোমেলো সাজসজ্জা আরো সুন্দর। 'একটা লোক পাটভাঙা পাঞ্জাবী, চকচকে জুতো পরেছে, মুখে সুন্দর প্রসাধন করেছে সবই টিপটপ কিন্তু পাঞ্জাবীর বোতামগুলি খোলা, চুলগুলি পালিশ করে আঁচড়ানো কিন্তু সামনে কগাছা চুল হাওয়ায় উড়ছে বা চোখ আড়াল করে কপালে ঝুলছে। একে বলা হয় কেয়ারলেস স্টাইল।'[৪৩] এখানে আপাত এলোমেলোত্ব আসলে একটা সুচিন্তিত শৃঙ্খলার অধীন এবং রীতিমত উদ্দেশ্যমূলক। অনেক শিল্পরুচিসম্পন্ন লোক তাঁদের বসার ঘর সাজাবার জন্য অনেক মূল্যবান ছবি ও মূর্তি ব্যবহার করেন কিন্তু দেখা যায় ঐ মূল্যবান জিনিসগুলিকে সুন্দর ভাবে না সাজিয়ে এমনভাবে রেখেছেন যেনো মনে হবে খুব মূল্যবান সুন্দর বিখ্যাত জিনিষগুলিকে ঘরে নিতান্ত অবহেলায় যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। এতে গোটা বিশৃঙ্খলাটাকে শৃঙ্খলারূপে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য-সুসামঞ্জ্য বা অসামঞ্জস্য ভারসাম্যও অনেকটা এই রকমেরই বিষয়, এখানে সামঞ্জস্যময় সচেতনতায় অসামঞ্জস্যকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পূর্বের ছবিতে দেখানো হয়েছে তিনজনের তিনটি গ্রুপে নয়জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে (বিষয় বা ভাব অনুযায়ী) কীভাবে সিমেট্রিক্যালি সাজানো যায়। এবার নীচের ছবিতে দেখানো হলো, সেই নয়জন অভিনেতা-অভিনেত্রীই এসিমেট্রিক্যালি বা আসামঞ্জস্য বা এলোমেলো বিশৃঙ্খলায় সাজিয়েও মঞ্চে সৌন্দর্য রক্ষিত হয় :

৪২. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩২।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

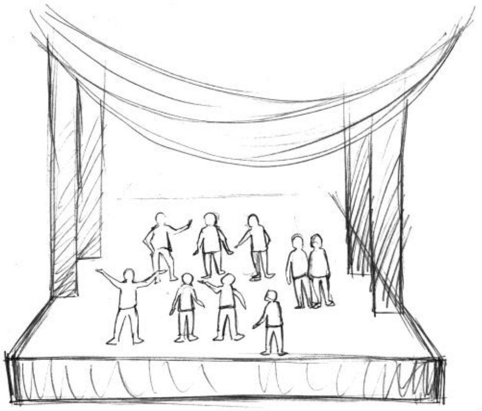

এইভাবে বুঝে পরিকল্পনা করলে যে কোনো দৃশ্যে ভাবানুসারে যে কোনো সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্রীই এমনভাবে বিন্যাস করা সম্ভব যাতে মঞ্চে ভারসাম্য থাকে।

পূর্বের অংশে স্ট্যাবিলিটি বা দৃঢ়তার কথা বলতে গিয়ে যে মঞ্চ ভরাট করার কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এই ব্যালেন্স বা ভারসাম্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, চিন্তা করলেই এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। মঞ্চে ভারসাম্য যে শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়েই রক্ষা করা হয় তা নয়, মঞ্চে যে দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেগুলিকেও সিমেট্রিক্যালি অথবা এসিমেট্রিক্যালি সাজিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। দ্রব্য-সামগ্রীকে ভারসাম্য রক্ষা করে পরিকল্পনা একেক সময় বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কেননা দ্রব্য-সামগ্রী পরিকল্পনাকারির ক্ষেত্রে শুধু শৃঙ্খলা বা সৌন্দর্যের দিক দেখলেই চলে না, দৃশ্যে সেগুলির ব্যবহারের প্রয়োজনের দিকটাও ভাবতে হয়। ধরা যাক, একটা দৃশ্যে প্রয়োজন হলো তিনটি সোফা একটি টেবিল ও একটি বইয়ের শেল্‌ফ– এই মোট পাঁচটি দ্রব্য-সামগ্রীকে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সবগুলি দ্রব্য-সামগ্রীকে কাছাকাছি রাখতে হবে অথচ অভিনয় করার জন্য কেন্দ্র বা সেন্টার স্টেজে প্রচুর জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, এক্ষেত্রে যদি নিচের ছবির মতো পরিকল্পনা হয় তবে ভারসাম্য থাকছে না :

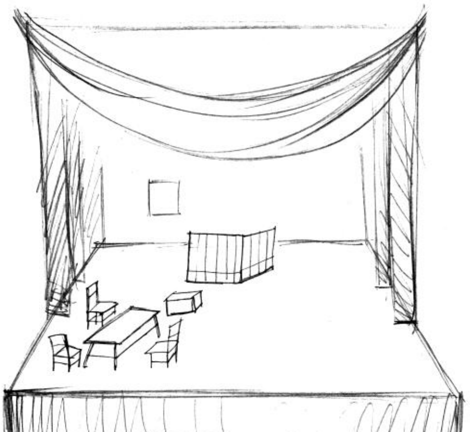

এতে মঞ্চের একদিক ভারি হয়ে উঠছে আর একটি দিক খালি, খা-খা করছে। অথচ এছাড়া আর অন্য ভাবে পরিকল্পনার কোনো উপায় নেই কেননা দৃশ্যের বিষয়গত প্রয়োজন চাইছে সব একজায়গায় থাকবে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে খালি মঞ্চ এলাকায় অন্য কোনো একটা দ্রব্য-সামগ্রী রাখা। কিন্তু দুই কারণে সেটা পারা যাচ্ছে না। প্রথম কারণ হচ্ছে– 'খালি জায়গায় কিছু রাখা যাবে না, কেননা অভিনয় করার জায়গা রাখতে হবে।'[৪৪] দ্বিতীয় কারণ হলো– 'মঞ্চে যা প্রয়োজন নেই তেমন যা-তা একটা কিছু রেখে দিলে দৃশ্যের সঙ্গে তার কেনো যৌক্তিক সম্পর্ক থাকে না। মঞ্চে যা কিছু থাকবে সেগুলো থাকার একটা যৌক্তিকতা প্রয়োজন নইলে তা অযথা এবং অনর্থক রূপে তা দর্শক দৃষ্টিকে লক্ষ্যচ্যুত করবে।'[৪৫]

তাহলে এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার উপায় কী? এই উপায় মঞ্চ-পরিকল্পক এবং নির্দেশককে যৌথভাবে উদ্ভাবন করতে হয়। নিচের ছবিতে এর একটা সমাধান দেখানো হলো :

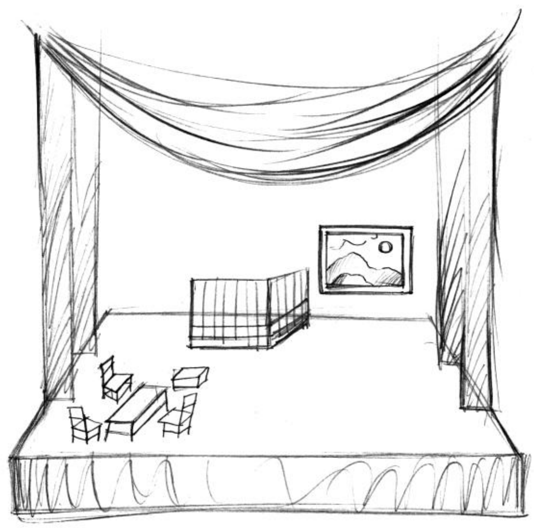

এখানে মঞ্চের খালি স্থানের দেয়ালে একটি জানালা তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে একসারি পর্বতের দৃশ্য দেখানো হলো। এতে খালি স্থানের প্রায় সমতুল্য ভারই ন্যস্ত করা হলো, অথবা এ্যাক্টিং স্পেস বা অভিনয়ের স্থান পুরোই থাকলো, আর যে জানালা দেওয়া হলো দৃশ্যে তার থাকার যুক্তিও রইলো অভিনয়কালে জানালা ব্যবহারও করা যেতে পারে। কঠিন সময়ে এইভাবে প্রয়োজন হলে সমাধান উদ্ভাবন করতে হয়।

এখানে একটি কথা মনে হতে পারে যে দ্রব্য-সামগ্রী এক স্থানে জমে যাওয়ার ফলে মঞ্চের যে অংশ খালি থাকছে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সেখানে থাকলেই তো ভরাট হয়ে ভারসাম্য ফিরে আসবে। এটা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো চলতে পারে কিন্তু তা সাধারণ নিয়ম নয়। অন্য নির্ভর না হয়ে মঞ্চ উপকরণ ও আসবাবপত্রের নিজস্ব ভারসাম্য থাকা উচিত নইলে শেষ পর্যন্ত আসবাবপত্রই অভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪৪. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৪।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

অর্থাৎ প্রয়োজন হলে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী এসে সোফায় বসতে পারছে না কেননা তা হলে মঞ্চের একাংশ খালি দেখাবে। কিন্তু তা তো হয় না, আসবাবপত্র অনুসারে তো দৃশ্য এবং অভিনয় চলে না, দৃশ্য এবং অভিনয় অনুসারেই দ্রব্য-সামগ্রী থাকে।

এইভাবে দ্রব্য-সামগ্রীর মতোই সেট সেটিং যা আছে তাতেও ভারসাম্য আনতে হয়। এখানে সিমেট্রিক্যাল ও এসিমেট্রিক্যাল এই যে দুই প্রকারের ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে এছাড়াও আর এক প্রকারের ভারসাম্য আছে তাকে বলে 'এসথেটিক ব্যালেন্স'[৪৬] বা নান্দনিক ভারসাম্য। এই এসথেটিক ব্যালেন্স পুরোপুরি শিল্পবোধের ব্যাপার। দৃশ্যে ব্যবহৃত গাছপালা, পাহাড়, পর্বত, বিস্তীর্ণ সমুদ্র প্রভৃতির আকার, তাদের ভর বা ম্যস, তাদের রঙ, আলোর রঙ এবং ঔজ্জ্বল্য সর্বোপরি দৃশ্যের মূল মেজাজ বা মুড– ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে শিল্পগত ভারসাম্য প্রয়োজন। 'এটা লিখে বোঝানো বেশ কঠিন কারণ শিল্পবোধ জন্মায় চর্চার ফলে ঠিক যেমন গানের ভালোমন্দ লেকচার দিয়ে বোঝানো যায় না, গানের কান তৈরি হলে সুরের ভালমন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বোঝা যায়। দর্শক যে সুন্দর বস্তু বা ভাবকে উপভোগ করে সেক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্যের খেলা অদৃশ্যভাবে চলতে থাকে, এই ভারসাম্য কোনো কারণে নষ্ট হলে উপভোগে বাধা জন্মায়।'[৪৭]

উপভোগ এবং উপলব্ধি অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ, কিন্তু ঐ অখণ্ড উপলব্ধি আসে খণ্ড-খণ্ড বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দিয়ে এবং ঐ উপাদানগুলি স্বতন্ত্রভাবে দর্শকের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রবেশ করে মনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে এক অখণ্ড রূপ লাভ করে। 'দৃশ্যের রঙ ও আকারগত দিকটি যেমন চোখের ভেতর দিয়ে গিয়ে মনে প্রতিফলিত হয় তেমনি– সংলাপ, সংগীত প্রভৃতি শব্দ কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে মনে প্রতিফলিত হয়, এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে বিভিন্ন উপাদান খণ্ডিতভাবে মনে প্রবেশ করলেও শেষ পর্যন্ত দৃশ্যবস্তুর যে উপলব্ধি জন্মায় তা খণ্ড-খণ্ড নয়, অখণ্ড সম্পূর্ণ এক ভাব।'[৪৮] এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যদি ভারসাম্য না থাকে তবে যে ভাবটা মনে জাগ্রত হয় তা আর অখণ্ড বা সুসম্পূর্ণ না হয়ে খণ্ডিত হয়ে যায় এবং উপলব্ধিকে ক্ষুব্ধ করে তুলে। 'একটা দৃশ্য দেখে যদি মনে হয় 'দারুণ আলো দিয়েছেন আলোক পরিকল্পক' তখন বুঝতে হয় আলোই দৃশ্যের ভারসাম্য নষ্ট করেছে কেননা দৃশ্যবিষয়ের যে মুড বা ভাব সৃষ্টি হয় তাতে আলোর রঙ, সংগীতের ধ্বনি, বিন্যাসের চিত্র সব একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবার কথা, তার মধ্যে হাঠাৎ আলোটা প্রধান হয়ে গেলে আলোর দিকটাই ভারী হয়ে উঠবে– মূল যে মেজাজ তা লঘু হয়ে যায়।'[৪৯] এতে রসিকজনের মেজাজ বিগড়ে যাবার সম্ভানাই প্রবল।

---

৪৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 161।

৪৭. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৫।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

এইভাবে দৃশ্যে ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, আলোক, দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শৈল্পিক যে ভারসাম্য দরকার তা অনুশীলনের মধ্যে আয়ত্ত করা ছাড়া অন্য বিকল্প উপায় বা পন্থা নেই। তাই শিল্পের সিদ্ধি ঘটে ধ্যানমগ্ন অনুশীলনে।

২. দৃশ্যায়ন (পিক্‌চারাইজেশন)

প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য নাট্য সমালোচকের মতে দৃশ্যায়ন হচ্ছে :

> Picturization is storytelling by a group of actors. It is brought about by the combined use of composition (the arrangement of the group), gesture (the individual moving within his own sphere), and improvisation with properties (objects added to composition and gesture) for the specific purpose of animating the dramatic action. Note that although gesture pertains only to the individual, picturization concerns a group of actors (two or more) in wich each actor uses the gestures appropriate to his own character, picturization, then, is a still picture containing detailed illustrations brought about by individualizing and personalizing composition through the use of gesture and properties to tell the story of the group।[৫০]

দৃশ্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মঞ্চে চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্টকরণ। সংলাপ নয়, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফুট করা। সেহেতু বলা হয়– ‘Picturization is the visual interpretation of each moment in the play।’[৫১] বিন্যাস (কম্পোজিশন) কেবলমাত্র প্রস্তুত করে মঞ্চ দৃশ্যের ভাব, চরিত্রের চিন্তা, আবেগ ইত্যাদিকে প্রকাশের মধ্যমে নাট্য কাহিনিকে অর্থপূর্ণভাবে এগিয়ে নিয়ে চলে। ‘ব্যক্তিগত জীবনের আচার-আচরণের মানুষ তার আবেগ, ভালো-মন্দ অনুভূতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে শারীরিক যে নৈকট্য ও বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ঘটায়, দৃশ্যায়নে নাট্য-নির্দেশক সেই অভিজ্ঞতাকেই ব্যবহার করতে পারেন। প্রত্যেকটি দৃশ্য ও ঘটনাক্রমের গুরুত্ব বিচারে নির্দেশক চরিত্র সমূহের অবস্থান এবং শারীরিক ক্রিয়া স্থির করে দেয়।’[৫২] এক কথায় দৃশ্যায়ন বা পিকচারাইজেশন হচ্ছে নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রগুলোকে মঞ্চে এমন ভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে চরিত্রগুলোর পরস্পরের প্রতি যে আবেগময় সম্পর্ক ও মনোভঙ্গি এবং দৃশ্যের যে নাটকীয় পরিস্থিতি রয়েছে তা যেন কোনো সংলাপ বা ক্রিয়া ছাড়াই দর্শকের বোধগম্য হয়। নীচের ছবিটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে :

---

৫০. Francis Hodge, *Play Directing- Analysis,Communication and Styie,* Printed in the United States of America, New Jersey 07632, 1994, Page 134।

৫১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 173।

৫২. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১১৭।

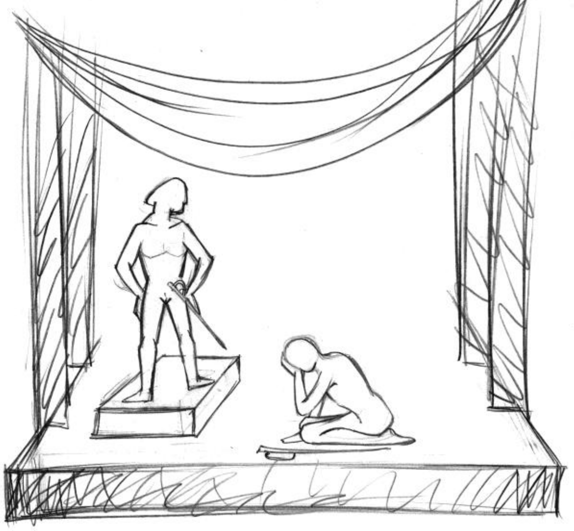

এই ছবিতে অঙ্কিত চরিত্ররা নড়াচড়া করছে না, সংলাপও বলছে না। কিন্তু চরিত্রগুলোকে এমন স্থানে এমন ভঙ্গিতে স্থাপন করা হয়েছে যাতে চরিত্রগুলোর মধ্যে আবেগময় সম্পর্কটি তিক্ত না মধুর তা পরিষ্কার বোঝা যায়। দৃশ্যের পরিস্থিতি বা সিচুয়েশনটি কী তাও অনেকখানিই এই ছবি নীরব ভঙ্গিতে বলে দিচ্ছে।

দৃশ্যায়নের কাজ হলো এইভাবে অবস্থান, শরীর ভঙ্গি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে নাট্য কাহিনি প্রকাশে সহায়তা করা। দৃশ্যায়নের মধ্যে গল্প বলার দিকটাও থাকে। দৃশ্যায়নের সময় মনে রাখতে হয়, যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও যেনো শুধু চোখে দেখেই নাটকের দৃশ্যের অর্থ বুঝতে পারে, আবেগ অনুভব করতে পারে। এবারে প্রশ্ন দৃশ্যায়ন আর বিন্যাসের মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কী?

'বিন্যাসের উদ্দেশ্য' আলোচনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিন্যাস নাটকের কাহিনি বা গল্প বলে না। বিন্যাস শুধুই নাটকের 'ভাবমূর্তি' প্রকাশ করে। কাজেই দৃশ্যায়ন আর বিন্যাসে মূল পার্থক্যই হলো– 'বিন্যাস নাটকের শুধু মেজাজটাই প্রকাশ করে। গল্প বলে না। চরিত্রের আবেগ-সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে না। দৃশ্য পরিস্থিতির বর্ণনা দেয় না। কিন্তু দৃশ্যায়ন বহুলাংশেই গল্প বলে। চরিত্রের আবেগ-সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে, দৃশ্য পরিস্থিতি প্রকাশ করে। বিন্যাস দৃশ্যের মুড বা মেমাজ বা ভাবমূর্তির প্রকাশক। দৃশ্যায়ন দৃশ্যের অর্থ প্রকাশক।'[৫৩] 'খড়ের কাঠামো আর পূর্ণাঙ্গ প্রতিমাতে যে পার্থক্য বিন্যাস আর দৃশ্যানের মধ্যেও সেই পার্থক্য।'[৫৪]

---

৫৩. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 173।

৫৪. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৬-৩৭।

দৈহিক প্রকাশ এবং অন্যান্য চরিত্রের সাথে সম্পর্ক

দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে চরিত্রের দৈহিক প্রকাশ এবং পার্শ্ব চরিত্রের সাথে আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাত্যহিক জীবনে এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির সম্পর্ক এবং তার শারীরিক অভিব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট গল্প বলার তাৎপর্য। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদের তাদের থেকে দূরে রাখে যাদেরকে আমরা অপছন্দ, অবিশ্বাস এবং বিরোধিতা করি, বিপরীত দিকে তাদের কাছে নিয়ে যায় যাদেরকে আমরা বিশ্বাস করি, প্রশংসা করি, মেনে নেই ও ভালোবাসি। এছাড়া ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, শ্রেণিগত ও অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও দৈহিক প্রকাশ ভিন্নতর হয়ে ওঠে। যেমন– 'সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসীর সাথে একজন মেধাবী ছাত্রের দৈহিক প্রকাশের পার্থক্য। মানুষের মনের আবেগ, অনুভূতি এবং অবস্থাই নির্দেশককে পরিচালিত করে চরিত্র সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুযায়ী দৃশ্যে চরিত্রের পারস্পরিক অবস্থান কোথায়। দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হচ্ছে চরিত্রের সাথে অপর চরিত্রের আবেগ-সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা।'[৫৫] উদাহরণস্বরূপ গল্প বলার অবস্থানের মাধ্যমে যদি দু'জন ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে তাদের দৈহিক প্রতিক্রিয়া এবং মনোদৈহিক সম্পর্ক একটি নিশ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যে, ব্যক্তি দুজন কী 'ক্রিয়া' করছে।

দৃশ্যের নামকরণ

দৃশ্যায়নের জন্য দৃশ্যের নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি নাটক অনেকগুলো দৃশ্য দ্বারা সুবিন্যস্ত করা হয়। নাট্যকার নাটকের মূল কাহিনি বা বিষয়বস্তুর জন্য প্রত্যেক দৃশ্যেই একটি ভাবনা বা ধারণা পরিবেশন করেন। প্রায়ই কোনো নতুন চরিত্রের প্রবেশ দ্বারা দৃশ্যটি চিহ্নিত হয় এবং চরিত্রটি নাটকের মূল ভাবনার অংশ হিসেবে বর্তমান বিষয়বস্তুকে পরিবর্তন করে। একটি দৃশ্যে একই সাথে দুটি বিষয় বা ভাবনা থাকতে পারে। এ ধরনের কোন দৃশ্য প্রয়োজনাভেদে দুটি দৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্দেশককে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে হয়। কারণ 'একটি দৃশ্যের মূল ভাবনা বা সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া অর্থপূর্ণ দৃশ্যায়ন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। দৃশ্যের মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হলেই সেই দৃশ্যের সুনির্দিষ্ট নামকরণ করা যেতে পারে।'[৫৬]

৫৫. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 174।
৫৬. Ibid, Page 176।

দৃশ্যের শ্রেণিবিভাগ

দৃশ্যায়নের জন্য দৃশ্যের মূল বিষয়বস্তু বা ভাবনাকে চিহ্নিত করাই নির্দেশকের একমাত্র কাজ নয়। বরং ভাবনাকে প্রকাশ করার কৌশল জানতে হয়। যেকোনো দৃশ্য চারটি পরিকল্পনা কৌশলের কোনো না কোনো একটি দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন :

ক. প্রাসঙ্গিক ক্রিয়া

খ. নেপথ্য দৃশ্য

গ. মূল নাট্যক্রিয়ার দৃশ্য

ঘ. নাট্য আবেগ-সম্পর্কিত দৃশ্য [৫৭]

ক. প্রাসঙ্গিক ক্রিয়া

প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াগুলো মূল ক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু এই দৃশ্যগুলোর মধ্যদিয়ে চরিত্রের উন্মোচন, পারিপার্শ্বিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ফুটে ওঠে। উক্ত দৃশ্যগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক কিছু দৃশ্য বলে মনে হতে পারে। মূলত এই দৃশ্যগুলো মূল ক্রিয়াকেই সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করে। নাটকের উন্মোচনকে সমৃদ্ধশালী করতে প্রাসঙ্গিক ক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– চা পানের দৃশ্য, তাস খেলার দৃশ্য ইত্যাদি।

খ. নেপথ্য দৃশ্য

নেপথ্য দৃশ্যগুলো নাটকের সময়, ঘটনাস্থল, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাকে নির্দিষ্ট করে এবং উপঘটনা ও সংলাপ দ্বারা মূল ক্রিয়াকে গতিশীল করে। অর্থাৎ নাটকের মূল ঘটনার সময়, ঘটনাস্থান, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাকে প্রকাশ করার জন্য এমন কিছু দৃশ্য তৈরি করা হয় যা দৃশ্যের অন্তর্গত অপ্রধান চরিত্রের সংলাপের মধ্যদিয়ে মূল ক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন– 'ডাক্তারের চেম্বারে অপেক্ষা দৃশ্যে রেড-ক্রিসেন্টের প্রতীক খচিত সাদা পর্দা দেয়া রুমে দু'একজন নার্সের প্রবেশ-প্রস্থান বা তাদের দু'একটি সংলাপ মূল ক্রিয়ার পটভূমি তৈরি করে দেয়।'[৫৮]

---

৫৭. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 178-179।

৫৮. Ibid, Page 179।

গ. মূল নাট্যক্রিয়ার দৃশ্য

এই ধরনের দৃশ্য গল্পের মূল ক্রিয়া ও অবস্থাকে ধারণ করে কাহিনিকে গতিশীলরূপে উপস্থাপন করে। 'মূল ক্রিয়ার প্রতি কেন্দ্রীভূত মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত দর্শককে নাটকের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। নাটকের মূল বিষয়বস্তু ও ভাবনার প্রকাশ ঘটে এই দৃশ্যে।'[৫৯] যেমন– প্রধান চরিত্রকে গ্রেফতার করা, চরিত্রের স্বীকারোক্তি, বাবা পুত্রকে বলছে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ইত্যাদি।

ঘ. নাট্য আবেগ-সম্পর্কিত দৃশ্য

এ দৃশ্যগুলোতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র ফুটে ওঠে। যেমন– 'কোনো পারিবারিক আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠানে মিলিত হওয়া ছয়জন অতিথিই প্রত্যেকে প্রত্যেককে চোর হিসেবে সন্দেহ করছেন।'[৬০]

মঞ্চের সহজাত ভাবমূল্য

মঞ্চের সহজাত ভাবমূল্য থাকে এবং এই সহজাত ভাবমূল্য আনয়নের জন্য আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা মঞ্চের তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মনে করেন। যথা :

ক. মঞ্চ ক্ষেত্র

খ. মঞ্চ সমতল

গ. মঞ্চ স্তর[৬১]

ক. মঞ্চ ক্ষেত্র

মঞ্চে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের একটি ভাবমূল্য থাকে। স্থানের পরিবর্তনের সাথে-সাথে ভাবমূল্য পাল্টে যেতে পারে। যে দৃশ্যের ভাব যেমন সেটা বুঝে সেই মঞ্চ ক্ষেত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি বাস্তবধর্মী নাটকে কমপক্ষে তিনটি মঞ্চ ক্ষেত্র থাকতে পারে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্তত দুটি চরিত্রের বসার এবং দাঁড়ানোর জায়গা থাকতে পারে। মূলত অভিনয় ক্ষেত্র যতো বেশি থাকে নাটকটি ততো বেশি বৈচিত্র্যময় হতে পারে। কোন দৃশ্যে কী ভাব তা জেনে সেই ভাব অনুযায়ী মঞ্চ ক্ষেত্র নির্বাচন করলে নাটকটির ভাবমূল্য অটুট থাকে।

---

[৫৯]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 178-179।

[৬০]. Ibid, Page 179।

[৬১]. Ibid, Page 180।

'তবে নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, অভিনেতা-অভিনেত্রী যেন একই মঞ্চ ক্ষেত্রে বেশিক্ষণ অবস্থান না করে।'[৬২]

এতদ্‌ব্যতীত দৃশ্যায়নে মঞ্চ ক্ষেত্রের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক নাট্যদৃশ্যের পৃথক-পৃথক ভাবমূল্য আছে। 'গুরুত্ব অনুসারে মঞ্চক্ষেত্র ব্যবহারের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা থেকে মঞ্চ ক্ষেত্র ব্যবহারের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই মঞ্চতলের নিজস্বমূল্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তালিকাটি নিম্নরূপ'[৬৩] :

মঞ্চ ক্ষেত্র	দৃশ্যভাব	দৃশ্যায়ন
DC ডাউন সেন্টার	নিস্তব্ধতা, সরলতা, কঠোরতা, তীব্রতা	শোক, একক চিন্তা, যুদ্ধ, কলহ, সংকট, মা-ছেলে বা বাবা-ছেলের একান্ত দৃশ্য, নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্য
DR ডাউন রাইট	ঘনিষ্ঠতা, প্রীতি, হতবুদ্ধিতা	অন্তরঙ্গ দৃশ্য, বর্ণনামূলক দৃশ্য, স্বীকারোক্তিমূলক দৃশ্য
DL ডাউন লেফট	যথাযথ সম্পর্ক, সম্পর্কের দূরত্ব	ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, আবেগবর্জিত দৃশ্য, স্বগতোক্তি
UC আপ সেন্টার	রাজকীয়ভাব, মহত্ব, দৃঢ়তা, স্থায়ীত্ব, পৃথকত্ব	রাজসভা, বিচারসভা, ঘোষণা, লড়াই
U R আপ রাইট	দূরত্ব, অবাস্তব	কল্পনা বা দূরত্ববোধক দৃশ্য
U L আপ লেফট	ভৌতিক, দৈবিক, হতাশা, শূন্যতা	আদিভৌতিক, বিভাজন বা পরাজয়, পতন ইত্যাদি দৃশ্য

৬২. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 180।
৬৩. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১১৮।

খ. মঞ্চ সমতল

নাট্য-নির্দেশককে মঞ্চের সমতল সম্পর্কে সচেষ্ট থাকতে হয়। কারণ চরিত্রটি যতবেশি সম্মুখ মঞ্চের সমতলে আসবে ততো বেশি গুরুত্ব পায়। 'চরিত্রটি যতবেশি ওপর মঞ্চের সমতলে যায় ততোবেশি গুরুত্বহীন হয়। নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে অপ্রধান চরিত্র এসে প্রধান চরিত্রকে ছাপিয়ে না যায়।'[৬৪] এক্ষেত্রে নির্দেশক মঞ্চে অতিরিক্ত জায়গা রাখতে পারেন।

গ. মঞ্চ স্তর

মঞ্চ স্তরের ভাবমূল্য অনুসারে যে চরিত্র যে স্তরের তাকে সেই স্তরেই রাখা যেতে পারে। যেমন– 'সফোক্লিসের *রাজা ইডিপাস* নাটকে যাজক জনগণের এবং রাজার সন্নিকটে অতত্রব তাকে একটি মঞ্চ স্তরে রাখতে হয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে।'[৬৫]

দৃশ্যায়নের সাতটি পদক্ষেপ

নির্দেশক নাট্য দৃশ্যায়নের সময় নিম্নলিখিত ৭টি বিষয় মেনে চলতে পারেন। যেমন :

ক. দৃশ্যের পরিস্থিতি, মূল ভাব বা অর্থ কী তা সংক্ষেপে শিরোনাম আকারে লিখে নেয়া, যেমন– 'লড়াইয়ের দৃশ্য, প্রেমের দৃশ্য, অত্যাচারের দৃশ্য, অভ্যুত্থানের দৃশ্য, সুষ্ঠ বিচারের দৃশ্য ইত্যাদি। এটা দৃশ্যায়নের ভিত্তির কাজ করে।'[৬৬]

খ. পরিস্থিতির মধ্যে কী মুড বা মেজাজ অন্তর্নিহিত আছে তা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। এতে দৃশ্যায়নের বিভিন্ন উপাদানকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ধরা যাক, একটি প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতিতে বিবাহের ভোজসভার দৃশ্যের মূল মেজাজ সাফল্যের অনাবিল আনন্দ। এটা সুষ্ঠুভাবে বুঝে তারপর চরিত্রগুলোর শরীর-ভঙ্গি কী হবে, আসবাবপত্র কোথায় কেমনভাবে থাকবে, দৃশ্যে কী রঙয়ের প্রাধান্য থাকা উচিত হবে ইত্যাদি সবকিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়। 'এইভাবে মরা বাড়ির মুড বেদনাবহ বা দুজন রমণী একজন বিচারকের (সলোমনের) কাছে এসে দুজনেই একটি শিশুর মাতৃত্ব দাবি করে দৃঢ়তা, আবেদন, রাগ ও

[৬৪]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 181।
[৬৫]. Ibid, Page 182।
[৬৬]. Ibid, Page 183।

ঘৃণা প্রকাশ করছে।'[৬৭] অতত্রব পরিস্থিতির মুড বা মেজাজ জানলে সে দৃশ্য দৃশ্যায়নের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সহজ হতে পারে।

গ. বিন্যাসের দ্বারা যতটুকু মুড বা মেজাজ প্রকাশ করা যায় দৃশ্যায়নের সময় সেটার কথা মনে রাখা যেতে পারে। কারণ লাইন, ম্যাস এবং ফর্ম দ্বারা সকল ভিন্নতাকে সমন্বিত করা যায়। উৎকণ্ঠাপূর্ণ পরিবেশে যে ছয়জন অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবিশ্বাস করছে তা পরিব্যাপ্ত ম্যাস, অনিয়মিত লাইন এবং ফর্মের মাধ্যমে দৃশ্যায়ন করা যেতে পারে এবং সুষ্ঠু বিচার দৃশ্যে দুজন মহিলাই শক্ত অবস্থান, দৃঢ়তা ও ভারসাম্য নিয়ে অবস্থান করছে, পাশাপাশি দাম্ভিক বিচারকের জন্য উচ্চতল ব্যবহার করা হয়েছে। 'এই দ্বান্দ্বিক পরিবেশে আপাত দৃষ্টিতে রমণীদের ডাইগনাল লাইনে অবস্থান এবং তার মধ্য থেকে বিচারকের একটি শক্তিশালী পারপেন্ডিকুলার লাইন ও উচ্চতল ব্যবহার মুড বা মেজাজ প্রকাশে যথাযথ ভূমিকা রাখছে।'[৬৮] অতত্রব মুড বা মেজাজ প্রকাশের জন্য লাইন, ম্যাস ও ফর্মকে নিয়ে ভাবা যেতে পারে। কারণ খড়ের কাঠামো বাদ দিয়ে ব্যাখ্যাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা হতে পারে না।

ঘ. দৃশ্য বস্তুর পটভূমিকার কথা মনে রেখে দৃশ্যায়ন করা যেতে পারে। দৃশ্য পরিস্থিতি, চরিত্র, সেট-সেটিং সবকিছুরই একটা পূর্বতন পশ্চাৎপট আছে যা থেকে এগুলির উদ্ভব ঘটেছে। দৃশ্যে যে পরিস্থিতি বর্তমান তা পূর্বের কোনো ঘটনা থেকেই উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ– 'দেখানো হলো দৃশ্যে একটি থমথমে ভাব। কেন থমথমে? কারণ পূর্বের দৃশ্যে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে যা জনসাধারণকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে এবং জনগণ এর বদলার জন্য নিরবে প্রস্তুত হচ্ছে। মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রত্যেকেই বাচ্চাটিকে নিজের বলে দাবি করছে। দৃশ্যটি সলোমনের কোর্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চরিত্রগুলির পশ্চাৎপট তার সামাজিক অবস্থা, তার পারিবারিক স্তর, তার শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি।'[৬৯] এগুলির কথা মনে রাখলে একটি দৃশ্যের দৃশ্যায়ন শুধুমাত্র সেই দৃশ্যেরই ব্যাখ্যা করে না সমগ্র নাটকের কথা প্রকাশ এবং সমন্বিত করে।

ঙ. চরিত্রগুলির শরীর ভঙ্গিকে এমনভাবে স্থাপন করা যায় যাতে পরস্পরের মধ্যে যে আবেগময় সম্পর্ক ও মনোভঙ্গি বিদ্যমান তা প্রকাশ পায়। যেমন– 'বিচারকের অবস্থান এবং তার পিছনে দুজন প্রহরীর মাধ্যমে তাকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। মহিলা দুজন বিচারকের সামনে পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করানো যেতে পারে যাতে করে তাদের শারীরিক ভঙ্গিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ পায়। শিশুটিকে আনুভূমিক অবস্থায় মঞ্চে

---

৬৭. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 183।

৬৮. Ibid, Page 183-184।

৬৯. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৭।

শুইয়ে রাখা যেতে পারে যেখান থেকে বিচারক এবং দুই মায়ের দূরত্ব সমান হয়। এভাবেই চরিত্রের সম্পর্ক ও মনোভঙ্গি প্রকাশ করা যেতে পারে।'[৭০]

চ. দৃশ্যায়নের সময় চরিত্রগুলোকে প্রাথমিক প্রতিস্থাপন করার পর সুনির্দিষ্টভাবে এবং আলাদা করে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং বস্তুর প্রতি জোর প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যাসের বিভিন্ন কৌশল যেমন– 'গুরুত্ব, দৃঢ়তা, পর্যায়ক্রম এবং ভারসাম্য ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারকের শারীরিক ভঙ্গিকে কেন্দ্রীভূত করে মা দুজনকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সুষম ভারসাম্য তৈরি করা যেতে পারে।'[৭১] যথাযথ গুরুত্ব, দৃঢ়তা, পর্যায়ক্রম ও ভারসাম্য হচ্ছে কিনা শুধু এগুলোই লক্ষ্য করলে চলবে না বরং কোনোরূপ একঘেয়েমী পরিহার করে কতটা বৈচিত্র্য অর্জন সম্ভব সেটার প্রতিও লক্ষ্য রাখা যায়।

ছ. নির্দিষ্ট দৃশ্যায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আবেগ প্রকাশ করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ আবেগকে স্পষ্ট করে তোলে যে সে কোন চিত্রকে চিত্রন করছে। এজন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পর্যবেক্ষণলব্ধ কিছু কৌশলগত দক্ষতাও জানা দরকার হয়। যেমন– 'যদি চরিত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় তবে সে দৃঢ় পদসঞ্চালন এবং সম্মুখ দিকে ঋজু শরীর দ্বারা প্রকাশ করতে পারে। যদি সে ভীতু হয় তবে সবসময় হীনভাবে নতো শরীর দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে মানুষের শরীরের ছন্দের সঙ্গত আবেগময় ভাষা যা অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রকাশ করে এবং দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষণিক আবেগ এবং আবেগীয়সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দু'জন মায়ের স্বতন্ত্র দুরকম আবেগ কাজ করে যা দুজন দুজনকে ঘৃণা করা এবং বিচারকের প্রতি উভয়ের সনির্বন্ধ আবেদন। এই দুটি বিপরীতধর্মী আবেগীয় শারীরিক অবস্থানের মাধ্যমে চরিত্রের শারীরিক ছন্দ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব।'[৭২] অতত্রব প্রত্যেক চরিত্রের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ও একান্ত ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রকাশ যেন দৃশ্যায়নে ঘটে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রত্যেকটি গতিবিধি আসলে এক-একটি দৃশ্যগত ব্যাখ্যা। অতত্রব নাট্য-নির্দেশক প্রতিটি দৃশ্য ও ঘটনাক্রমের গুরুত্ব বিচার করে অভিনেতা-অভিনেত্রী স্থাপন করে দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা করেন।

---

৭০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 184।

৭১. Ibid, Page 184।

৭২. Ibid, Page 184।

৩. চলন (মুভমেন্ট)

মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রগুলোর ক্রিয়া-কর্মকেই চলন বলা যায়। প্রধানত চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান, সংলাপের সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন, অর্থ প্রকাশক সংলাপহীন অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদিই চলনের আলোচ্য বিষয়। ইংরেজি কথা 'মুভমেন্ট'র বাংলা চলন হতে পারে। জনৈক নাট্যবিজ্ঞানী চলনের সংজ্ঞা দিয়েছেন– 'Is the stage Picture in action।'[৭৩] বাংলা করলে তার মানে দাঁড়ায় 'ক্রিয়াতে মঞ্চ দৃশ্য'। দৃশ্যায়ন আলোচনায় যে সংলাপ ও ক্রিয়াহীন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে– সেই দৃশ্যে চলন যুক্ত হয়ে যে গতিশীল দৃশ্য তৈরি হয় তাই মঞ্চ দৃশ্য। বিন্যাসের ভেতর দিয়ে দৃশ্যায়নের দিকে যেতে হয়। দৃশ্যায়ন ধারাবাহিকভাবে কতগুলো ছবি। ছবিগুলো হয় স্থির। ছবিগুলো তৈরি হয় চলনের মাধ্যমে। প্রতিটি চলনের পরিবর্তনের মাধ্যমে ছবিগুলো বদলে যায়। চলনের কারণে অর্থও পাল্টায়। একটি ছবি থেকে আরেকটি ছবিতে যেতে সাহায্য করে চলন। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতেও চলনের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি চলনই এক একটি ছবি তৈরি করে। আর প্রতিটি ছবি এক একটি অর্থ প্রকাশ করে। ক্রিয়াশীল মঞ্চে ছবি তৈরি হয় চলনের মাধ্যমে। চলন ও বিন্যাসের মূল পার্থক্য হচ্ছে– 'চলন প্রকাশ করে মঞ্চে ক্রিয়ারত কোনো চরিত্র বা চরিত্রসমূহের বিশেষ ভাবকে। সমালোচকদের মতে কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চক্ষেত্রে হাঁটা-চলাই চলনের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরীরের সমস্ত রকম ভঙ্গিই চলনের অন্তর্ভুক্ত। চলনের কৌশলগত এবং ভাবগত মূল্য থাকে। আবার এর দৃশ্যগত মূল্যও লক্ষণীয়।'[৭৪] তাই নির্দেশক সাধারণত– চরিত্রের মূল্য নির্ধারণে, বৈচিত্র্য আনায়নে, ভাব প্রকাশে ও চরিত্রকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য চলনের ব্যবহার করতে পারেন। নাট্যবেত্তার মতে :

> Movement is the actual transit of an actor from one point on the stage to another. Although it includes gesture in that the body sphere is always animated during the process of movement, it is a separate tool from gesture in that the actual distance traveled, the route of travel, and the speed of travel all declare specific values, in themselves distinct from gesture। [৭৫]

চলনের মূল্য

শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গি, ক্ষেত্র, সমতল এবং স্তরের সাথে মঞ্চ চলনের জন্য রয়েছে কিছু নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট মূল্য। নির্দেশককে অবশ্যই এ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় যাতে কোনো ভুল চলন তাৎক্ষণিকভাবে বুঝাতে ও চিহ্নিত

---

৭৩. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 189।

৭৪. Ibid, Page 189।

৭৫. Francis Hodge, *Play Directing- Analysis,Communication and Styie*, Printed in the United States of America, New Jersey 07632, 1994, Page 146।

করা যায়। মূল্যের দিক থেকে চলনকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. শক্তিশালী চলন ২. দুর্বল চলন।[৭৬] নাটকের অবস্থা বুঝে কখনো শক্তিশালী আবার কখনো দুর্বল চলন সচেতনভাবেই ব্যবহার করা যায়। কখন কোনটা ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে প্রধানত চরিত্রের সংলাপে এবং নাটকের দৃশ্যগত পরিস্থিতির ওপর। মঞ্চে– 'পেছন থেকে সামনে এগিয়ে আসা, বসা থেকে ঋজু হয়ে দাঁড়ানো, সামনের পায়ে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানো, হাত তোলা ইত্যাদি হলো শক্তিশালী চলন। আবার দর্শকের দিকে পিছন ফিরে ওপর মঞ্চের দিকে যাওয়া, মাতালের মতো বা ক্লান্ত ব্যক্তির মতো হাত ঝুলিয়ে ঝুঁকে চলা, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে পেছনে হেলে পড়া, দাঁড়ানো থেকে বসে পড়া, হাত নামানো, গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বা চরিত্র থেকে দূরে সরে যাওয়া ইত্যাদি হলো দুর্বল চলন।'[৭৭] চলনের মূল্য আরোপের জন্য আলেকজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা যে কৌশলগুলো উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক. চলনের সম্পর্কায়িত শক্তি

খ. চলন স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত

গ. চলনের দৈর্ঘ্য

ঘ. চলন মঞ্চ-পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত

ঙ. বাম থেকে ডান এবং ডান থেকে বাম মঞ্চে চলনের মূল্য

চ. কৌণিক চলন[৭৮]

ক. চলনের সম্পর্কায়িত শক্তি

অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলনের সাথে মঞ্চ মূল্য সম্পর্কিত। জানা আছে যে, ওপর মঞ্চ বা আপ ষ্টেজ থেকে সম্মুখ মঞ্চ বা ডাউন ষ্টেজ অধিকতর শক্তিশালী। যেমন– 'শক্তিশালী মঞ্চ চলন যদি দুর্বল শারীরিক চলন দ্বারা ব্যবহৃত হয় তাহলে শক্তিশালী মঞ্চ চলনও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ যদি কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী ওপর মঞ্চ বা আপ ষ্টেজ থেকে এসে সম্মুখ মধ্য মঞ্চ বা আপ সেন্টারে বসে এবং বসার পরও যদি তার চলন শক্তিশালী না হয় তবে এই চলনের সাধারণ মূল্য দুর্বল। অনুরূপভাবে শক্তিশালী শারীরিক চলন দ্বারা ব্যবহৃত দুর্বল মঞ্চ চলন শক্তিশালী চলনে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্মুখ মঞ্চ বা ডাউন ষ্টেজ থেকে ওপর মঞ্চ বা আপ ষ্টেজে হেঁটে গিয়ে দর্শকের দিকে মুখ করে গুরুত্ব নিয়ে অবস্থান করে

[৭৬] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 190।

[৭৭] Ibid, Page 190।

[৭৮] Ibid, Page 196।

তবে ঐ চলন শক্তিশালী চলন হতে পারে।'[৭৯] সোজা কথা হচ্ছে– মঞ্চে দুর্বল অংশ থেকে শক্তিশালী পদক্ষেপ করলে চলনও শক্তিশালী বলেই গণ্য হয়। তেমনি এর বিপরীতটা হলে চলন দুর্বল বলে গণ্য হয়।

খ. চলন স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত

যে কোন নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরের দিকে চলন অধিকতর শক্তিশালী। স্তরের সাথে চলনের মজার একটি বিষয় হলো যে, 'একটি দুর্বল চলন শক্তিশালী চলন দ্বারা প্রশমিত হতে পারে। দুর্বল চলন দিয়ে সোজা ওপর মঞ্চ বা আপ স্টেজে হেঁটে গিয়ে উঁচু স্তরের মাধ্যমে প্রস্থান করলে তাতে সমতা আসে। তবে এই চরিত্রটি আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বেরিয়ে যাবার পূর্বে ঘুরে দাঁড়ায়।'[৮০]

গ. চলনের দৈর্ঘ্য

চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাপারেও চলনের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। প্রস্থান করতে গিয়ে যদি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অনেকখানি পথ পাড়ি দিতে হয় তবে স্বভাবতই তার চলন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এটা মনে রেখে নির্দেশক চূড়ান্ত প্রস্থানের আগে যুক্তিসঙ্গতভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রস্থান পথের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেন। দুর্বল প্রস্থানের চলনকে শক্তিশালী করার উপায়ও থাকে। 'প্রত্যেকেই নেতৃত্বদানকারী নারী চরিত্রকে কোনো ভদ্রলোকের হাত ধরে প্রস্থানের জন্য দেখে থাকতে পারি। সেক্ষত্রে প্রস্থানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দুজনেই ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। যদিও ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের হাত ধরে আছে তথাপি সে ভদ্রলোক থেকে বেশ দূরে এবং স্বভাবত সামনে এগিয়ে আছে। এই অভিনেতা উত্তেজিতভাবে কথা বলছে যাতে তারা সম্মুখ মঞ্চ বা ডাউন স্টেজ থেকে ওপর মঞ্চ বা আপ স্টেজ দিয়ে প্রস্থান নিতে পারে।'[৮১] এভাবে একটি দুর্বল চলনও শক্তিশালী চলনে পরিণত হতে পারে।

ঘ. চলন মঞ্চ-পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত

মঞ্চে চলনের মূল্য নির্ণয়ের জন্য নাট্য-নির্দেশক ও মঞ্চ পরিকল্পকের সাথে পরিকল্পনার প্রবেশ-প্রস্থানের পথ সমন্বিত হতে হয়। সাধারণত ওপর মঞ্চের কেন্দ্র বা আপ সেন্টার থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রবেশ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে পারে। কেননা এই অবস্থা থেকে একটি চরিত্র সম্মুখ শারীরিক অবস্থান নিয়ে শক্তিশালী চলন সহকারে ওপর মঞ্চ বা আপ স্টেজ থেকে সম্মুখ মঞ্চ বা ডাউন স্টেজে গুরুত্ব নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। সাধারণত শক্তিশালী প্রস্থান হতে পারে ওপর মঞ্চের ডান পার্শ্ব বা আপ রাইট। কারণ এই প্রস্থানের

---

৭৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 184।

৮০. Ibid, Page 192।

৮১. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১- জুন ২০১২, পৃ. ২২।

সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীর পার্শ্ব চেহারা তার পশ্চাৎদেশ থেকে বেশি শক্তিশালী। তাই নির্দেশককে মঞ্চ পরিকল্পনাতেও এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়। বিশেষ করে মঞ্চে যদি একটিমাত্র দরজা থাকে এরকম প্রয়োজনায় চরিত্র যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে সেই দরজা দিয়ে প্রস্থান করলে প্রবেশের চেয়ে প্রস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যদি নাটকের পরিণতি এমন হয় যে, 'কোনো চরিত্র দরজা দিয়ে বের হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত সেক্ষেত্রে প্রস্থান প্রবেশের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া কেন্দ্র বা সেন্টার থেকে ডান বা রাইট মঞ্চে আসাটা কেন্দ্র বা সেন্টার থেকে ওপর মঞ্চ বা আপ ষ্টেজে চলনের তুলনায় বেশি শক্তিশালী।'[৮২]

ঙ. বাম থেকে ডান এবং ডান থেকে বাম মঞ্চে চলনের মূল্য

বিভিন্নভাবে প্রমাণিত যে, ডান মঞ্চ থেকে বাম মঞ্চে যাবার চেয়ে কোনো চরিত্র বা কোনো দল যদি বাম মঞ্চ থেকে ডান মঞ্চের দিকে যায় তা আরো বেশি শক্তিশালী চলনে পরিণত হতে পারে। এরকম ঘটার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষের চোখের সাধারণ চলন বাম দিক থেকে ডান দিকে যাওয়া। 'সাধারণত কেউ যখন কিছু পড়ে বা ফটোগ্রাফ দেখে সেক্ষেত্রে বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে যায়। যখন দর্শক মঞ্চে কোনো কিছু দেখে তখনও একই কাজ করে। যখন কোনো চরিত্র বা দল চোখে যেভাবে ক্রিয়া করে সেভাবে হেঁটে যায় তখন চোখও চলমান মানুষগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। চরিত্রটি ততোক্ষণই দর্শকের সাথে হাঁটতে থাকে যতক্ষণ না সে নেপথ্যে চলে যায়। অপর দিকে যেভাবে দর্শকের চোখ অভ্যস্ত সেরকম না হয়ে চরিত্রটি উল্টো দিকে হাঁটলে চোখ স্বাভাবিকভাবেই একটু বাধাগ্রস্ত হয়। যখন এই দৃশ্যগত বাধার তৈরি হয় তখন দর্শক বুঝতে পারে চোখের দেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ছন্দময় ডান থেকে বামে যাবার চেয়ে বাম থেকে ডানে যাওয়া শক্তিশালী চলন।'[৮৩]

যদি কোনো চরিত্র বা দল শক্তিমত্তা নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে তবে তাদেরকে নির্দেশক মঞ্চের বাম দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে যেতে পারেন। 'মিছিল, দল, চরিত্রসমূহের লম্বা লাইন যদি কোন বিজয়ের আশায় মঞ্চে প্রবেশ করে তবে একই কাজ করা যেতে পারে। পাশাপাশি যদি কোনো দল বিজয়ী বা সফল হয়ে ফিরে আসে তাদের বাম দিক থেকে প্রবেশ করানো যেতে পারে। বিপরীতভাবে কোনো চরিত্র বা দল যদি ডান থেকে বামে যায় তবে এটি একটি দুর্বল চলন এবং এর অর্থ তারা যে কাজে যাচ্ছে তা অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। যদি কোনো দল হেরে প্রবেশ করে তবে ডান দিক থেকে প্রবেশ করে বাম দিকে অবস্থান নিতে পারে।'[৮৪]

---

[৮২] আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১- জুন ২০১২, পৃ. ২৩।
[৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
[৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

'একটি চরিত্র স্থিরভাবে মঞ্চে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে এবং অন্য একটি চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করে তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এখানে মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে কে বেশি শক্তিশালী, যে চরিত্রটি মঞ্চে স্থিরভাবে আছে না যে চরিত্রটি মঞ্চে প্রবেশ করছে। সেক্ষেত্রে স্থির চরিত্রটির অবস্থান যদি ডান কেন্দ্রে হয় তবে বাম দিক থেকে প্রবশে করে ডান দিকে যাওয়া চরিত্রটি শক্তিশালী হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে প্রবেশকারী চরিত্রটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জোড়ালো। বিপরীতভাবে যখন স্থির চরিত্রটি যদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে তাকে বাম কেন্দ্রে বসানো যেতে পারে। কারণ এই অবস্থানটি ডান থেকে প্রবেশ করে বামে যাওয়া চরিত্রের চেয়ে শক্তিশালী।'[৮৫] উপর্যুক্ত দুটি উদাহরণেই এলাকার চেয়ে চলনের বেশি গুরুত্ব রয়েছে। শক্তিশালী চলন শক্তিশালী এলাকার চেয়ে শক্তিশালী এবং বিপরীতভাবে দুর্বল চলন দুর্বল এলাকার চেয়ে দুর্বলতর।

চ. কৌণিক চলন

সম্মুখ ডান থেকে ওপর বাম বা ওপর বাম থেকে সম্মুখ ডান বা সম্মুখ বাম থেকে ওপর ডান বা ওপর ডান থেকে সম্মুখ বাম এই চারটি চলনের আলাদা গুরুত্ব এবং মূলভাব লক্ষ্য করা যায়। 'সাধারণ নিয়মে পাদ প্রদীপ বা ফুট লাইটের সাথে সমান্তরাল বা উলম্ব চলনের চেয়ে কৌণিক চলন কম শক্তিশালী। কিন্তু কৌণিক চলন বেশি বড় এবং বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এটা অনেক দূর অতিক্রম করা এবং এমনকি নেপথ্য মঞ্চ ছেড়েও যেন চলে যায় বলে মনে হতে পারে।'[৮৬] যখন কোনো প্রস্থান বা প্রবেশ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় যে, এটি হয়ে ওঠে কোনো দৃশ্যের বিষয় বা শিরোনাম তখন এই কৌণিক চলন সঠিকভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চলন ও সংলাপ

নাটকের সংলাপের সঙ্গে চলনের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্কেরই মতো। খুব বিরল ক্ষেত্র ছাড়া বলা যায় চলন ছাড়া সংলাপ মৃত। 'সাত্ত্বিক অভিনয় সংলাপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ করে তোলে। নাটকের প্রত্যেক সংলাপের মধ্যেই চলন লুকিয়ে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সেই সুপ্তি ভঙ্গ করে চলনকে সংলাপের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।'[৮৭] দৃশ্যায়নের মতো চলনের ব্যবহার সংলাপের ওপর নির্ভরশীল। সংলাপের জন্য পাণ্ডুলিপি গুরুত্বপূর্ণ। সংলাপ অবশ্যই চলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত

---

৮৫. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১- জুন ২০১২, পৃ. ২৩।

৮৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 196।

৮৭. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৯।

হতে হয়। কেননা সংলাপের মাধ্যমেই অর্থ প্রকাশ পায়। সংলাপ এবং চলনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হলে চরিত্রটির সঠিক চিত্রায়ন সম্ভব হয়।

সংলাপের মূল্য

শারীরিক ভঙ্গি, ক্ষেত্র, সমতল ও স্তরের মতো সংলাপকে– শক্তিশালী ও দুর্বল এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। শক্তিশালী ও দুর্বল দুই শ্রেণির সংলাপই নাটকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই শক্তিশালী ও দুর্বল সকল সংলাপই শক্তিশালী ও দুর্বল চলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। একথাও মনে রাখা দরকার যে চলন এমনি এক শক্তিমান উপাদান, যার সাহায্যে কোনো একটি সংলাপকে সবল বা দুর্বলও করে দেওয়া যায়। চলনের সাহায্যে ইচ্ছে করলে সংলাপের কোনো কথার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক– 'এসো' কথাটা যখন কেউ যদি দু'হাত সামনে বাড়িয়ে বলেন তখন তার যে অর্থ হয়, ডান হাতে ঘুসি পাকিয়ে বললে সেই একই 'এসো' কথার একেবারে ভিন্ন অর্থ হয়।'[৮৮] কাজেই নির্দেশককে আগে সতর্কভাবে সংলাপের প্রকৃত অর্থের মূল্যায়ন করে তবে তার আনুষঙ্গিক চলন নির্ধারণ করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো সংলাপের কোনটা শক্তিশালী আর কোনটা দুর্বল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায় কী?

বলতে গেলে এটা কোনো প্রশ্নই নয়। হয়তো গুছিয়ে সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু সংলাপ কোথায় জোড়ালো, কোথায় তা কমজোরি তা সকলেই মোটামুটি বুঝতে পারে। তবু জনৈক প্রখ্যাত নাট্যবিজ্ঞানী 'সবল' ও 'দুর্বল' সংলাপ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ সম্ভাব্য চলনের যে তালিকা দিয়েছেন এখানে তা উপস্থাপন করা হলো :

ক. বিশুদ্ধভাবে ইতিবাচক এবং শক্তিশালী সংলাপের সঙ্গে শক্তিশালী চলন যুক্ত হতে পারে। এগুলি হচ্ছে– 'আদেশ, প্রতিজ্ঞা, আত্মসমর্থন, আশাবাদী বাক্য, ভীতি প্রদর্শক বাক্য ইতাদি। এর বৈশিষ্ট্য ইতিবাচক। শোন, এ জিনিষ আমি সহ্য করব না, হয় যা বলছি করো নয়তো বেরিয়ে যাও, কোনো সন্দেহ নেই সে জিতবেই।'[৮৯] এগুলি সবই ইতিবাচক অর্থবহ এবং শক্তিশালী চলনের অপেক্ষা রাখে।

খ. নেতিবাচক ও দুর্বল সংলাপের সঙ্গে দুর্বল চলন যুক্ত হয়ে থাকে। সন্দেহ, আত্মসমীক্ষা, ভীতি, নৈরাশ্য, হতাশাব্যঞ্জক সংলাপ নেতিবাচক গুণ সম্পন্ন। 'উঃ কী ভুল আমি করেছি, আমি বলছি, আমি বুঝতে পারছি সব

[৮৮]. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২৫।

[৮৯]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 198।

নিন্দার ভাগীদার আমিই, আমি এখানে অপমানিত, ব্যাহত, ব্যর্থ–আমার আর কোনো উপায় নেই।'[৯০] এগুলি নেতিবাচক সংলাপ এবং দুর্বল চলনের অপেক্ষা রাখে।

গ. কিছু সংলাপ আছে যা অংশত সবল এবং অংশত দুর্বল। হয়তো সবলভাবে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু শেষ হয়েছে দুর্বলভাবে। অথবা বিপরীত আরম্ভ হয়েছে– দুর্বলভাবে কিন্তু শেষ হয়েছে সবলভাবে। সেক্ষেত্রে দুর্বল অংশে দুর্বল চলন এবং সবল অংশে সবল চলন যুক্ত করা যেতে পারে। যদি বলি, 'দুর্গতিই আমাদের বরণ করতে হবে... তো সে দুর্গতি এখনই আসুক। এই সংলাপের প্রথমাংশ দুর্বল এবং শেষাংশ সবল চলনের অপেক্ষা রাখে। স্যার, আমাকে বিশ্বাস করুণ– উঃ হা হা, না সব বৃথা, এর প্রথমাংশ সবল দ্বিতীয়াংশ দুর্বল চলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।'[৯১]

কমেডি নাটকে অবশ্য এসবের ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। সেখানে হাস্যোদ্রেগের জন্য, অংসগতি দেখাবার জন্য সবল সংলাপের সঙ্গে দুর্বল চলন যুক্ত হতে পারে অথবা বিপরীতটিও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় কমেডিয়ানরা সবল সংলাপে দুর্বল চলন যুক্ত করেন, যথা– 'চরিত্রটি যখন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে পিছু হাঁটছে তখন হয়তো চেঁচাচ্ছে– এসে দ্যাখো না– মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো।'[৯২]

ঘ. চলনের ওপর নির্ভর করেও সংলাপ ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচকে রূপান্তরিত হতে পারে।

ঙ. কিছু সংলাপ রয়েছে যার অর্থ ইতিবাচক বা নেতিবাচক তা চলনের ওপর নির্ভরশীল। এসব ক্ষেত্রে চলন প্রয়োগের পূর্বে সংলাপের সঠিক ব্যবহার করে উপর্যুক্ত চলন প্রয়োগ করা যেতে পারে। সংলাপের সঙ্গে চলন আরো তিন ভাগে যুক্ত হতে পারে। যথা :

১. সংলাপের সঙ্গে চলন
২. সংলাপের আগে চলন
৩. সংলাপের পরে চলন [৯৩]

১. সংলাপের সঙ্গে চলন অর্থাৎ কথা বলতে-বলতে অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে তার অর্থ প্রকাশ করা।

২. সংলাপের কোনো অংশবিশেষে গুরুত্ব আরোপ করে দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য সংলাপের আগে চলন যুক্ত করা হয়। যেমন– 'তোমার মতো কুকুরকে যে শায়েস্তা করতে পারে সে হচ্ছে, (বক্তা বুড়ো আঙ্গুল

---

৯০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 198।
৯১. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪০।
৯২. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 198।
৯৩. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪০।

দিয়ে নিজের বুকে ঠুকে তারপর বলল) এই আমি, আমি।'[৯৪] এই চলনের দ্বারা বক্তা প্রথমে নিজের দিকে দর্শকের সমগ্র মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করলেন এবং তারপরে এই আমি, আমি– এই সংলাপটি ছুঁড়ে দিলেন। এতে সংলাপ অনেক শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এভাবে গুরুত্ব আরোপের জন্য সংলাপের আগে আরো বহু প্রকারের চলন যুক্ত হতে পারে।

৩. সংলাপের আগে চলন দিলে যেমন সংলাপটা বেশি গুরুত্ব লাভ করে, তেমনি সংলাপের পরে চলন দিলে সংলাপের চেয়ে চলনই বেশি গুরুত্ব লাভ করে। যথা– 'লজ্জা করে না এ কথা বলতে? এই বলে বক্তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে দ্রুত পেছন ফিরে দাঁড়াল।'[৯৫]

চলন ভিত্তিক গুরুত্ব

চলনের গুরুত্ব আরোপের কৌশলগুলো নিম্নরূপ। যথা :

ক. চলন এবং সংলাপ

খ. সংলাপ ও নেপথ্য চলন

গ. অভিনেতা-অভিনেত্রীর নিজস্ব সংলাপ ও চলন

ঘ. প্রবেশ ও সংলাপ

ঙ. প্রস্থান ও সংলাপ

চ. আড়াআড়ি সংলাপ

ছ. গতিশীল দৃশ্যের সাথে চলন[৯৬]

ক. চলন এবং সংলাপ

মঞ্চে মনোযোগ আকর্ষণে চলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'চলন দর্শককে মঞ্চে কী হচ্ছে তা দেখতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে শোনানোর চেয়ে দেখানোর গুরুত্ব চলনের বেশি। তবে নির্দেশক কোন চরিত্রকে কতটা গুরুত্ব প্রদান করলো তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চরিত্রকে এমন কোনো চলন দেয়া যাবে না যা দর্শককে বিভ্রান্ত করে মূল নাট্যক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।'[৯৭] নির্দেশককে ভাবতে হয় কতো কম নির্দেশনা দ্বারা

---

[৯৪]. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪০।

[৯৫]. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

[৯৬]. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২৬।

[৯৭]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 201।

দর্শককে সমস্ত ক্রিয়ার ভিতর নিয়ে এসে যা দেখানো উচিত তা দেখাতে পারে এবং যা শোনানো উচিত তা শোনাতে পারে। অর্থাৎ চলন ও সংলাপের মধ্যে সর্বক্ষণ একটি সমন্বয় থাকতে হয়।

খ. সংলাপ ও নেপথ্য চলন

এই কৌশলটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে দর্শক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে একটি কোলাহলপূর্ণ সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা হয়। যেমন– 'তরবারি, লাঠি-খেলা ও আগুন লাগার মতো দৃশ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চলন নির্দিষ্ট করা যায় না এবং দর্শকগণ এসকল দৃশ্যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় থাকে। তাই নেপথ্য থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলনসমূহকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যাতে করে বিশ্বাসযোগ্যভাবে দৃশ্যটি উপস্থাপন করা যেতে পারে।'[৯৮]

গ. অভিনেতা-অভিনেত্রীর নিজস্ব সংলাপ ও চলন

অভিনেতা-অভিনেত্রীর নিজস্ব সংলাপ ও চলন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। তাকেও ভাবতে হয় সংলাপের কোন কথার সময় তার চলন প্রয়োজন এবং চলনের সাথে কথার কীরূপ সম্পর্ক।

ঘ. প্রবেশ ও সংলাপ

চরিত্রের প্রবেশ এবং সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'কোনো চরিত্রের প্রথম মঞ্চে পদার্পনের সাথে-সাথে সংলাপ বলা উচিত নয়। বরং তাকে তার গুরুত্ব অনুসারে নিজের চরিত্রকে কিছু সময়ের জন্য হলেও ধরে রেখে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে পরবর্তীতে সংলাপ বলা যেতে পারে।'[৯৯]

ঙ. প্রস্থান ও সংলাপ

যখন কোনো চরিত্র মঞ্চ ত্যাগ করে, তখন সবচেয়ে ভাল পন্থা হতে পারে প্রস্থানের ঠিক কাছ থেকে শেষ সংলাপ বলে প্রস্থান করা।

চ. আড়াআড়ি সংলাপ

'আড়াআড়ি চলন সাধারণত ব্যবহৃত হয় যখন অন্য চরিত্রদের সম্মুখে একটি চরিত্র কথোপোকথন করে থাকে। এ অবস্থায় চরিত্রটি সংলাপ বলতে-বলতে যে আড়াআড়ি চলন ব্যবহার করে, তার দ্বারা সে সমস্ত মনোযোগ

---

৯৮. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২৭।

৯৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 202।

ধরে রাখতে পারে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সংলাপ শেষ হয় এবং একই সাথে সে অন্য চরিত্রকেও সুযোগ দেয় তার সময় অনুযায়ী সংলাপ শুরু করে দৃশ্যের টানটান মুহূর্তকে তরান্বিত করে রাখতে।'[১০০]

ছ. গতিশীল দৃশ্যের সাথে চলন

'একটি গতিশীল দৃশ্যের চলনের সাথে সংলাপের সম্পর্ক অত্যন্ত সর্তকতার সাথে বিবেচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে চলন এমন হবে যেন রেখাগুলো সচল, সুরক্ষিত ও সুন্দর থাকে। কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ, রীতি ও পরিবর্তন ইত্যাদি নির্ভর করে অবস্থার প্রকৃতির ওপর। গতিশীল দৃশ্য অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে সংগঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেন তা দর্শককে বিভ্রান্ত না করে।'[১০১]

গতিশীল দৃশ্য সম্পন্ন করা যেতে পারে চরিত্রের সংলাপ চলাকালীন সময়ে। এক্ষেত্রে চরিত্রটি শক্তিশালী চলনের পূর্বে অথবা চলাকালীন সময়ে সংলাপের প্রতি 'গুরুত্ব' প্রদান করতে পারে। অন্যান্য চরিত্রের ক্ষেত্রে যদি সংলাপ থাকে তবে ঐ চরিত্রটি কোনো দুর্বল চলন করে তার সংলাপ বলতে পারে। অথবা গতিশীল দৃশ্য করা যেতে পারে সংলাপহীন চরিত্র দ্বারা। সেক্ষেত্রে যে চরিত্রটি স্থান পরিবর্তন করবে সে চলনের মাধ্যমে বক্তার সংলাপের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে পারে। নিম্নে গতিশীল দৃশ্য নির্দেশনার কিছু কৌশল প্রদর্শিত হলো :

১. অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থান

২. চলনহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থান

৩. চলনশীল অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলন

৪. চলনের অভিপ্রায় [১০২]

১. অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থান

'স্থির অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে শক্তিশালী সম্মুখ মঞ্চ এলাকার মধ্যে, যথাসম্ভব সচল অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে দূরে। সচল অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে দুর্বল মঞ্চ এলাকায় এবং তার চলন অমসৃণভাবে ওপর মঞ্চের কেন্দ্র থেকে সম্মুখ মঞ্চের বামে হতে পারে।'[১০৩] সুতরাং অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থানের ভিন্নতা অনুসারে গতিশীল দৃশ্যের পবিরর্তন আনয়ন সম্ভব।

---

১০০. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২৭-২৮।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২. চলনহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থান

'অভিনেতা-অভিনেত্রী সংলাপ উচ্চারণ করতে পারে উচ্চস্বরে। যথেষ্ট গুরুত্ব আনায়নের জন্য স্থির অভিনেতা-অভিনেত্রী সংলাপ বলার পূর্বে বা পরে হালকাভাবে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। যেখানে স্থির অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।'[১০৪]

৩. চলনশীল অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলন

'অভিনেতা-অভিনেত্রী সংলাপের জন্য চলন থামিয়ে বা ধরে রেখে সংলাপের প্রতি 'গুরুত্ব' প্রদান করা যেতে পারে।'[১০৫] এবং শক্তিশালী চলনের মাধ্যমে সংলাপগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করা যেতে পারে এক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্মুখ মঞ্চে এসে বাম থেকে কেন্দ্রে চলন করতে পারেন।

৪. চলনের অভিপ্রায়

গতিশীল দৃশ্যের ক্ষেত্রে চলনের ভঙ্গি ত্রিভুজ বা অমসৃণ হতে পারে। চলনের অভিপ্রায় ওপর মঞ্চের কেন্দ্র থেকে সম্মুখ মঞ্চের বাম হয়ে ওপর মঞ্চের বাম এবং সেখান থেকে ওপর মঞ্চের কেন্দ্রে হতে পারে। 'এটা অবশ্যই অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপ সাপেক্ষে হতে হয়। চলনের ভঙ্গির সূক্ষ্ম ধারা স্থাপিত হলে পরবর্তীতে এই ধারার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চলন নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। কেননা এসকল ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটলে চলনের অসংগতি এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী তার সংলাপ বলার ভঙ্গির মধ্যে থেকেই শারীরিক অবস্থার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে।'[১০৬] দৃশ্যের প্রয়োজন বা অগ্রগতির জন্য চলনের লয় বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। তবে অবশ্যই দৃশ্যের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হবে যে, কতটুকু বৃদ্ধি করতে হবে বা কোথায় করতে হবে।

চলন এবং দৃশ্যায়ন

পূর্বে উল্লেখিত 'সলোমন' এবং 'সত্য-মিথ্যা' মা-এর আলোচনায় দেখা যায় বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্র। সেই দৃশ্যগুলো সম্পূর্ণ গল্পকে প্রকাশ করে এবং দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাবার প্রক্রিয়ার মাঝখানে চলনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। সেক্ষেত্রে চলন ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। এটা সত্য যে, অনেক নাটকেই

---

১০৪. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২৮।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

চলন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকে কিন্তু চলন সচারচর দৃশ্যের সমান গুরুত্বই পেয়ে থাকে। 'চলন কেবলমাত্র দৃশ্যের ভাবমূল্যই প্রকাশ করে না দৃশ্যকেও প্রকাশ করে।'[১০৭]

চলনের গল্প বলার ক্ষমতা

চলন গল্প বলে। সত্যিকারের শক্তিশালী চলন ডান মঞ্চ থেকে ক-এর খ-এর কাছে বাম মঞ্চে যাবার গল্পটা প্রকাশ করে। 'দুই চরিত্রের মধ্যকার দূরত্ব তাদের দু'জনের মধ্যকার আবেগের তীব্রতাকে কমিয়ে দেয়। এবং কোনো প্রকার ঘনিষ্ঠ বা শক্তিশালী আবেগীয় সম্পর্ক তৈরি করে না। তারা যখন কোনো আবেগীয় অবস্থার কারণে কাছে আসতে শুরু করে তখন তাদের অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, আরো নিবিড় বা ঘনিভূত হয়, প্রেম হয় প্রগাঢ়, রাগ হয় প্রচণ্ড, অবস্থা হয় আরো নিবিড়। আবেগের এই পরিবর্তনকে বলা যেতে পারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থানের নীতি।'[১০৮] কোন দৃশ্যের চরিত্ররা যখন কাছে আসতে থাকে তখন চলনের আবেগীয় তীব্রতা বাড়তে থাকে ও দৃশ্যের চূড়ান্ত বিন্দুতে তা অবদান রাখে এবং একই সাথে দৃশ্যের অর্থকেও পরিষ্কার করে।

গল্প বলার গুরুত্ব নির্ধারণে চলন পরিকল্পনা

দৃশ্যায়ন সম্পর্কে দেখা যায় যে, 'আবেগীয় সম্পর্ক' কীভাবে দৃশ্যায়নে চরিত্রসমূহের অবস্থান তৈরি করে। এখন দেখা যাক 'আবেগীয় সম্পর্ক' চলনের মাধ্যমে কীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং দর্শককে একটা সম্পূর্ণ চলমান দৃশ্য উপহার দেয়।

দৃশ্য

> উদাহরণস্বরূপ, একটা জেল স্কুলের একজন বালক ও তত্ত্বাবধাকের কথা ধরতে পারি। তত্ত্বাবধায়ক বালকটিকে পালিয়ে যাবার সময় হাতে-নাতে ধরে ফেলে। প্রথমে বালকটি তত্ত্বাবধায়কের সাথে তর্কে লিপ্ত হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক তার নীতিতে দৃঢ় অবস্থানে থাকেন। এভাবে কাজ না হলে তত্ত্বাবধায়ক ধীরে-ধীরে কথা বলে বালকটির আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন, তার শরীরে কম্বল জড়িয়ে দেন শীত লাগছে বলে। বালকটি কোনো প্রত্যুত্তর করে না কিন্তু এক পর্যায়ে সাধারণ জীবন, জেল স্কুল এবং তত্ত্বাবধায়ক সম্পর্কে সে কী ভাবে তা বলতে থাকে। সে খুব দৃঢ় এবং খোলামেলা ছিল কারণ সে জানত যে কোনো কঠিন শাস্তি তাকে পেতে হবে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক বালকটির আস্থা অর্জনের

---

[১০৭]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 205।

[১০৮]. আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ২৯।

জন্য তার নিজের জীবনের গল্পবলা শুরু করে এবং বালকটি আগ্রহী হয়। তত্ত্বাবধায়ক বালকটিকে বোঝায় যে, তার মতো সে একদিন নিজেও ছিল। বালকটি তখন শান্ত ও আশ্বস্ত হয় এবং পরবর্তীতে সে তার স্বীকারোক্তি দেয়। তত্ত্বাবধায়ক বালকটি সম্পর্কে নিজের আস্থা ও আগ্রহ প্রকাশ করে আশ্বাস প্রদান করে। এভাবেই তারা একটি নির্দিষ্ট চিন্তার ঐক্যে পৌঁছায় এবং বন্ধু ও সহায়ক হিসেবে রূপান্তরিত হয়।[১০৯]

বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত দৃশ্যটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এই দৃশ্যের 'আবেগীয় সম্পর্কের' পাঁচটি পরিবর্তন রয়েছে। প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদা দৃশ্যায়ন ঘটেছে এবং একটা দৃশ্য থেকে অন্য একটা দৃশ্যে যাবার পথে ভিন্ন-ভিন্ন চলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১. প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় দুজন মঞ্চের দুদিকে অবস্থান করছে, একজন অপরজনের বিরুদ্ধাচারণ করছে।[১১০]

২. পরের আবেগীয় পরিবর্তন আসে তত্ত্বাবধায়ক যখন বালকটির সাথে বাদানুবাদ করছিল। সে বালকটির কাছে আসে এবং কোনো সফলতা না পেয়ে নিজের অবস্থায় ফিরে যায়।[১১১]

৩. বালকটি তত্ত্বাবধায়ককে আক্রমণ করতে উদ্যত এবং ক্রমাগতভাবে তার দিকে এগুবে। তত্ত্বাবধায়কের কাছে গিয়ে সে তার বিরুদ্ধাচারণ করে পুনরায় নিজের অবস্থানে ফিরে আসে।[১১২]

৪. পরের আবেগীয় অবস্থা হচ্ছে যখন তত্ত্বাবধায়ক বালকটিকে তার জীবনের গল্প বলছে, সে বালকটির একটি অংশ হয়ে যায় কারণ বর্ণনাটা এতই কঠিন ছিল যে বালকটিকে তা সরাসরি বলতে পারছিল না। এই পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হয়েছে। তত্ত্বাবধায়কের গল্পটা শুনতে-শুনতে দুজনে একে-অন্যের কাছে চলে আসে। পরবর্তীতে বালকটি দূরে সরে যাওয়া থেকে ক্রামগতভাবে কাছে আসতে থাকে।[১১৩]

৫. শেষ পর্যায়ে যখন তারা দুজনই সমঝোতায় পৌঁছে হাত মেলায় তখন তারা মঞ্চের কেন্দ্রে অবস্থান করে।[১১৪]

---

১০৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 206।

১১০. Ibid, Page 206।

১১১. Ibid, Page 206।

১১২. Ibid, Page 206।

১১৩. Ibid, Page 206।

১১৪. Ibid, Page 207।

উপর্যুক্ত উদাহরণের মাধ্যমে 'আবেগীয় সম্পর্কের' পরিবর্তন দৃশ্যায়ন ও চলনের মাধ্যমে উপভোগ করা যেতে পারে।

চলনের কৌশলগত ক্ষমতা

নিম্নে চলনের কৌশলগত ক্ষমতার বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করা হলো। যেমন :

১. চলন দ্বারা দৃশ্য নির্মাণ
২. চলনের সংরক্ষণ
৩. সমান্তরাল ও বিপরীত চলন
৪. চলন বৈপরীত্য তৈরি করে
৫. সংহিসতার দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ
৬. প্রেমের দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ [১১৫]

উপর্যুক্ত কৌশলগুলোর ব্যবহারে চলনের যথার্থতা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে।

চলনের বিভিন্ন ধরণ

আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা চলনের ধরণসমূহ নিয়ে যে ধাপের উল্লেখ করেন তা নিম্নরূপ। যেমন :

১. গল্প
২. নেপথ্য
৩. চরিত্র
৪. কৌশল।[১১৬]

১. গল্প

নাটকের গল্প প্রকাশের জন্য চলন ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত নাট্যকার নাটকের মাধ্যমেই গল্প নির্দেশ করেন। কিন্তু গল্প প্রকাশের জন্য কিছু চলন রয়েছে, যেমন– 'চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার, জানালার দিকে যাওয়া এবং বাইরে তাকানো, খাবার পরিবেশন, সংঘর্ষ ও নাচ প্রভৃতি।'[১১৭] উপরোক্ত ক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে গল্প প্রকাশের জন্য চলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

---

[১১৫] আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ৩১।

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[১১৭] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 210।

২. নেপথ্য

নেপথ্য হচ্ছে সেই সকল চলন যা 'পরিবেশ-পরিস্থিতি' এবং 'আবহ' প্রতিষ্ঠা করে।[১১৮] প্রায়ই এ ধরনের চলন পাণ্ডুলিপি দ্বারা নির্দেশিত থাকে। কিন্তু কখনো-কখনো নির্দেশককে এই ধরনের চলনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযোজন-বিয়োজন করতে হয় অথবা চলনের ব্যবহার জরুরি হয়ে উঠতে পারে। তখন দৃশ্যটি সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

৩. চরিত্র

চলন চরিত্রের ধরণ এবং মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। অতিমাত্রায় অভিমানী, অস্থির, চঞ্চল চরিত্রের জন্য বহুমুখী চলনের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন– 'ওঠা, বসা, বারবার ওঠা-বসা, মঞ্চের একপার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বে যাওয়া-আসা, অল্প মাত্রায় উত্তেজনা ইত্যাদি চলন সতর্কতার সাথে নির্দেশককে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অন্যদিকে আলস্য বা কুঁড়ে প্রভৃতি চরিত্র অল্প চলন দ্বারা চিত্রিত হতে পারে। তাছাড়া অধৈর্য্য, দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চিত, ভীতু, পিড়ীত প্রভৃতি চরিত্রের প্রকাশের জন্য নির্দেশক যথাযথ চলনের ব্যবহার করতে পারেন।'[১১৯]

৪. কৌশল

মঞ্চে চলনের জন্য কিছু বিন্যাস এবং কৌশলগত হেতু থাকতে পারে। অতএব একটি সুন্দর বিন্যাসের নান্দনিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে চলন। যদিও চলনের কৌশলগত দিক অপরিহার্য তা সত্ত্বেও চলন একটি উদ্দেশ্য প্রকাশে সক্ষম এবং চরিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও কার্যকর হতে পারে।[১২০]

চলনের উদ্দেশ্য

চলন– গল্প, নেপথ্য ও চরিত্র প্রকাশেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে চলন অন্তবর্তী ও স্বাধীন বিবেচনা ছাড়াই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ব্যবহার হতে পারে শুধু পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে। স্বাধীন– বিবেচনাহীন চলন কেবলমাত্র কৌশলগত হতে পারে কিন্তু অন্তবর্তী– চলন আরও অধিক আবেগবহুল অর্থপূর্ণ হতে পারে। 'চলনের উদ্দেশ্য বুঝতে হলে চলনের মাঝে স্বাধীন ও অন্তবর্তী চিন্তার সাথে-সাথে বাস্তববাদ, মনোস্তত্ত্ব, মৌলিক পরিকল্পনা ও চরিত্রের ধরণ বুঝতে হয়।'[১২১]

---

১১৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 210।
১১৯. Ibid, Page 210।
১২০. Ibid, Page 210।
১২১. Ibid, Page 210।

চলন ভাব প্রকাশক

চলন ভাব প্রকাশে অবদান রাখে। অর্থপূর্ণ চলনের দৃশ্যায়নগত মূল্য থাকে। নিম্নে ভাব প্রকাশে চলনের উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. চলন রেখা, আকৃতি ও ভরের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে।[১২২]

২. এছাড়াও চলনের গূঢ় অর্থ থাকে যা কিনা প্রকাশিত হয় চলনের বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে। যেমন :

ক. চলনের পরিমাপ

খ. চলনের শক্তি

গ. চলনের দৈর্ঘ্য

ঘ. চলনের দিক-নির্দেশনা

ঙ. চলনের তীব্রতা ও

চ. চলনের ছন্দ।[১২৩]

উপর্যুক্ত কৌশলগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে চলন ভাব প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়।

চলন সম্পর্কে শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো– চলনের শক্তি নাটকের ক্ষেত্রে অসাধারণ। প্রোসেনিয়ম মঞ্চ অপেক্ষা এরেনা মঞ্চে অধিক চলনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কাজেই চলন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্য-নির্দেশককে খুবই সাবধান এবং সতর্ক হতে হয়। 'মনে রাখতে হয় ভুল চলন সমস্ত নাটককে একেবারে মাটি করে দেবার ক্ষমতা রাখে। যেমন আগুন ঠিকমত জ্বালাতে পারলে তা ঘর আলো করে কিন্তু বেঠিক কিছু করলে তা ঘর জ্বালিয়ে ছাই করে।'[১২৪]

[১২২] আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সম্পাদক : অধ্যাপক ড.সদরুল আমিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ৩২।

[১২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

[১২৪] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪১।

৪. ছন্দ (রিদম)

নাট্য-নির্দেশকের অন্যতম দায়িত্ব নাটকের অন্তর্গত ছন্দ আবিষ্কার করা। গতিশীল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন ছন্দ বিদ্যমান নাটকের কাহিনি, সংলাপ, প্রতিটি-দৃশ্যাংশ, এমনকী চরিত্রের প্রত্যেক মুহূর্তের গতিবিধিরও ছন্দ আছে। নির্দেশককে এই সমস্ত খণ্ডিত ছন্দসমূহকে একটি সূত্রে গ্রথিত করতে হয়। প্রতিটি দৃশ্যের স্থায়িত্বকাল এবং সংলাপের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ছন্দ। নাট্যাচার্য স্তানিসস্লাভস্কি সঠিক চরিত্রায়ন এবং নাট্যক্রিয়ার সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'Tempo Rhythm'[১২৫]–এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাট্য সমালোকের মতে– 'শারীরিক ক্রিয়ার সময় সততা ও দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে লয়-ছন্দ। নির্দেশকের কাছে গোটা অভিনয়ের সার্বিক ছন্দকে খুঁজে বের করার গুরুত্ব রয়েছে।'[১২৬] ছন্দের গুরুত্ব নাটকের একটি অভিজ্ঞতা এবং তা আসে বিশেষ ঝোঁকের পুনরাবর্তনে এবং এই ব্যাপারটি দৃশ্য এবং শ্রাব্য ক্ষেত্রে একক বা সম্মিলিতভাবে ঘটতে পারে। 'সংলাপ, গতিবিধি, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আবহ সবকিছুতেই তাই ছন্দ থাকে– নির্দেশকের দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে তাকে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করা।'[১২৭] অতএব নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্রের' চতুর্থ এবং ব্যাখ্যার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন এই ছন্দ বা রিদম। পৃথিবীতে এমন কতগুলি বিষয় আছে যা সবাই অনুভব করি কিন্তু বলে বোঝানো যায় না, সেক্ষেত্রে এই সূত্রটিও তেমনি একটি সরলতম জটিল বিষয়। চর্চার মধ্যদিয়ে নির্দেশক ছন্দ বোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। নিম্নে প্রাথমিকভাবে সর্বজনস্বীকৃত কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে।

প্রথমই বলা যায়– ছন্দ তো কবিতার অঙ্গ, নাটকের বা নাট্যাভিনয়ের আবার ছন্দ কী? উত্তরে বলা যায়– ছন্দ শুধু কবিতারই একচেটিয়া অধিকারের বিষয় এ ধারণা ঠিক নয়। বরং বলা যায়– এই গোটা দুনিয়াটাই একটা ছন্দের রাজত্ব। ছন্দ পতন ঘটলে এক মিনিটে সব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। এই কথা ভালো করে বুঝতে হলে আগে বোঝা দরকার 'ছন্দ' কাকে বলে? অভিধানে ছন্দের সংজ্ঞা পাওয়া যায়– 'ঝোঁকের সুসমঞ্জস পুনরাবৃত্তিই হচ্ছে ছন্দ। সোজা কথায় সমান কয়েক মাত্রায় পরপর একটা করে ঝোঁক বা অ্যাকসেন্ট পড়লে ছন্দের সৃষ্টি হয়।'[১২৮] যেমন :

---

১২৫. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১২০।

১২৬. ' …… It is as important to him to find it as it is for a director to find the right rhythm for a whole performance' Sonia Moore, *The Stanislavski System,* Published by Pocket Books, New York, April 1967, Page 66।

১২৭. ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১), পৃ. ১২৮।

১২৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 234।

১ — ২ — ৩′ / ১ — ২ — ৩′ /

বা

১ — ২ — ৩ — ৪′ / ১ — ২ — ৩ — ৪′ /

এই ছন্দের থাকে দুটো বিষয়– ধাঁচ আর গতিবেগ। ঐ যে তিন মাত্রা বা চার মাত্রা পর ঝোঁক পড়ছে এটি হলো ছন্দের ধাঁচ। কিন্তু শুধু ধাঁচই ছন্দের সবটা নয় গতিবেগের কম-বেশিও থাকে। একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানে যে ঝোঁক পড়ছে সেই ঝোঁক পড়ার হার বা রেট বেড়ে যেতে পারে, কমে যেতে পারে। এই বাড়া কমার মধ্য দিয়ে ছন্দ আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের মন্তব্য :

> এ যেন অনেকটা আমাদের হৃদপিণ্ডের ধকপুকানির মতো। হৃদপিণ্ড এক ধাঁচে ধুকপুক করেই চলেছে। কিন্তু যখন মনে কোনো উত্তেজনা দেখা দেয় তখন ধুকপুকানির রেট বেড়ে যায়, আবার মন যখন নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ে তখন রেট কমে যায়। ছন্দের ধাঁচ আর বেগও সেই রকমই। দুনিয়ার গতিশীল সব কিছুরই এই ধর্ম। সবই ছন্দে চলছে অর্থাৎ ধাঁচে আর বেগে চলছে। এদিক থেকে নাটকও যেহেতু গতিশীল সেহেতু তা ছন্দের অধীন। একটা নাটক একটা বিশেষ ছন্দে, দৃশ্যের পর দৃশ্যের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছন্দিত হয়ে তার চরম মুহূর্তের ঝোঁকে গিয়ে শেষ হয়।[১২৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, গোটা নাটকের যেমন একটি ছন্দ থাকে তেমনি প্রতিটি দৃশ্যের, প্রতিটি পরিস্থিতির, প্রতিটি চরিত্রেরও বিশেষ-বিশেষ নিজস্ব ছন্দ থাকে। সব ছন্দ মিলে পুরো নাটকটাই একটি অখণ্ড ছন্দে বাঁধা। নাট্য-নির্দেশককে সেই ছন্দ আবিষ্কার করতে হয়, বুঝতে হয় এবং প্রয়োগ করতে হয়। অবশ্য এটা একদিনে হবার নয়। চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া ছন্দোবোধ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না। ছন্দের সাধারণ ধারণা নিয়ে কবিতা লিখতে-লিখতে যেমন ছন্দবোধ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। সকল ছন্দের দুটি বিশেষ আদল বা অংশ থাকে। যথা :

১. প্রাণশক্তি বা জীবন শক্তি

২. আকর্ষণ ক্ষমতা [১৩০]

ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম হচ্ছে অনুরণন ক্ষমতা। আর এ বৈশিষ্ট্যটি জীবন সঞ্চালন প্রক্রিয়ার দুটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেমন– ‘১. হৃদকম্পন ২. ফুসফুসে শ্বাস-প্রশ্বাস। এরা উভয়েই সংকোচন-সম্প্রসারণ বা

---

১২৯. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪২।

১৩০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 234।

হ্রাস-বৃদ্ধি এবং কম্পন একই ছন্দে সীমাহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করে বলে জীবনে প্রাণ সঞ্জীবনী রয়েছে। এই প্রাণ সঞ্জীবনী হচ্ছে ছন্দের একটি রূপ। যখন ছন্দ অঙ্গনে কোনো কিছু উপস্থাপিত হয় তখন তার যে বিন্যাস, সমন্বয়তা এবং অভিযোজন সেটা চিত্তকে সন্তুষ্ট করে এবং স্বাভাবিকভাবেই রসিকজনকে আকর্ষণ করে।'[১৩১] এটি হচ্ছে আকর্ষণ করার ক্ষমতা।

ছন্দের বৈশিষ্ট্য

ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ। যথা : ক. ছন্দের ধরণ

খ. লয় [১৩২]

ক. ছন্দের ধরণ

'ছন্দ হচ্ছে পুনঃপুন ধ্বনিত সুর সংঘাত। এই ধ্বনিত সুর সংঘাতের মধ্যে অবশ্যই স্থান বা সময়ের একটি নিয়মিত সমান ব্যবধান থাকতে হয়। অন্যথায় ছন্দটি সুন্দর নান্দনিক ছন্দ হিসেবে অনুভূত হতে পারে না। অনুভূতিশীল এই পুনঃপুন ধ্বনিত বীট যা কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রবণতাবশেই সেই বীটের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় একক গণনা করতে পারে। এই সংখ্যাই হচ্ছে সত্যিকার ছন্দের অভিজ্ঞতা যা অনুভব করা যায়। ছন্দ সম্পর্কে এই যে স্বাভাবিক সহজাত অনুভূতি এটাই ছন্দের ধরণ এবং ছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য। এটি সময়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক সূত্রে গাঁথা।'[১৩৩]

খ. লয়

ধরণ বলতে কেবল ছন্দকে বুঝায় না বরং লয় ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। 'পুনরায় যদি হৃদকম্পন লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, যখন কোনো তেজঃদীপ্ত উৎসাহমূলক কাজ ঘটে বা যখন প্রচণ্ড স্বপ্নার্তি উত্তেজনা অনুভব হয় তখন হৃদকম্পন বেড়ে যায়। বিপরীতভাবে আসন্ন সমূহ বিপদে হৃদকম্পন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমে যায়। স্বাভাবিকের তুলনায় হৃদকম্পনের মাত্রার ভিন্নতার কারণে ছন্দের ধরণ ভিন্ন হয়। হৃদকম্পনের এই আনুপাতিক মাত্রা বা রেটই হচ্ছে লয়।'[১৩৪]

ছন্দের প্রচলিত তিনটি লয় নাটকের প্রকৃতি, সংলাপ, চরিত্র, দৃশ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শক মনে বিভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে। যেমন : ধীরলয়– বোঝায় রহস্য, চিরায়ত উত্তরণ, আত্মসমর্পণ, ক্লান্তি,

---

১৩১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 234।

১৩২. Ibid, Page 235।

১৩৩. Ibid, Page 235।

১৩৪. Ibid, Page 235।

হতাশা, ধৈর্য্য ইত্যাদি গভীর অনুভূতির প্রকাশক। মধ্যমলয়– সহজ ও ব্যবহারিক লয়। ফলে যুক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শান্ত, নম্র, গুরুত্ব ইত্যাদি ভাব প্রকাশক। দ্রুতলয়– চাপা উত্তেজনা, স্বপ্নার্তি উত্তেজনা প্রভৃতি শ্রমনির্ভর আবেগ প্রকাশ পায়। অতএব নাটকের লয় বুঝে ব্যবহার করার সময় মনে রাখতে হয় লয় :

১. নাটকের মেজাজ প্রতিষ্ঠা করে
২. নাটকের শ্রেণিগত বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠা করে
৩. নাটকের ঘটনার স্বরূপ প্রকাশক
৪. চরিত্রায়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়
৫. নাট্য অকুস্থল ও আবহাওয়ার চরিত্র প্রকাশক
৬. দৃশ্যান্তর্গত পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে
৭. অভিনেতা-অভিনেত্রী গ্রথিত করে
৮. দর্শককে সংযুক্ত করে
৯. নাটককে সামগ্রিকভাবে ধরে রাখে[১৩৫]

অতএব নাটকে লয়ের প্রয়োগ করতে হয় সময়, জ্ঞান ও প্রতিটি পদক্ষেপের পরিকল্পনায়। সঠিক ছন্দ প্রয়োগের ফলে নাটক গতি লাভ করে। নাট্যবেত্তার মতে– 'One of the most common faults of directions is not too establish a clear rhythm in a production ।'[১৩৬] প্রকৃত পক্ষে ছন্দই নাটকের প্রাণ সঞ্চার করতে পারে।

ছন্দের সম্পৃক্ততার ভূমিকা

ছন্দের সাথে জীবনের একটি সম্পৃক্ততা রয়েছে। আবেগ এবং অনুভূতি সৃষ্টি করতে ছন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দর্শকের মধ্যে যে ছন্দের অনুভূতি রয়েছে সেটা সুস্পষ্টভাবেই শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার ফল। অভ্যন্তরীণ সুস্পষ্ট আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা চারপাশে যা কিছু ঘটে তা অনুভব করা এবং একের পর এক বৃদ্ধি করে চলা সেই সকল ছন্দের সম্পৃক্ততাসমূহকে। ফলে যখন কোনো আবেগাশ্রীত দৃশ্য উপস্থাপিত হয় তখন সেই দৃশ্যের ছন্দ অনুভব করা সহজসাধ্য হয়। 'ছন্দ এবং প্রকাশিত আবেগের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে 'সম্পৃক্ততা' একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করে অভিনেতা-অভিনেত্রী সচেতন বা অবচেতনভাবে আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এই সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করে নির্দেশকও

---

১৩৫. ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১), পৃ. ১২৯।
১৩৬. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১২১।

দৃশ্যে বা সমস্ত নাটকের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।'[১৩৭] তাহলে প্রশ্ন সম্পৃক্ততাসমূহ কী? সুনিশ্চিতভাবে সম্পৃক্ততাসমূহ হচ্ছে ব্যক্তির অনুভূতিলব্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাসমূহ।

ছন্দ ও আবেগ

প্রকাশিত আবেগ সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভরশীল। এটা সত্য নয় যে প্রত্যেকটি ছন্দই সবাইকে আলোড়িত করে। প্রথমত ছন্দ চেতন বা অবচেতনভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতার কাছে মনকে নিয়ে যায়, সেখানে ছন্দের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং অতঃপর আবেগ বা অনুভূতি অনুভব করা। মূলত ছন্দ আবেগকে উদ্দীপিত করে। ছন্দ তার ধরণ ও লয়ের সাহায্যে আবেগকে বিভিন্ন অবস্থায় অতি সহজেই নিয়ে যেতে পারে। 'সৈনিকরা যখন মার্চ করে তখন যে তালে, ছন্দে ড্রাম বাজে তা রক্তে দোলা লাগায় এবং একটা বিশেষ আবেগে অভিভূত হয়। আবার যখন বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজে তার ছন্দ আমন্ত্রিত অতিথির চিত্তে অন্য আর এক ধরনের আবেগ জাগায়।'[১৩৮]

ছন্দের ধরণ এবং অন্তর্নিহিত অর্থের মূল্যায়ন

ছন্দের ধরণ বলতে এক্ষেত্রে একটি নাটকের মৌলিক বীটকে বোঝান যেতে পারে। যখন অভিনেতা-অভিনেত্রী ছন্দ অনুভব করতে ব্যর্থ হয় তখন নির্দেশককে অবশ্যই ছন্দ এবং মৌলিক বীটের প্রকৃতি ও নাটকের ভাবমূল্যের সাথে ছন্দের সামঞ্জস্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ধারণা দিতে পারেন।

লয় এবং অন্তর্নিহিত অর্থের মূল্যায়ন

লয় হচ্ছে ছন্দের ধরনের বৈচিত্র্য যা মাত্রা বা রেটের ওপর ভিত্তি করে বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। লয় এবং বৈচিত্র্য বলতে সময়ের স্থায়িত্বের ব্যবধানের ভিন্নতাকে বুঝায়। লয়ের বৈচিত্র্য নানাবিধ ভাবকে প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

নাটকের ছন্দ নিরূপণ

এতো গেলো সাধারণভাবে ছন্দের কথা। ছন্দের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাটকেরই একটি মূল ছন্দ থাকে। নিম্নে ছন্দ নির্ধারণের গুণগুলো উল্লেখ করা হলো :

ক. নাটকের প্রকার

খ. নাট্য পরিস্থিতির প্রকৃতি

---

[১৩৭] আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫১।

[১৩৮] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪২।

গ. সংলাপের ধরণ

ঘ. চরিত্রের ভাব

ঙ. নাট্য বর্ণিত স্থান ও পরিবেশ [১৩৯]

ক. নাটকের প্রকার ও ছন্দ

নাটকে বিষয়বস্তু প্রকাশের পেছনে যে মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় তাই হচ্ছে তার ছন্দের প্রধান নির্ধারক। নাটক বহু প্রকারের– 'ট্রাজেডি, কমেডি, স্যাটায়ার, ফার্স ইত্যাদি। এগুলোর পেছনে বিয়োগান্তক, মিলনান্তক, বিদ্রুপাত্মক, প্রহসনাত্মক নানা মনোভঙ্গি বিদ্যমান থাকে। এগুলোর প্রত্যেকটির একেকটি নিজস্ব ছন্দ থাকে যা বিশেষ আবেগের সঙ্গে জড়িত। একটা দুঃখের নাটকের ছন্দ আর হাসির নাটকের ছন্দ এবং আবেগ এক নয়– ভিন্ন। একেকটা ছন্দ দর্শকের মধ্যে একেকটা বিশেষ রসের সৃষ্টি করতে পারে।'[১৪০]

খ. নাট্য পরিস্থিতির প্রকৃতি ও ছন্দ

নাট্য পরিস্থিতিও ছন্দের নির্ধারক। চরিত্রগুলোর চলন-বলনের ছন্দ নির্ধারিত হয় দৃশ্যের পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভাব অনুযায়ী।[১৪১]

গ. সংলাপ ও ছন্দ

সংলাপেরও বিশেষ ছন্দ থাকে। ঠিক ছন্দে বললেই সংলাপ প্রাণ পায়। না হলে সংলাপ মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। সংলাপের মধ্যে যে আবেগ অন্তর্নিহিত আছে, সে আবেগ প্রকাশিত ও সঞ্চারিত হয় ছন্দেরই সাহায্যে। ইংরেজিতে– 'Legato Utterance' [১৪২] এবং 'Staccato Utterance' [১৪৩] বলে দুটি কথা উল্লেখ পাওয়া যায় যা সংলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেগেটো আটার‍্যানস হলো দীর্ঘলয়ে পালিশ করে লহরে-লহরে কথা বলা। আর স্ট্যাকাটো আটার‍্যানস হলো দ্রুত কাটা-কাটা ভাবে কথা বলা। এই দুই ছন্দের কথা ও তার সঙ্গে সেই ছন্দের চলন সংযুক্ত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও আবেগ সৃষ্টি হতে পারে।

---

১৩৯. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫২।

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৪২. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৩।

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

ঘ. চরিত্র ও ছন্দ

সংলাপ ও চলনের ছন্দ চরিত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হয়। চরিত্রটিকে যদি ঠিক মতো নাট্য-নির্দেশক আগে থেকেই বিশ্লেষণ করে নিতে পারেন তবে তিনি চরিত্রের ছন্দটাও ধরতে সক্ষম হন এবং চরিত্রের ছন্দটি– সংলাপ, চলন ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হন।[১৪৪]

ঙ. স্থান, পরিবেশ ও ছন্দ

যে স্থান বা পরিবেশে দৃশ্যের ঘটনা ঘটছে সেই স্থান বা পরিবেশেরও একটি নিজস্ব ছন্দ থাকে। নির্দেশককে সেটা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয় এবং সেই অনুযায়ী চলন, সংগীত, দৃশ্যপরিকল্পনা ও বিন্যাস করতে হয়। স্থান পরিবেশের ছন্দ কী রকম– রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা থেকে তা সবচেয়ে ভালো বোঝানো যেতে পারে। যেমন, নগর পরিবেশ ও ছন্দ :

> দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
> অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, উদ্ধত ললাট
> স্পর্ধিছে অম্বর তল আপাঙ্গ ইংগিতে
> অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে
> অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টংকারে...
> ...হেথা মও স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা[১৪৫]

এই হলো নগরীর ছন্দ আর :

> ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহারি
> নির্বাক, গম্ভীর শান্ত সংযত উদার
> হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা[১৪৬]

এই হলো তপোবনের ছন্দ। দুই শ্রেণির মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত দুই স্থানের ছন্দে কতো না পার্থক্য।

---

১৪৪. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ :৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৩।

১৪৫. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৩।

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

ছন্দের কার্যাবলি

'Rhythm is primarily factor which gives lift to the play।' [১৪৭] ছন্দ মূলত একটি নাটককে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাটকের ভাব, ধরণ, প্রকৃতি, নাট্যপরিস্থিতি, স্থান, অবস্থা, চরিত্রায়ণ, আবহ ও পরিবেশ প্রভৃতি প্রকাশ করতে ছন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নাট্যবেত্তা আলেকজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা-এর মতে নিম্নে ছন্দের কার্যাবলি বর্ণিত হলো। যথা :

১. ভাব প্রতিষ্ঠা করে
২. নাটকের ধরণ প্রতিষ্ঠা করে
৩. নাট্য অবস্থার প্রকৃতি নিরূপন করে
৪. চরিত্রায়ণে সাহায্য করে
৫. স্থান ও আবহ তৈরি করে
৬. দৃশ্য পরিবর্তন ঘটায়
৭. অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দলীয় বন্ধন সৃষ্টি করে
৮. দর্শককে একত্রিত করে
৯. নাটকের সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করে মিশ্রণ ঘটায় [১৪৮]

১. ভাব প্রতিষ্ঠা

ছন্দে ভাব প্রতিষ্ঠা পায় বিন্যাস ও চলনের অন্তর্নিহিত মূল্য দ্বারা। একটি সংলাপে অনেকগুলো শব্দ থাকে। শব্দের অন্তর্নিহিত মূল্য নির্দেশকের সহায়তায় অভিনেতা-অভিনেত্রী শব্দ উচ্চারণের মধ্যদিয়ে ও সংলাপের মধ্যকার চিন্তার মাধ্যমে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে ভাব তৈরি করতে পারে। যখন সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির ভাব বোঝা যায় না তখন বিন্যাস ও চলনের অন্তর্নিহিত মূল্যের প্রতি অথবা শব্দের প্রতি 'জোর' দিয়ে নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত মূল্য বের করা সম্ভব হয়। যে পদ্ধতিই ব্যবহার হোক না কেন ছন্দ সবসময় একত্রিত, মিশ্রিত, সংযুক্ত ও ফলপ্রদ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। 'যখন ভাবের প্রসঙ্গ আসে তখন ছন্দের কণ্ঠগুণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কণ্ঠের ওঠা-নামা, গভীর ও পরিস্কার করে দীর্ঘক্ষণ কোনো লাইন উচ্চস্বরে বলা এবং উচ্চারণের ছন্দ সবকিছুতেই কণ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক একটি শব্দ 'গুরুত্ব' দিয়ে উচ্চারণ করলে এক-

[১৪৭] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 242।
[১৪৮] Ibid, Page 242-244।

এক ধরনের ভাব প্রকাশ পেতে পারে। এই শব্দগুলো অভিনেতা-অভিনেত্রী কণ্ঠের বিভিন্ন অবস্থান থেকে উচ্চারিত করে, ফলে সংলাপে ভাবের ভিন্ন ব্যঞ্জনা তৈরি হতে পারে।'[১৪৯]

২. নাটকের ধরন প্রতিষ্ঠা

'প্রত্যেক নাটকের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যা মৌলিক বীট দ্বারা সমন্বিত হয়। যে কারণে ট্রাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা বা ফার্সের অঙ্গ-ভঙ্গি, চলন, ধরণ ও সংলাপ উচ্চারণ ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়।'[১৫০] তাই প্রাথমিকভাবে নির্দেশককে নির্বাচিত নাটকের ধরণ ও ছন্দ নিরূপণ করতে হয়। নাটকের মনোভাব এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পর যথাযথ ছন্দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেকোনো গতিশীল চলনেরই ছন্দ থাকে। নাটকের ছন্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট নাটকে কী ধরনের চলন বিরাজমান তার ওপর নির্ভর করতে হয়। সেক্ষেত্রে চলনের ধরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি ও সংলাপ নাটকের মৌলিক স্পন্দনের সাথে ঐক্য রেখে করা যেতে পারে। 'কখনো-কখনো ছন্দ ট্রাজেডিতে কমেডির উপস্থিতি ঘটায়। বিপরীতভাবে কমেডিতে ট্রাজিক মুহূর্ত তৈরি করতে পারে। ম্যাকবেথের দ্বাররক্ষী দৃশ্য যৌক্তিক উদাহরণ হতে পারে।'[১৫১] যেখানে কমেডি সমগ্র নাটকের ভাবকে পরিবর্তন করে না। অপরপক্ষে কমেডিতে দ্রুত গতির আবেগ দৃশ্যের গভীরতাকে হালকা করে দিতে পারে।

৩. নাট্য অবস্থার প্রকৃতি নিরূপন

প্রকৃতি অনুসারেই প্রত্যেক নাটকের একটি মূল ছন্দ থাকে।[১৫২] মূল ছন্দই সমস্ত নাটককে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই মূল ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে লয়। নাট্যক্রিয়ার অবস্থা ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই লয়ের বৈচিত্র্য ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং লয়ের বিভিন্ন বৈচিত্র্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিরও বিভিন্ন রূপ অনুভব করা যেতে পারে। নাটকের মূল ছন্দের সাথে লয়ের বৈচিত্র্য ছন্দের স্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নাটকে অনেকগুলো দৃশ্য থাকে এবং প্রত্যেকটা দৃশ্যের আলাদা-আলাদা ভাব থাকে। দৃশ্যগুলো মূল ছন্দের ওপর নির্ভর করে আলাদা লয়ের বৈচিত্র্যে মাধ্যমে উপস্থাপিত না হলে একঘেয়েমি লাগতে পারে।

---

১৪৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 242।

১৫০. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৪।

১৫১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 243।

১৫২. Ibid, Page 244।

৪. চরিত্রায়নে সাহায্য

প্রত্যেক ব্যক্তির চলন ও উচ্চারণে একটি স্বতন্ত্র ছন্দ থাকে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের কারণেই এ ছন্দ তৈরি হয়। চলন– 'চরিত্রের ধরন এবং তার মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। কিন্তু ছন্দ সকল চলন সম্পাদনের আচরণ প্রকাশ করে এবং চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে অর্থবহ করে তোলে।'[১৫৩]

৫. স্থান ও আবহ প্রতিষ্ঠা

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ছন্দ দ্বারা স্থান ও আবহ নির্দেশিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের, দেশের, সম্প্রদায়ের বা জাতির নির্দিষ্ট ছন্দ সম্পর্কে একজন নির্দশকের সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'ছন্দের সঠিক ধারণা বহন করার ক্ষেত্রে ঐ দেশের আলোকচিত্র, ভ্রমণ সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্র, জাতীয়তা ধারণকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'[১৫৪] তাঁদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের ভেতর দিয়ে ছন্দ নিরূপণ হতে পারে।

৬. দৃশ্য পরিবর্তন ঘটায়

নেপথ্য দৃশ্যপটের দ্বারাই কেবল দৃশ্যের পরিবর্তন হয় না। ছন্দ দ্বারা স্থান ও আবহের সত্যিকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন-নতুন দৃশ্যের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।[১৫৫]

৭. দলীয় বন্ধন সৃষ্টি

'প্রথাগত অভিনয় পদ্ধতিতে বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিক পরিমাণে 'তারকা' প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তখন সু-সমন্বিত অভিনয় দূর ভবিষ্যতের বিষয় ছিল। অভিনয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা মানার ক্ষেত্রে খুব কমই মনযোগ দেওয়া হতো এবং কখনো-কখনো দেওয়াই হতো না। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী তার নিজের অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী থাকতো এবং অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ের ছন্দ ও স্বরের সাথে নিজের অভিনয়ের সমন্বয় ঘটতো না।'[১৫৬] কিন্তু বর্তমানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সঠিক দলীয় বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে। এই সু-সমন্বিত ও দলীয় বন্ধন সৃষ্টিকারি অভিনয় ছন্দের মাধ্যমে ঘটানো যেতে পারে। যেখানে প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকের মূল ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে সতর্কভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার অভিনয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

---

[১৫৩] আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৫।

[১৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[১৫৬] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 244।

৮. দর্শককে একত্র করে

ছন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছন্দ প্রত্যেককে একত্র করে। ছন্দের যথাযথ নিয়ন্ত্রণে দর্শকের মধ্যেও একই রকম প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। ‘কোলাহলপূর্ণ বিশাল জনতাকে ছন্দের মাধ্যমে আবেগ-তাড়িত করা সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে দর্শকের ছান্দিক গতিতে একটি নাটক শুরু করা যায়। অঙ্কের শুরুতে নাটকের বৈশিষ্ট্যের সাথে খাঁপ খাওয়ানোর জন্য দর্শককে কিছু সময় দেওয়া উচিত। বিপরীতে আকস্মিক ছন্দ ব্যবহার তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে যা দর্শকের নিকট অপরিচিত মনে হতে পারে। দর্শকের নাট্য ছন্দ সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি নাও থাকতে পারে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দর্শকের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়।’[১৫৭]

৯. সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করে

ছন্দ নাটকের সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করে মিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হয়। সংযুক্ততা ও ঐক্য সমস্ত ভালো শিল্পে বিদ্যমান।

ক. সঠিক মনোযোগের মাধ্যমে চলনের যে প্রবাহ অর্জন হয়, ছন্দ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সবল চলন থেকে দুর্বল চলনের দিকে এবং দুর্বল চলন থেকে সবল চলনের দিকে ছন্দের সঠিক নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ বিদ্যমান।[১৫৮]

খ. ছন্দ দৃশ্যের বিন্যাস ও দৃশ্যের মধ্যে সংযুক্তি ঘটায়।[১৫৯]

গ. ছন্দ পরিবর্তনমূলক ও সমান্তরাল দৃশ্যকে উন্নত ও শক্তিশালী করে সমগ্র নাটকের মধ্যে এই দৃশ্যগুলোকে যুক্ত করতে পারে। ছন্দ দর্শকের আগ্রহ ধরে রেখে দৃশ্যগুলোকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে ।[১৬০]

ঘ. প্রবেশ-প্রস্থানের সময়, চলন, ইঙ্গিত, বিরতি দৃশ্য, দৃশ্য তৈরি ও কম তীব্রতা সম্পন্ন দৃশ্য ইত্যাদি নিরূপণে ছন্দ ভূমিকা রাখে। ছন্দ নেপথ্য মঞ্চের হট্টগোল, সংগীত এবং অন্যান্য সমস্যা ও নিরূপণ করে।[১৬১]

ঙ. অস্পষ্ট ফলাফল সমন্বিত দৃশ্যগুলোর মধ্যে ছন্দ সংযুক্তি ঘটায়। একইভাবে সম্পর্কহীন একটি দলের মধ্যে ছন্দেও ঐক্যের দ্বারা পরিবর্তন এনে ঐ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।[১৬২]

চ. ছন্দ চরিত্রের সাথে চরিত্রের সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়।[১৬৩]

---

১৫৭. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৬।

১৫৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 245।

১৫৯. Ibid, Page 245।

১৬০. Ibid, Page 245।

১৬১. Ibid, Page 245।

১৬২. Ibid, Page 245।

১৬৩. Ibid, Page 245।

নাটকে ছন্দের প্রয়োগ

নির্দেশক আশা পোষণ করতে পারেন যে, তাঁর নাটকে ছন্দ প্রকাশিত হবে অবচেতন ভাবেই, অনুভূতিশীল অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপ বলার মাধ্যমে, চরিত্রায়নের মধ্যদিয়ে, পাণ্ডুলিপিতে যে সকল স্থান নির্দেশ করছে তার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি নাট্যক্রিয়ার সমন্বয়ে। সেক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রী যথাযথ এবং উপযুক্ত ছন্দ প্রকাশে ব্যর্থ হলে নির্দেশককেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ তখন তাঁকে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ছন্দ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হয়। তাদের ছন্দের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং লয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দেশক যথাযথ ছন্দ বোঝাতে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, যেমন– 'সংখ্যা গণনায় হাততালি ব্যবহারে ছন্দ বোঝাতে পারেন। অথবা মহড়ার সময়ে সংগীতের ব্যবস্থা করে তাৎক্ষণিক উপস্থাপিত কোনো ছান্দিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ছন্দ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারেন।'[১৬৪] আলেকজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা ছন্দ নিয়ন্ত্রণে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তা উল্লেখ করেন, সেগুলো হলো :

১. দৃশ্য
২. অভিনেতা-অভিনেত্রী
৩. সংলাপ
৪. সংযোগকারী ও সমান্তরাল দৃশ্য
৫. চূড়ান্ত মুহূর্ত
৬. বিরতি
৭. প্রবেশ-প্রস্থান
৮. হাসির দৃশ্য
৯. মঞ্চের শব্দ নিয়ন্ত্রণ
১০. প্রেক্ষাগৃহ [১৬৫]

১. দৃশ্য

নির্দেশককে প্রতিটি দৃশ্যের মৌলিক ছন্দ খুঁজে বের করতে হয় যার মাঝে লয়ের বৈচিত্র্য থাকে।[১৬৬] দৃশ্য পরিবর্তনের সময় মৌলিক ছন্দ প্রবাহিত থাকে বা সামান্য পরিবর্তন হলেও নাটকের ছন্দ সমন্বিত থাকে।

---

১৬৪. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৭।
১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
১৬৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 246।

২. অভিনেতা-অভিনেত্রী

অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকের চরিত্র এবং নাট্য অবস্থার দ্বারা বিষয়বস্তুর ছন্দ নির্ধারণ করতে পারেন।

৩. সংলাপ

সংলাপের যে মৌলিক ছন্দ থাকে নির্দেশককে সে সম্পর্কে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সঠিক ধারণা প্রদান করতে হয়। সংলাপ বলার সময়– পরিস্থিতি, বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ এবং যথাযথ আবেগ যেনো বহাল থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হয়।

৪. সংযোগকারী ও সমান্তরাল দৃশ্য

সংযোগকারী ও সমান্তরাল দৃশ্যের মৌলিক ছন্দ থাকে। কিন্তু সংলাপ ও চলনের যে লয় থাকে তা মৌলিক ছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেদিকে নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হয়।

৫. চূড়ান্ত মুহূর্ত

নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্তে ধীরে-ধীরে আবেগের গভীরতা ও তীব্রতা সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে লয়ের পরিবর্তন না হলে খাপ-ছাড়া লাগতে পারে। চূড়ান্ত মুহূর্তে দৃশ্যকে ছন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

৬. বিরতি

যে কোনো বিরতি অর্থ তৈরি করে। তাই বিরতির দৈর্ঘ্যের প্রতি নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হয়। নাটকে বিরতি ব্যবহার অবশ্যই মূল ছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই করতে হয়। অন্যথায় ছন্দ পতন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৭. প্রবেশ-প্রস্থান

নীরবতা ও চিৎকার বা হইচইপূর্ণ দৃশ্যেও ছন্দ অনুযায়ী প্রবেশ-প্রস্থান করতে হয়।

৮. হাসির দৃশ্য

কমেডি ও ফার্সের মহড়ায় হাসি-উদ্রেগকারী ‘সংলাপ’ ও ‘ক্রিয়া’র প্রতি বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয় কারণ হাসি ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করে। হাসির দৃশ্য সময়কে দীর্ঘায়িত করে। এজন্য নির্দেশককে হাসির ব্যাপারে সময় নিরূপণ করে দিতে হয়, তা না হলে অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ‘জোর’ দিয়ে দ্রুত সংলাপ বলতে পারে এবং দৃশ্যের নির্মাণকেও ধ্বংস করে দিতে পারে।

৯. মঞ্চের শব্দ নিয়ন্ত্রণ

অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চ চলন, চলমান দ্রব্য, পুনঃপুন হট্টগোল, দোল খাওয়া চেয়ারের ঘূর্ণায়মান ছন্দ, মঞ্চের মধ্যে ও বাহিরের শোরগোল ইত্যাদির প্রতি নির্দেশক লক্ষ্য রাখতে পারেন।

১০. প্রেক্ষাগৃহ

চূড়ান্ত ছন্দ নির্ধারণে প্রেক্ষাগৃহের শব্দহীন বৈশিষ্ট্য ও আকার-আকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। ছন্দ বজায় রাখতে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

ক. অভিনেতা-অভিনেত্রীর এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে পদার্পণের সময় ছন্দ ধরে রাখতে পারে।[১৬৭]

খ. নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রবেশের সময় দৃশ্যের শুরুতে পুনরায় ছন্দ প্রতিষ্ঠিত করা যায়।[১৬৮]

গ. প্রতিষ্ঠিত ছন্দকে চালিয়ে নিতে হয় এবং দৃশ্যের শেষে পুনরায় ছন্দ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।[১৬৯]

ঘ. শক্তিশালী ও উত্থান-পতনের মধ্যেও মৌলিক ছন্দকে ধরে রাখা যায়।[১৭০]

ঙ. মৌলিক ছন্দকে অধিক হারে বৃদ্ধি করেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।[১৭১]

নাটকে লয়ের প্রয়োগ

বাস্তবিকভাবে একটি নাটকের মৌলিক ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে। পাশাপাশি তার প্রায়োগিক দিকও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কোনো প্রযোজনায় মৌলিক ছন্দ যদি কোনোরূপ বৈচিত্র্য ছাড়াই বারবার প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে দর্শকের নিকট ক্রমে-ক্রমে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর এবং অমুগ্ধকর হয়ে উঠতে পারে। দর্শকের একঘেয়েমি দূর করতে এবং সমস্ত নাটককে প্রাণবন্ত করে তুলতে নাটকের মৌলিক ছন্দকে অগ্রাহ্য না করে বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐকতানে আবদ্ধ করে ছন্দ এবং লয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। তখনই নাটকের মৌলিক ছন্দ যথাযথভাবে প্রকাশ পেতে পারে। লয় এবং ছন্দ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাচনভঙ্গি, অনুভূতির তীব্রতা ও আন্তরিকতা, ভাবনার গভীরতা প্রভৃতির মাধ্যমে লয় নির্ধারিত হতে পারে। লয় নিয়ন্ত্রণে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন :

---

১৬৭. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 247।

১৬৮. Ibid, Page 247।

১৬৯. Ibid, Page 247।

১৭০. Ibid, Page 247।

১৭১. Ibid, Page 247।

১. চরিত্রায়ণে মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্য

২. মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্যের অনুপাত

৩. গতিবেগ

৪. দূরবীক্ষণ

৫. দৃশ্য নির্মাণ [১৭২]

১. চরিত্রায়ণে মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্য

নাটকের অন্যান্য ছন্দ স্থির হলে প্রত্যেক চরিত্রের জন্য আলাদা-আলাদা মৌলিক ছন্দ নির্ধারণ করা যেতে পারে। নির্ধারিত চরিত্রসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে দ্রুত বা ধীর লয়ে হতে পারে যা অবশ্যই তাদের চলন, সংলাপ এবং অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যখন প্রত্যেক চরিত্রের জন্য আলাদা-আলাদা মৌলিক ছন্দ নির্ধারিত হয় তখন লয়ের মাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাচন-ভঙ্গি, অনুভূতির তীব্রতা ও আন্তরিকতা এবং ভাবনার গভীরতা ইত্যাদির মাধ্যমে লয় নির্ধারণ করা যেতে পারে।[১৭৩]

২. মৌলিক ছন্দের বৈচিত্র্যের অনুপাত

দৃশ্যের আবেগ লয় নির্ধারণ করে। 'দৃশ্যের আবেগ অনুযায়ী লয় ধীর না দ্রুত তা নির্ধারণ হতে পারে। আবেগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে লয় নির্ধারণ করলেও এটা মৌলিক ছন্দের বাইরে যায় না। লয়ের বৈচিত্র্য মূল ছন্দের ওপর নির্ভর করে। মূলত একটি ধীর ছন্দের নাটক দ্রুত ছন্দের নাটকের চেয়ে ধীর হয়। প্রহসনের ছন্দ ট্রাজেডির চেয়ে দ্রুত হয়।'[১৭৪] অতত্রব নির্দেশককে লয় ব্যবহার করতে হয় বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে

৩. গতিবেগ

নাটকের লয় প্রয়োগে গতিবেগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি দৃশ্যকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলা ও পুনঃপর্যবেক্ষণ করা হয় লয়ের ওপর নির্ভর করে। 'চলনের গতি পরিবর্তন না করে সংলাপ বলার সময় গতি না কমিয়ে একটি দৃশ্যকে পর্যায়ক্রমিকভাবে টুকরো-টুকরো করে ফেলাই গতিবৃদ্ধিকরণ।'[১৭৫] অতএব দৃশ্য তৈরির ক্ষেত্রে নির্দেশককে গতিবেগ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

---

১৭২. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৮।

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

১৭৪. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 248।

১৭৫. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৯।

৪. দূরবীক্ষণ

এর মানে হলো সংলাপ ও চলনের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত তুলে নেয়া। কোনো চরিত্রের সংলাপ ও চলন শেষ করার পূর্বে অন্য একটি চরিত্রের সংলাপ ও চলন শুরু করে দেয়াকেই দূরবীক্ষণ বলে। এটা এমন ধরনের কৌশল যা দৃশ্য নির্মাণে ব্যবহার হতে পারে। লয়ের গতিবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে এর গতি হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হয় তার আদান-প্রদানের ওপর। দূরবীক্ষণ শুধু গতি বৃদ্ধি করে না অনেক সময় অর্থও প্রকাশ করে। দূরবীণ দিয়ে যেমন কোন জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তেমনি নির্দেশককে নাটকের একটি দৃশ্য তৈরি করার পর পর্যবেক্ষণ করতে হয়– 'মঞ্চ ব্যবহারে লয় কীভাবে কাজ করছে। কারণ কমেডি নাটকে ছন্দের হেরফের হলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় নাটকের ভাব অনুযায়ী। তবে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, এটা যেন লয়কে ছিন্ন না করে।'[১৭৬]

৫. দৃশ্য নির্মাণ

দৃশ্য নির্মাণ করার সময় চলন দিয়েই সমস্যা চিহ্নায়ন করা যেতে পারে। চলনের সমস্যা সমাধান হলে লয় ও কণ্ঠস্বরের দিকে নির্দেশক মনোযোগী হতে পারেন। দৃশ্য নির্মাণের সময় সব ধরনের মেথড পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।[১৭৭]

দৃশ্যের প্রকার ও তার লয়

নাটকের গঠনশৈলী অবশ্যই সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হয় যে, নাটকটির চূড়ান্ত মুহূর্তটি কখন এবং কোথায় ঘটে, এছাড়াও কোনটি উন্মোচনকারী দৃশ্য বা কোনটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। নাটকের গঠন সম্পর্কে সর্বশেষ ধারণাই নির্ধারণ করতে পারে নাটকটি কতোগুলি অংশে বিভক্ত এবং কীভাবে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা যায়। যেমন– চলন এবং লয়। নিম্নে দৃশ্য অনুসারে একটি নাটককে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা উল্লেখ করা হলো :

১. সমান্তরাল দৃশ্য
২. দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃশ্য
৩. সংযোগকারী দৃশ্য
৪. চরম পরিণতিমূলক দৃশ্য
৫. হ্রাসকৃত দৃশ্য

---

[১৭৬] আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৫৯।

[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৬. পতিত দৃশ্য

৭. আকস্মিকতা সম্পন্ন দৃশ্য [১৭৮]

১. সমান্তরাল দৃশ্য

একই সাথে দুটো দৃশ্য চলছে এ ধরনের দৃশ্যকে সমান্তরাল দৃশ্য বলা যেতে পারে। নাটকের শুরুতেই সমান্তরাল দৃশ্য থাকে এবং তা নাট্যক্রিয়া উন্মোচনকারী দৃশ্য হিসেবে পরিচিত। উন্মোচন এবং পারিপার্শ্বিকতাই হচ্ছে সাধারণত সমান্তরাল দৃশ্য হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের দৃশ্যে চরিত্রের গতিবিধি, দ্বন্দ্ব বা উত্থান-পতন একই গতিতে একই দিকে চলতে থাকে। 'চরিত্রের শারীরিক বা মানসিক দ্বন্দ্ব এখানে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। তবে এই দৃশ্য হতেই মৌলিক ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লয়ের মাত্রা অনুযায়ী ক্রিয়াশীল থাকে।'[১৭৯]

২. দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃশ্য

চরিত্রের শরীর ও মন সরাসরি দ্বান্দ্বিক নাট্যক্রিয়ার মধ্যদিয়ে চূড়ান্ত জটিলতার দিকে পৌঁছায়। এ ধরনের দ্বান্দ্বিক দৃশ্যগুলো গড়ে ওঠে ক্রমে-ক্রমে নাটকের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য। এ জন্য চলনের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং লয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। 'লয়ের বহুবিধ বৈচিত্র্য চরিত্রের প্রকৃতি, চিন্তা, আচারণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন আনে। এই দৃশ্যগুলো শুরুতে ছোটখাট চূড়ান্ত জটিলতাসম্পন্ন ক্রিয়ায় উত্থাপন, অপ্রত্যাশিত দ্বন্দ্ব, প্রচণ্ড জোরপূর্বক অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চূড়ান্ত জটিলতা সৃষ্টি করে।'[১৮০]

৩. সংযোগকারী দৃশ্য

এ ধরনের দৃশ্যে সাধারণত প্রবেশ-প্রস্থান কার্য সম্পন্ন হয়। নাট্যিক ক্রিয়া এই দৃশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুটি দৃশ্যকে একই সূত্রে বাধার জন্য একটি ছন্দ দৃঢ়ভাবে ব্যবহৃত হয়।[১৮১]

৪. চরম পরিণতিমূলক দৃশ্য

এ সকল দৃশ্য নাট্যিক তীব্রতার সাথে সম্পর্কিত যেখানে আবেগ তীব্রতর হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নাট্যিক ক্রিয়াকে একটি শীর্ষস্থানে নিয়ে যায়। যেখানে সমস্যার তীব্রতা ও উৎকর্ষ চরমে পৌঁছায়।[১৮২]

---

১৭৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 252-253।

১৭৯. Ibid, Page 252।

১৮০. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৬০।

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৫. হ্রাসকৃত দৃশ্য

যে দৃশ্যে পূর্ব দৃশ্যের জটিলতাপূর্ণ নাটকীয় তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে তাই হ্রাসকৃত দৃশ্য। জটিলতাপূর্ণ দৃশ্য যেভাবে নির্মাণ করে তার ঠিক বিপরীতভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটু হ্রাস হয়ে আবার দ্বন্দ্বটা বাড়তে পারে।[১৮৩]

৬. পতিত দৃশ্য

পতিত দৃশ্য হচ্ছে একটি চরম তীব্রতা থেকে সর্বনিম্ন অবস্থানে হঠাৎ পরিবর্তনকারী দৃশ্য। এর ব্যবহার যদি চরম পরিণতিমূলক দৃশ্যের পর হয় তবে তার লয় ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু পতিত দৃশ্যের পরে যদি চরম পরিণতিমূলক দৃশ্য হয় তবে তার তীব্রতা আরো বেশি তীব্র হতে পারে।[১৮৪]

৭. আকস্মিকতা সম্পন্ন দৃশ্য

যে সব দৃশ্যে তীব্র উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা, বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ও তীব্র উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে উত্থান-পতন ঘটতে থাকে এবং দর্শকদের মনে একটি তীব্র প্রত্যাশার জন্ম দেয় তাকে আকস্মিকতা সম্পন্ন দৃশ্য বলা যেতে পারে।[১৮৫] এ দৃশ্যগুলো যে কোন জটিলতাপূর্ণ দৃশ্য থেকে আরও তীব্রতরভাবে শুরু হয় এবং আশা-নিরাশার দোলাচলে দোলতে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ছন্দকে অবহেলা করলে চলে না কারণ প্রকৃত পক্ষে ছন্দই নাটকের প্রাণ সঞ্চার করে। 'এখানে প্রাণ মানে শুধু গতিশীলতা নয়। এখানে 'প্রাণ' কথাটা অন্য এক গভীর অর্থে বলা হয়েছে। মাঝে-মাঝে দর্শক বলে– গানটা ভালই গেয়েছে তবে গানে 'লাইফ' আনতে পারেনি' এখানে 'লাইফ' মানে গানের গতি বা সুরের, সঠিকত্ব নয় আরো বেশি কিছু।'[১৮৬] ছন্দ নাটকে এই দুর্লভ 'বেশি কিছু' সৃষ্টি করে বা নাটক শেষ হয়ে গেলেও দর্শকের প্রাণে দোলা দিতে থাকে।

---

১৮৩. আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পাদক : সিদ্দিকা মাহমুদা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৬০।

১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

১৮৬. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৪।

৫.নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)

নাট্যবেত্তার মতে পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন হলো :

> A wider meaning of pantomimic dramatrization is the complete visual performance of a play and, as such, includes the use of composition, picturization, movement, rhythm, and pantomime to convey, without the use of words, all elements of a play।[১৮৭]

প্রশ্ন হলো– প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন বা নির্বাক অভিনয় বলতে কী বোঝায়? সোজা কথায় প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন হচ্ছে সংলাপহীন নাট্যক্রিয়া বা ‘action without dialog।’[১৮৮] নাট্যক্রিয়া বা অ্যাকশন হলো মুখের ভাব-ভঙ্গি, দেহের ভঙ্গি, হাত নাড়া এবং চলন। এগুলির উৎস হচ্ছে বাস্তব জীবন। নাটকে এগুলোর প্রয়োগ করা হয় চরিত্র, দৃশ্য-পরিস্থিতি, পরিবেশ ইত্যাদিকে প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। মুখে সংলাপ না বলে এই উপাদানগুলোর সাহায্যে বক্তব্য পরিস্ফূট করার নামই প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন বা নির্বাক অভিনয়। নির্বাক অভিনয়টা নাটকে দরকার হয় কেন? এটা নাটকে দরকার হয় দর্শক মনের চাহিদা মেটাবার জন্য। নাটক দেখতে বসলে দেখা যায় দর্শক যতটা শুনতে চায় তার থেকে বেশি সে দেখতে চায়। সংলাপটা শোনার বিষয় আর নির্বাক অভিনয় দেখার বিষয়। কাজেই কথার ফাঁকে এই দেখাবার উপাদানগুলোকে হিসেব মতো ব্যবহার করলে নাটকে অনেক বেশি প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব।

নাট্যক্রিয়ায় ‘বিজনেস’ বলে একটা ব্যাপার আছে। তার সঙ্গে নির্বাক অভিনয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা দরকার। নাট্যক্রিয়ায় জিনিষপত্র বা দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে অনেক সময় অভিনয় করতে হয়। যেমন– দরজা খোলা, টেলিফোন ডায়েল করা, টেবিল পরিষ্কার করা, চায়ের কাপে চিনি দিয়ে চামচ নাড়া, সিগারেট ধরানো ইত্যাদি। এগুলি কখনো-কখনো সংলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আবার কখনো সংলাপ ছাড়াই হয়। সংলাপহীন বিজনেসও প্রয়োজনে নির্বাক অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দক্ষ নির্বাক অভিনয়ের দ্বারা– ‘চরিত্র, স্থান, পরিবেশ, সংলাপের অর্থ সবই প্রকাশ করা যায়। এদিক থেকে নির্বাক অভিনয় একটি শক্তিশালী নাট্যোপাদান।’[১৮৯] ভরত নাট্যশাস্ত্রে নির্বাক অভিনয় আঙ্গিক অভিনয় নামে অভিহিত। ‘আঙ্গিক অভিনয় যেহেতু দেখার বিষয় তাই নির্দেশক মঞ্চচিত্রে শারীরিক ক্রিয়ার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে থাকেন। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নির্বাক ভঙ্গিই যেন প্রাধান্য না পায়।’[১৯০] সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় নির্দেশককে।

---

১৮৭. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 257।

১৮৮. Ibid, Page 257।

১৮৯. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৪।

১৯০. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১২১।

নির্বাক অভিনয় নির্ধারণ

আলেকজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা প্রযোজনায় নির্বাক অভিনয়ের ব্যবহার কার্যকররূপে সম্পন্ন করতে চাইলে যে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেছেন সেগুলো হচ্ছে :

ক. গল্প

খ. সংলাপ

গ. চরিত্র

ঘ. স্থান

ঙ. পরিবেশ[১৯১]

ক. গল্প

যে কোনো একটি ঘটনার গল্প বা পরিস্থিতিই জানিয়ে দেয় কী ধরনের বিজনেস এবং নাট্যক্রিয়া নাটকের জন্য প্রয়োজন। নাট্যকার অনেক সময় পাণ্ডুলিপিতে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। নাট্যক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে বিজনেস কী হবে তা জানা যায়, তবে এক্ষেত্রে নির্দেশককে কল্পনা শক্তিকেও কাজে লাগাতে হয়। নেপথ্য মঞ্চের বিজনেসের ইঙ্গিত অনেক ক্ষেত্রে নেপথ্য মঞ্চ থেকে আসতে পারে যা তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো দর্শকরা জানেন না এবং এ সম্পর্কে সংলাপেও হয়তো সরাসরি কিছু উচ্চারিত হয় না। যেমন– 'ধরা যাক নেপথ্য মঞ্চে একটি খুন হচ্ছে কিন্তু এ সম্পর্কে দর্শকরা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানতে পারছে না, তবে দর্শকের সম্মুখে অবস্থিত ক্রিয়ারত একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়তো জানে, এরকম যদি হয় তাহলে সেই অভিনেতা-অভিনেত্রী এমন কিছু আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে যার মাধ্যমে চরিত্রের অস্থিরতা প্রকাশ পায়।'[১৯২] এ ধরনের নির্বাক অভিনয় নাটকের গল্পকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তোলে এবং ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

খ. সংলাপ

নির্বাক অভিনয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংলাপ একটি বড় ধরনের উৎসাহ উদ্দীপক। সংলাপকে অঙ্গ-ভঙ্গি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আরও জোড়াল করা সম্ভব। সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে কল্পনার সূত্র এবং এই কল্পনাকে যখন বাস্তবে রূপ দেয়া হয় সেটি হচ্ছে নাট্যক্রিয়া। 'তবে মঞ্চে সবসময় সংলাপ ব্যবহার করেই

---

১৯১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 258-260।

১৯২. Ibid, Page 259।

মনোভাব প্রকাশ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নির্বাক অভিনয় দিয়ে অনেক না বলা সংলাপকে প্রকাশ করা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে।'[১৯৩]

গ. চরিত্র

চরিত্র ছাড়া কোনো রকম বিজনেস করা সম্ভব নয়। তাদের ব্যাহ্যিক আচরণ, বয়স, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গলার স্বর, হাঁটার ধরন, পোশাক, রূপসজ্জা, অভ্যন্তরীণ-পরিপ্রেক্ষিত, চরিত্রের অতীত, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, বিশ্বাস, মানসিক অবস্থা এ সবকিছুই প্রয়োজনীয়। এগুলি সবই বিজনেস তৈরিতে সহযোগিতা করে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে, 'এই বিজনেস চরিত্রের অংশ হবার পাশাপাশি নাট্যক্রিয়ারও অংশ হয়।'[১৯৪]

ঘ. স্থান

স্থান বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যেখানে নাট্যক্রিয়া সংঘটিত হয়। নাটকের জন্য স্থান একটি বস্তুগত পদ্ধতি প্রদান করে যে আমরা কী নির্ধারণ করবো, সাজাবো বা নিয়ন্ত্রণ করবো।[১৯৫]

ঙ. পরিবেশ

'সামাজিক অবস্থা, জীবন ধারণের প্রকৃতি, মানুষের সংস্কৃতি ইত্যাদি হচ্ছে একটি স্থানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দিনের কোন সময়, বছরের কোন ঋতু– এ বিষয়গুলো থেকেও বিজনেসের জন্য অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন পরিবেশ-পরিস্থিতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সময়ের এবং স্থানের তখন তাদেরকে কল্পনাকে জাগ্রত করে নিজেদের জীবন পর্যবেক্ষণ করতে হয়। স্থান ও পরিবেশ যদি হয় ভিন্ন দেশের, ঐতিহাসিক ঘটনার তাহলে ঐ ভূমির এবং সেই ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর-ও গবেষণা করতে হয়।'[১৯৬] গবেষণার বিষয় হতে পারে সেই সময়ের, সেই দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়বস্তুর ওপর।

নির্বাক অভিনয়ের অবদান

একজন নির্দেশক নাটকের বিজনেস বিভাজনে অবশ্যই বিশেষভাবে নির্বাক অভিনয় ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে পারেন। যৌক্তিক উপস্থাপন, কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে নির্দেশক নাটকের মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী নির্বাক অভিনয় নির্ধারণ করতে পারেন। নির্বাক অভিনয়ের অবদান নিম্নরূপ। যথা :

---

১৯৩. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 259।

194. Ibid, Page 259।

১৯৫. Ibid, Page 260।

১৯৬. Ibid, Page 260।

ক.পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায়

খ. চরিত্র প্রকাশে ও বিকাশে

গ. স্থান প্রতিষ্ঠায়

ঘ. পরিবেশ নির্মাণে

ঙ. শ্রেণিগত ভিন্নতা প্রতিষ্ঠায়, (ট্রাজেডি, কমেডি ইত্যাদি ক্রিয়া কর্মের প্রকৃতিও পৃথক হতে বাধ্য সেই কারণে)

চ. ধারাবাহিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতে

ছ. সমৃদ্ধি ও প্রাণশক্তিদানে [১৯৭]

ক. পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায়

নির্বাক অভিনয় পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সাহায্য করে, তবে নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় ছন্দ বজায় থাকে। 'দর্শক নাটকের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য প্রথম থেকেই উদগ্রীব থাকে। তাই নির্দেশককে নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা নাটকের শুরুতে অথবা নাট্য-দৃশ্যের ক্রমবিকাশমান পর্যায়ে করে নিতে হয়। যাতে দর্শক নাটক সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠে।'[১৯৮] অভিনয়ে নাট্যক্রিয়ার সাথে নির্বাক অভিনয় ও বিজনেসকে যুক্ত করলে পরিস্থিতির রূপদান অনেক সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠতে পারে।

খ. চরিত্র প্রকাশে ও বিকাশে

নাটকে প্রথম দৃশ্যের প্রথম চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের জন্য দর্শক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে তাই নির্দেশককে চরিত্রটি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়। নির্দেশক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী চরিত্রের ব্যাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে কথা বলতে পারেন। চরিত্রের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়ে পড়লে তা কাহিনির উন্মোচনেও সাহায্য করতে পারে। বৈচিত্র্যময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্দেশককে কাজ করতে হয়। 'নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে নির্দেশকের যা করতে পারেন তা হচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নাটকের চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলতে বলা। একজন ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে চরিত্রকে অনুভব করার ক্ষমতা অর্জন করা।'[১৯৯] চরিত্রের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাক অভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে।

---

১৯৭. ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১), পৃ. ১৩০।

১৯৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 261।

১৯৯. Ibid, Page 262।

গ. স্থান প্রতিষ্ঠায়

নাটকের শুরুতেই স্থান প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্বাক অভিনয় দিয়ে স্থানের প্রতিষ্ঠা খুব সহজভাবে তুলে ধরা যায়। উঁচুমানের নির্বাক অভিনয় নাটকের মায়া প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।[২০০]

ঘ. পরিবেশ নির্মাণে

পরিবেশ ছাড়া একটি স্থানকে প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। স্থানীয় একটি শহরের রাস্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এর পরিবেশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'তখন যদি রাত হয় তাহলে এক রকম, যদি দিন হয় তাহলে অন্যরকম। এই রাস্তাটিকেই যদি নিউইয়র্ক শহরের একটি রাস্তা মনে করি আর সময়টি যদি হয় বড়দিনের আগের রাত তাহলে রাস্তাটির পরিবেশ পাল্টে যায়।'[২০১]

ঙ. শ্রেণিগত ভিন্নতা প্রতিষ্ঠায় (ট্রাজেডি, কমেডি ইত্যাদি ক্রিয়া কর্মের প্রকৃতিও পৃথক হতে বাধ্য সেই কারণে)

নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নাটক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 'ট্রাজেডি নাটকে দর্শক এবং নাটকের ভাবের মধ্যে শক্তিশালী আবেগীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, চরিত্রায়ণও চূড়ান্ত মাত্রায় বিকশিত হয়, সহজ সরল জটিলতাহীন বিজনেস ব্যবহার হয় এবং মূল আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু থাকে চরিত্র ও সংলাপ। যে কারণেই ট্রাজেডি নাটকে সহজ সরল কিছু স্পষ্ট বিজনেস ব্যবহার হতে পারে যেন দর্শক বিজনেসের প্রতি বেশি মনোযোগী না হয়ে সংলাপ ও চরিত্রের প্রতি মনোযোগী হয়। এক্ষেত্রে বিস্তারিত বিজনেস নয় বরং সুনির্দিষ্ট বিজনেসের বেশি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।'[২০২] উপরোক্ত ট্রাজেডির ন্যায় কমেডি, মেলোড্রামা ও ফার্সেও যথাযথ মূল্য ও ভাবের ওপর নির্ভর করে বিজনেসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

চ. ধারাবাহিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখতে

নাটকে নির্বাক অভিনয়ের যে উদাহরণ থাকে তা আসে বাস্তব জীবনের পর্যবেক্ষণ থেকে। এর ফলে নাট্যক্রিয়াকে চিহ্নিত করা যায় এবং জীবনের অংশ বলে মনে হয়। সতর্ক 'পর্যবেক্ষণ' নির্বাক অভিনয়ের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং একটি চরিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয়ের ধারাবাহিকতা প্রদান করে। ভালো নির্বাক বিজনেসের জন্য চরিত্রকে 'ধারাবাহিকতা' ও 'বিশ্বাসযোগ্যতা' অক্ষুণ্ন রাখতে হয়।

---

২০০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 262।

২০১. Ibid, Page 262।

২০২. Ibid, Page 263।

একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চলন সম্পাদিত হয়। চলনের দ্বারাই নাটকের দৃশ্য উপস্থিত হয় এবং নাটককে প্রত্যয় ও জীবনীশক্তি দান করে। মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য দ্বারা চরিত্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এই চরিত্রগুলোই নাটকে বিভিন্ন ধরনের চলন ও বিজনেস তৈরি করতে পারে। নাটকের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সর্বসময় সচেতন থাকতে হয়। 'একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর যখন কোন সংলাপ থাকে না অথচ তার মঞ্চে অবস্থান জরুরি এমন অবস্থায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচিত পার্শ্বচরিত্র কী বলছে কী করছে তা শোনা। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মঞ্চে থাকলেই যে কোনো না কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে হবে এমন কোনো কথা নেই বরং অন্য চরিত্রের সংলাপের সময় যদি এ ধরনের আচরণ করে তাহলে তা মঞ্চের শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হতে পারে। তাই অভিনেতা-অভিনেত্রীর উচিত নিজের চরিত্রকে ধরে রেখে মঞ্চে কী ঘটছে তার ওপর মনোযোগ রাখা। যখন সময় হবে তখন যেন সে ঠিকভাবে ঘটনার ছন্দটি ধরতে পারে।'[২০৩]

ছ. সমৃদ্ধি ও প্রাণশক্তিদানে

'প্রযোজনার ক্ষেত্রে নির্দেশককে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ ও নাট্যক্রিয়া কোথায়, কোন পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে সে বিষয়ে অবহিত থাকতে হয়। এটা জানার পর নির্দেশককে ভাবতে হয় এ ধরনের চরিত্র বা ঘটনা অভিনেতা-অভিনেত্রী কিংবা নির্দেশকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় রয়েছে কিনা। যদি থাকে সেক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে কল্পনাশক্তি যুক্ত করে নাট্য ঘটনাকে আরও ঘনীভূত করে তোলা সম্ভভ।'[২০৪] এ প্রক্রিয়ায় কাজ করলে নাটকটি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারে।

ভালো নির্বাক অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা

নির্বাক অভিনয়ের সাহায্যে খুব সহজেই দৃশ্যাবলী, স্থান, চরিত্র ও অবস্থানকে তুলে আনা সম্ভব। যে নির্বাক অভিনয় চরিত্রের সঙ্গে যতো বেশি অভিনেতা-অভিনেত্রী নিজের মতো খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেই অভিনয় ততো ভালো। অবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে দর্শকরা যাতে প্রথমেই সন্দেহে না ভোগে যে তারা কী অবলোকন ও অনুধাবন করছে। যদি দর্শক প্রথমেই আগ্রহী না হয় তাহলে নাট্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দেশক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকবেন সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে পরবর্তীকালে এর সাথে আরও তথ্য যোগ করা যেতে পারে। নিম্নে ভাল নির্বাক অভিনয়ের জন্য সহায়ক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

---

২০৩. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 264।

২০৪. Ibid, Page 265।

১. সঠিকভাবে পরিকল্পিত এবং তার যথার্থ কতটুকু

২. স্বাভাবিকত্ব

৩. পুঙ্খানুপুঙ্খতার সমৃদ্ধি

৪. সংক্ষিপ্তকরণ

৫. সঠিক ছন্দ

৬. পরিমাণগত সমতা ও ভারসাম্য বজায় আছে কিনা

৭.যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত কিনা

৮.মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চ তলের গতিবিধি, আলোক ইত্যাদি বিষয়ক নকশার পরিপাট্য [২০৫]

১. সঠিকভাবে পরিকল্পিত এবং তার যথার্থ কতটুকু

নাটকে যথার্থ বিষয় অনুধাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশককে অবশ্যই নির্বাক অভিনয়ের ক্ষেত্রে চরিত্র ও তার অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে হয়। তাঁকে জীবনের বিশ্লেষণকারী হতে হয় এবং কীভাবে কল্পনাশক্তি যুক্ত করা যায় তা বুঝতে হয়। পর্যবেক্ষণ করতে হয় যেন কোনো নির্বাক অভিনয় মিথ্যা বলে মনে না হয়।[২০৬] মূল বক্তব্যটি বোঝান গেলে অন্য বিষয়গুলো ক্রমে-ক্রমে বোঝানো যায়।

২. স্বাভাবিকত্ব

নাটকের বিষয়বর্ণিত বাস্তবতাগুলো প্রকাশিত হয় উপস্থাপিত ক্রিয়াগুলোর একে অপরের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কারণে। প্রথাগত আধুনিক প্রযোজনায় উচ্চ ধরনের বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় এবং সেক্ষেত্রে আশাপোষণ করা হয় স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার। চরিত্রের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক অভিনয়ের অন্যতম শর্ত।[২০৭]

৩. পুঙ্খানুপুঙ্খতার সমৃদ্ধি

নাটকে কল্পনাশক্তি, স্থান, পারিপার্শ্বিকতা ও চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অবদান রাখতে পারে এটা নির্দেশককে জানতে হয়। যেমন– ‘একটি মেয়ে খোলা মাঠে গাছের নিচে বসে বই পড়ছে এটা নির্দেশক

---

২০৫. ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১), পৃ. ১৩০।

২০৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 266।

২০৭. Ibid, Page 267।

কল্পনার সাহায্যে মঞ্চে যুক্ত করতে পারেন।’[২০৮] খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোতে যত্ন নেওয়া ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা নির্দেশকের দায়িত্ব।

৪. সংক্ষিপ্তকরণ

সৌখিন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে নির্দেশক প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে কল্পনায় যুক্ত করাতে পারেন এবং কল্পনাশক্তির ব্যবহার তাদের মাঝে বিস্তার ঘটাতে পারেন। যে ক্রিয়াগুলো সঠিক সেগুলোকে নির্দিষ্ট করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাঝে উপস্থাপনের উপযোগী করে তুলতে পারেন। ‘নির্দেশক একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ভিতরে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রস্তুত করে। সেই ক্রিয়া তৈরি হবার পর বিশেষ করে সৌখিনদের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে পারেন। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট কিছু ক্রিয়া নিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পূর্ণাঙ্গ একটি ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে পারেন। তবে নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অভিনেতা-অভিনেত্রী সংলাপ ও ক্রিয়ার বাস্তবতার সাথে মিল থাকে। যদি একটি দীর্ঘ ক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কম সংলাপ দিয়ে ক্রিয়াকে উপস্থাপন করা যেতে পারে।’[২০৯]

৫. সঠিক ছন্দ

নির্বাক অভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটকের লয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। প্রত্যেক দৃশ্যের ছন্দের সাথে চরিত্র, স্থান ও পারিপার্শ্বিকতার সামঞ্জস্য থাকতে হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রাজেডি ও কমেডির ছন্দ আলাদা। যদি ট্রাজি-কমেডি নাটক হয় তবে নাটকের লয় পরিবর্তনের সাথে ক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটতে পারে। অধিকতর ক্রিয়া নাটকের লয়ের সাথে দ্রুত ও ধীরে সহাবস্থান করতে পারে। তবে পুঙ্খানুরূপে কাজগুলো করতে হলে লয় কম থাকতেও পারে।[২১০]

৬. পরিমাণগত সমতা ও ভারসাম্য বজায় আছে কিনা

ছন্দের সাথে যেমন নির্বাক অভিনয় সম্পর্কযুক্ত তেমনি প্রতিটি দৃশ্যের সাথে নির্বাক অভিনয়কে পরিমাণগত সমতা ও ভারসাম্য বজায় আছে কিনা তা আনুপাতিক হারে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ‘সমান্তরাল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃশ্যগুলোকে সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করে তোলা যায় নির্বাক অভিনয় দ্বারা। যেহেতু একটি দৃশ্য তৈরি হয়

২০৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 267।

২০৯. Ibid, Page 267।

২১০. Ibid, Page 268।

অনেকগুলো ক্রিয়ার সমষ্টি দ্বারা তাই দ্বান্দ্বিক মুহূর্ত পর্যন্ত ধীর হতে দ্রুত লয়ে নির্বাক অভিনয় ধাবিত হতে পারে।'[২১১]

৭. যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত কিনা

নির্দেশকের দায়িত্ব হলো কল্পনাকে বাস্তবতায় যুক্ত করা। বাস্তবতাবিহীন কল্পনা অলীকমাত্র। যে ঘটনা বাস্তবে ঘটেনা তার যথাযথ কল্পনা করাও সম্ভব হয় না। মৃত্যুর দৃশ্যে আমাদের স্মৃতি থেকে ঘোটে যাওয়া মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কল্পনায় এনে বাস্তবে রূপান্তর করতে হয়। কল্পনার ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিষয় নির্দিষ্ট করতে হয়। নির্দিষ্ট বিষয়টি যাতে আবার অতি-অভিনয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সেক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা স্বপ্নময় অনুভূতি বাদ দিতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই নির্দেশক নাট্যক্রিয়া বা নাটকের বিষয়ের ওপর কল্পনার অনুশীলন করাতে পারেন। মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রী কল্পনাশক্তিকে দু'ভাবে প্রসারিত করতে পারে। যেমন :

১. পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ২. কাল্পনিক স্বপ্নময়রূপে।[২১২]

৮. মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চ তলের গতিবিধি, আলোক ইত্যাদি বিষয়ক নকশার পরিপাট্য

ভালো নির্বাক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় আলোক ও মঞ্চ পরিকল্পনা কৌশল খুবই প্রয়োজনীয়। সৃষ্টিশীল ক্রিয়া হিসেবে একজন নির্দেশক পূর্ণ স্বাধীনতায় তাঁর কল্পনাশক্তির মাধ্যমে মঞ্চপরিকল্পনার কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্দেশক নাট্যকারের সাহায্য নিতে পারেন। তবে নাট্যকারের নির্দেশনা কৌশল গ্রহণের পরে নির্দেশক নিজস্ব সৃজণশীল স্বকীয়তার দ্বারা মঞ্চ-কৌশল অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। তবে 'চূড়ান্ত নির্বাচন, পুনঃনির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ আসে মূলত চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতা, স্থান ও নাটকের ধরনের ওপর।'[২১৩] এছাড়াও নির্দেশক দুই বা ততোধিক উপাদানের ওপর জোর গুরুত্ব দিতে পারেন। যেমন– স্থান, চরিত্র, ক্রিয়া বা সবগুলোর ওপর অথবা ক্রিয়া যে চাহিদার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় তার ওপর। নির্দেশক প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি স্থাপন করতে পারেন। কেননা প্রত্যেকটি ক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটে মঞ্চ কৌশল ও নেপথ্য কৌশলের ওপর ভিত্তি করে। তাই নির্দেশককে লক্ষ্য রাখতে হয় চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থানের ওপরে-ও। এখানে তাঁকে লক্ষ রাখতে হয় গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের প্রত্যেকটি বস্তুর অবস্থানের প্রতি। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় জানালা, দরজা ও প্রত্যেকটি আসবাবপত্র কীভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। এসব প্রত্যেকটি

---

২১১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 268।

২১২. Ibid, Page 269।

২১৩. Ibid, Page 269।

উপাদান যাতে নাটকের লয়কে ব্যাহত না করে সেদিকে নির্দেশককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারার মতে বাস্তবধর্মী নাটকে ভালো নির্বাক অভিনয় তৈরির জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে, যথা :

ক. সাধারণ নীতি

খ. মঞ্চ-কৌশলে ঘটনা বিন্যাস

গ. বন্টন

ঘ. উদ্বুদ্ধ করা

ঙ. বিবিধ[২১৪]

ক. সাধারণ নীতি

দৈনন্দিন জীবনের প্রথাগুলো পরিহার করে সোফা ও টেবিলগুলো একদিকে এবং কিছু চেয়ার অন্য দিকে বসান যেতে পারে। সময়ের পরিবর্তন হলে যদি পুনরায় ঐ সেট উপস্থাপন করতে হয় তবে তা প্রথাগত এবং অবাস্তব হয়ে যেতে পারে। যদিও এটা খুব স্বাভাবিক হয় না তারপরেও যথাসম্ভব একটি কক্ষ তৈরি করতে হয়। যেমন– 'প্রতিটি আসবাবপত্র থাকতে পারে দেয়ালের সাথে লাগানো, চেয়ারগুলোর অবস্থা দর্শকের মুখোমুখি নয় কিন্তু প্রত্যেকটি চেয়ার, আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে যাতে মনে হয় একটি কক্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।'[২১৫]

খ. মঞ্চ-কৌশলে ঘটনা বিন্যাস

মঞ্চে প্রতিটি আসবাবপত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি আসবাবপত্র সাবলীল অভিনয় এলাকাও তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– 'পাদানী, টেবিল, সংবাদপত্র, বাক্স, ছাইদানী প্রভৃতি দ্রব্যগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে হয়। প্রত্যেকটি দ্রব্য যাতে অভিনয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং সেগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার শৈল্পিকভাবে নির্দেশককে নিশ্চিত করতে হয়।'[২১৬]

গ. বন্টন

ন্যূনতম কিছু দ্রব্য সম্মুখ মঞ্চে থাকতে পারে এবং একটা ডানে অন্যটা বামে। যদি ফায়ার প্লেস থাকে তবে তাকে সম্মুখ মঞ্চের দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখা যেতে পারে এবং সামনে একটা টুল থাকতে পারে।

[২১৪]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 270-71।

[২১৫]. Ibid, Page 271।

[২১৬]. Ibid, Page 270-271।

সাধারণত চেয়ারগুলো সম্মুখ মঞ্চে প্রোফাইল অবস্থায় এবং জানালা পার্শ্ব দেয়ালে থাকতে পারে। তাতে ঘটনা বর্ণনায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহায়ক হতে পারে। তবে 'এমন কোনো দ্রব্যাদি মঞ্চে ব্যবহার করা উচিত নয় যার কোনো ব্যবহার নেই। যদি দুইয়ের অধিক প্রবেশ–প্রস্থানের দরজা থাকে তবে নির্দেশককে উভয়েরই সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়।'[২১৭]

ঘ. উদ্বুদ্ধ করা

অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রত্যেকটি প্রস্থান যেন দর্শক বুঝতে পারে সেদিকে নির্দেশক লক্ষ রাখতে পারেন তাই প্রবেশ-প্রস্থান যাতে একই জায়গা থেকে হয় তার প্রতিও নির্দেশককে সতর্ক থাকতে হয়। 'যদি কোনো অতিথি বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তবে তাকে ঐ দরজা দিয়ে প্রস্থান এবং পুনরায় প্রবেশ করলে তাকে বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাতে হয়।'[২১৮]

ঙ. বিবিধ

যখন দুই বা তিনটি মঞ্চ এলাকায় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলা হয় সুশৃঙ্খল বা পরিপাটি মঞ্চ এলাকা। 'বড় আসবাব থাকলে দেয়ালের সাথে এবং ছোট আসবাব থাকলে যথাসম্ভব মাঝখানে কোনো দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি আসবাবপত্র এলাকা অনুসারে ভারসাম্য রক্ষা করে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সতর্কভাবে আসবাবপত্র ব্যবহার করতে হবে যেন মনে হয় বাস্তবের প্রতিকৃতি। আলোর ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী আলো ব্যবহার করা যেতে পারে।'[২১৯] দৃশ্য পরিবর্তনের সাথে যদি মঞ্চ পরিবর্তন করতে হয় তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আর যদি দৃশ্য পরিবর্তন না থাকে তাহলে 'নাট্যক্রিয়া' দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্য ও আসবাবপত্রগুলোর দৃশ্যান্তর অধিকতর আকর্ষণীয় ও অর্থবহ হয়ে উঠেতে পারে। সেক্ষেত্রে নাট্যক্রিয়ার সাথে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। যদি একই আসবাব পুরো নাটকে থাকে তবে প্রবেশ-প্রস্থানের বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে।

নির্বাক অভিনয়ের প্রয়োগ

নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে একটি নাটকের বিষয়, স্থান, চরিত্র প্রভৃতি স্পষ্ট করা সম্ভব। মনে করা যাক– একটি নাটক মঞ্চায়িত হতে যাচ্ছে যার ভাষার সাথে দর্শকের কোনো রকম পরিচয় নেই। সেক্ষেত্রে চরিত্র, স্থান ও পরিবেশকে এমনভাবে চিত্রিত করতে হয় যাতে দর্শক তা বুঝতে পারে যে কী ঘটনা ঘটছে। কোনো রকম শব্দ

---

২১৭. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 271।
২১৮. Ibid, Page 272।
২১৯. Ibid, Page 272।

দিয়ে তা বোঝান সম্ভব নয়। তাই সবকিছুই অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও চলন দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। একটি নাটকে নির্বাক অভিনয় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। নিম্নে আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারার মতে নির্বাক অভিনয়ের প্রয়োগ বা ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

১. সাধারণ কার্যাবলী

২. নাটক নির্বাচন

৩. নাটকের শুরুতে ক্রিয়ার ব্যবহার

৪. নাটকের মধ্যবর্তী ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ

৫. শেষ দৃশ্যে ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ

৬. নাটকের ধরন অনুযায়ী ক্রিয়ার প্রয়োগ

৭. গুরুত্ব প্রদানের জন্য ক্রিয়ার ব্যবহার

৮. স্থান ও পারিপার্শ্বিকতায় ক্রিয়া প্রয়োগ

৯. দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারে ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ [২২০]

১. সাধারণ কার্যাবলী

নির্দেশক প্রথমে নাটকটি পাঠ করে তার সার্বিক একটা 'ক্রিয়া' কল্পনা করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলো হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ছবি, চলন, অবস্থান এবং ধারাবাহিক কাজ। এক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলোতে ধারাবাহিকতা নাও থাকতে পারে তবে অবশ্যই এটা পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিকে যেতে সহযোগিতা করতে পারে এবং সমগ্র নাটকটিকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। নির্দেশকের পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে ক্রিয়াগুলোকে নাটকের বিষয়ের সাথে নির্দিষ্টকরণ ও তাঁর কল্পনার সাথে যুক্ত করা। নির্দেশক নিজের মতো করে সর্বাপেক্ষা ভালো ক্রিয়া যা নাটকের বিষয়কে ব্যাখ্যা প্রদান করে সেগুলোকে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন কোনটা চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ততা, স্থানের ও অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে। এসব কিছুই নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্রায়ণকে উন্নতি, গভীরতা এবং নাটকের বিষয়ের সাথে বাস্তবতা প্রকাশে সহযোগিতা করতে পারেন। এগুলো অবশ্যই নির্দেশকের স্থান, মানুষ এবং বস্তুর বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।

এসকল পদক্ষেপ পূরণের জন্য নির্দেশককে অবশ্যই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে এই উপাদানগুলো মিলিয়ে দেখতে পারেন। 'পরবর্তীকালে তিনি কল্পনার সাথে এগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যুক্ত করে অধিকতর কার্যকারী, শক্তিশালী ও ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে পারেন। এগুলো প্রয়োগ করে নির্দেশক চরিত্রের বাস্তবতা, অবস্থা,

[২২০]. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 273-276।

পারিপার্শ্বিকতা এবং ভাব প্রকাশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্দেশক ক্রিয়াগুলোকে চরিত্রায়ণের সাথে সাদৃশ্য ঘটাতে পারেন যাতে দর্শকের মাঝে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং যার সাথে দর্শক নিজেও সক্রিয় থাকতে পারে। এসব ক্রিয়াগুলোকে সার্বিকভাবে নির্দেশক পূর্ণাঙ্গতা দান করতে পারেন যা, সাবলীলভাবে নাটকের পরিপ্রেক্ষিতকে ধারণ করবে।'[২২১]

২. নাটক নির্বাচন

নাটক নির্বাচনে নির্দেশক এমন কিছু ক্রিয়া পাণ্ডুলিপিতে লক্ষ্য করেন যার জন্য তিনি নাটকটি নির্বাচনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যখন তিনি নাটকটি মহাড়ায় রূপান্তরিত করেন তখন সেই ক্রিয়াগুলো প্রকাশ করতে পারেন। 'নির্দেশক নাটকটি মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে চরিত্রগুলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁর কল্পনার চরিত্রের সাথে রূপদান করাতে পারেন যাতে নাটকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি রূপ ধারণ করে, সর্বোপরি বৈচিত্র্যপূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়।'[২২২]

৩. নাটকের শুরুতে ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ

নাটকটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে যেখানে একেবারে উচ্চ বুদ্ধিভিত্তিক ও সাধারণ ক্রিয়া যুক্ত না থাকে, যাতে দর্শক প্রথম দেখেই বিমুখ না হয়ে পড়ে এবং দুর্বোধ্যতায় না ভোগে। তাই এসকল ক্ষেত্রে নির্দেশককে সর্বদা স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যবহার করতে হয়। নাটকের শুরুর দৃশ্যে এমন কোনো ক্রিয়া, অঙ্গ-ভঙ্গি বা শব্দ রাখা উচিত নয় যাতে দর্শক অস্বস্তি অনুভব করে এবং নাট্যক্রিয়া বুঝতে দ্বান্দ্বিকতায় ভোগে। যেহেতু ফার্স ও মেলোড্রামাতে দ্রুত ক্রিয়া উপস্থাপিত হয়ে থাকে যেহেতু নির্দেশক যথাসম্ভব নাটকের লয়কে পুরো বিষয়ের সাথে সমন্বয় ঘটাতে পারেন। নাটকের কোনো একটি দৃশ্যের শুরুতে নাট্যকার প্রধান অথবা অপ্রধান চরিত্র দ্বারা শুরু করতে পারেন। এসকল ক্ষেত্রে নির্দেশক বিবেচনা করে অপ্রধান চরিত্র দিয়ে প্রধান চরিত্রের গুরুত্ব বাড়াতে পারেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– 'একটি চায়ের আসরে গৃহকর্তা ও মেহমানদের মাঝে বাড়ীর কাজের লোক চা নিয়ে এসে নিজেই পরিবেশন করলে সেই কাজের লোক বেশি প্রাধান্য পেতে পারে। যদি কাজের লোক চা নিয়ে আসার পর গৃহকর্তা নিজে পরিবেশন করেন তাহলে গৃহকর্তা প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে নির্দেশককে ভাবতে হয় আসলে তিনি কাকে গুরুত্ব দিতে চান বা কার গুরুত্ব পাওয়া উচিত।'[২২৩]

---

২২১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 274।
২২২. Ibid, Page 274।
২২৩. Ibid, Page 275।

৪. নাটকের মধ্যবর্তী ক্রিয়ার ব্যবহার

'যখন নাটকের দ্বান্দ্বিক মুহূর্ত সৃষ্টি হয় এবং এর নিজস্ব উত্তেজনা ও আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তখন নির্দেশককে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হয় যাতে কোনো বিশৃঙ্খলার দৃশ্য এবং অতিরঞ্জিত ক্রিয়া যুক্ত না হয়। কমেডি ও ফার্সে ক্রিয়াগুলো হাস্যকর অবস্থায় উপনীত হয় এবং বড় একটি হাস্যক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে।'[২২৪] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– হাসির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া ব্যর্থ হতে পারে ফলে নাটকের শেষে বৈপরিত্য সৃষ্টি হয়।

৫. শেষ দৃশ্যে ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ

নাটকের শেষ দৃশ্য হলো সবগুলো দৃশ্যের সমন্বিত ফল। তাই নির্দেশককে সঠিক ক্রিয়ার দ্বারা শেষ দৃশ্য উপস্থপন করতে হয়।[২২৫]

৬. নাটকের ধরন অনুযায়ী ক্রিয়ার প্রয়োগ

নির্দেশক নাটকের ধরণ উপস্থাপন করতে পারেন। যে রীতিতে নাটকটি উপস্থাপিত হবে ক্রিয়াগুলো যাতে রীতির বহিঃর্ভূত না হয় সেদিকে নির্দেশক লক্ষ্য রাখেন।[২২৬]

৭.গুরুত্ব প্রদানের জন্য ক্রিয়ার ব্যবহার

চরিত্র উপস্থাপনায় তার ক্রিয়াগুলো প্রতিটি রেখা এবং চলনের জোর প্রদানের জন্য নির্দেশককে অবশ্যই সীমার মধ্যে থাকতে হয়। ভালোবাসা, ক্রোধ, ক্ষোভ, রাগ ও ঘৃণার দৃশ্যে চরিত্রের প্রতিটি ক্রিয়াকে সঠিক ছন্দ অনুযায়ী উপস্থাপন করতে হয়।[২২৭]

৮. স্থান ও পারিপার্শ্বিকতায় ক্রিয়া প্রয়োগ

স্থান ও পারিপার্শ্বিকতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজন নাই। যখন দুটিই দর্শক অনুধাবন করতে পারে তখন নাট্য ঘটনার মধ্যে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। তাই স্থান ও পারিপার্শ্বিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য খুব সতর্কভাবে 'জোর' দিতে হয় যাতে বাস্তবতার অনুভূতি নষ্ট হয়ে না যায়। শব্দ– স্থান ও পারিপার্শ্বিকতা তৈরির ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও এগুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা

---

২২৪. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 275।

২২৫. Ibid, Page 275।

২২৬. Ibid, Page 276।

২২৭. Ibid, Page 276।

হয় তথাপি লক্ষ্য রাখতে হয় যে– 'বৃষ্টি, ঝড়, বাতাস, রাস্তার কোলাহল, ট্রেন, গীর্জার ঘণ্টা, ড্রামের বীট প্রভৃতি নেপথ্য হতে নাটকের ক্রিয়ার সময়ের সাথে যথাযথ মিল রেখে ঠিক সময়ে ব্যবহার হয়েছে কিনা, যাতে দর্শক কল্পনা করে স্থান ও পারিপার্শ্বিকতার আবহে আবর্তীত হতে পারে।'[২২৮] অন্যথায় অসর্তকতার জন্য নাট্যক্রিয়া ব্যাহত হয়ে হাস্যরস উৎপন্ন হতে পারে।

৯. দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারে ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ

বাস্তবধর্মী নাটকে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি চরিত্র ও ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে এবং একটি উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে। যেমন– 'বাস্তবধর্মী নাটকের ক্ষেত্রে চা, পানীয়, সিগারেট প্রভৃতি নির্দেশককে মঞ্চ পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করতে হয় যাতে পরবর্তীকালে নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যায় না পড়ে।'[২২৯]

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, নির্বাক অভিনয় নাটককে দর্শকের কাছে অনেক বেশি বোধগম্য করে তুলতে পারে। ভালো নির্বাক অভিনয় হলে যে দর্শক নাটকে ব্যবহৃত ভাষা জানেন না নাটকের বক্তব্য তার কাছেও বহুলাংশেই বোধগম্য হতে পারে। তাই নির্বাক অভিনয়কালে সংযমটা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় দরকার। অনর্থক কেরামতি দেখাবার জন্য বেশি-বেশি অঙ্গ-ভঙ্গি করা খুবই অনুচিত। অনর্থক কেরামতিতে দর্শকের কাছে নাট্য-বিষয় পরিষ্কার হবার বদলে আরো ঝাপসা হয়ে যেতে পারে এবং দর্শক খুশি হবার বদলে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। নির্বাক অভিনয় হলো চশমার কাঁচের মতো– 'হয় তা দৃষ্টি পরিষ্কার করে, নয়তো ঝাপসা করে।'[২৩০] অতত্রব নির্বাক অভিনয়ের ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রা নির্ণয় করা নির্দেশকের অন্যতম দায়িত্ব।

উপর্যুক্ত এই 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যতীত Directing a play (Michal Mc Caffery, phaidon, oxford, First published, 1988, page 94) গ্রন্থে Business (আনুষঙ্গিক কাজ) এবং Theatrical Design and production (J. Michael Gillett, May field publishing company, califonia, 1987, page 73) গ্রন্থে Harmony (ঐকতান) নামে আরো দু'টি বিষয়ের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।[২৩১]

৬. আনুষঙ্গিক কাজ

মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা বা অস্বস্তির কাজ করে। সংলাপ বলার সময় চরিত্র কী করে ! স্তানিসস্লভস্কি এই শূন্যতা ভরাট করে দেবার জন্য একটি কৌশল প্রয়োগ

---

২২৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 276।

২২৯. Ibid, Page 277।

২৩০. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৫।

২৩১. রশীদ হারুন, নির্দেশকের ব্যবহারিক কৌশল, *থিয়েটার স্টাডিজ* (সম্পাদক : মু: মঈন উদ্দিন আহমেদ), নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি., সংখ্যা : ১, ১৯৯২, পৃ. ১১৯-১২০।

করেছেন, যার নাম দিয়েছেন ‘বিজনেস’। ‘In the theatre, ‘business’ means any on stage activity by an actor, relating to another actor or an object aimed at producing a specific effect।’[২৩২] বাস্তব জীবনে কাজ-কর্ম, কথা বার্তায় অভ্যাসগতভাবে প্রত্যেকেই কিছু অঙ্গ সঞ্চালন করে থাকে। যেমন, ‘একভাবে অধিক্ষণ না বসে একটু অন্যভাবে বসা, সিগারেট ধরানো টেবিলের ওপারকার পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া, কথাবলার ফাঁকে পত্রিকার পাতা উল্টানো ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। মঞ্চে চরিত্রের শিল্পরূপায়ণে বাস্তব জীবনের এমনই কিছু স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক কাজ প্রয়োগ করলে চরিত্র যেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তেমনি অভিনেতা-অভিনেত্রী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে শারীরিক চলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। নির্দেশক এই রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ অসংখ্য ছোট-ছোট ‘আনুষঙ্গিক কাজ’ পৌনঃপুনিক মহড়ার মাধ্যমে চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত করিয়ে দিতে পারলে অভিনেতা-অভিনেত্রী অর্জন করবেন দৃঢ় মনোবল ও বিশ্বাস।’[২৩৩]

৭. ঐকতান

সমগ্র মঞ্চায়ন পরিকল্পনার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা নির্দেশকের গুরুদায়িত্ব। এই সামঞ্জস্য বিধানই হলো ঐকতান। ‘Harmony as the sense of blending and unity that is obtained when all elements of a design fit together to create an orderly, congrus whole।’[২৩৪] দৃশ্যানুগ প্রয়োজনে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে নাটকের চরিত্রসমূহের। চরিত্রের সংলাপ এবং আবেগানুভূতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয় মঞ্চতল, বিন্যাস, চরিত্রের চলনরেখা, ছন্দ ইত্যাদি। ‘চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তাদের মঞ্চ ব্যবহারের কৌশল। যেমন– সংলাপের প্রয়োজনে একটি চরিত্রকে যদি সম্মুখ থেকে পেছন মঞ্চে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে মঞ্চে উপস্থিত অন্য চরিত্রের চলন রেখা স্থির হতে হবে দৃশ্যের মূলভাব এবং চরিত্র ও সংলাপের অন্তর্নিহিত অনুভূতি অনুযায়ী। এই উভয় চরিত্রের মঞ্চে অবস্থান এবং মঞ্চ দৃশ্যের বিভিন্ন উপাদানের– রেখা, আকার, আয়তন ও রঙের আবেগ এবং সাংকেতিকগত মূল্যের সুন্দর সমন্বয় সাধন বা ঐকতান সৃষ্টি করবেন।’[২৩৫]

উপর্যুক্ত ‘পঞ্চ-সূত্র’ আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল কাজই যেমন শিক্ষা সাপেক্ষ, নির্দেশনা-কৌশলও তেমনি শিক্ষা সাপেক্ষ। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে শিল্পের সৃষ্টিমূলক দিকটি কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। শিক্ষা সেইসব উপাদান সম্পর্কেই জ্ঞান সঞ্চার করতে পারে মাত্র, যে সব উপাদান না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘কাব্যসৃষ্টির নিয়ম কেউ কাউকে শেখাতে পারে

---

[২৩২] চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১২১।
[২৩৩] প্রগুক্ত, পৃ. ১২১।
[২৩৪] প্রগুক্ত, পৃ. ১২১।
[২৩৫] প্রগুক্ত, পৃ. ১২১।

না। যা শেখানো যায় তা হলো– ছন্দ, অন্তমিল, রূপক, উপমা, শব্দচয়ন ইত্যাদির নিয়ম। ছন্দ, অন্তমিল প্রভৃতি ছাড়া কাব্য হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে ছন্দ, অন্তমিল ইত্যাদি থাকলেই যে কাব্য সৃষ্টি হয় তাও নয়। শুভঙ্করের আর্যা, কিম্বা জ্যোতিষের শ্লোকেও ছন্দ, অন্তমিল ইত্যাদি আছে, কিন্তু তা কাব্য নয়। কাব্য সৃষ্টির জন্য প্রতিভা ও সৃজনশীলতার প্রয়োজন আছে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রঙ করা, রেখা টানা ইত্যাদি প্রাথমিক নিয়ম শেখা যায়, কিন্তু রঙ রেখা ঠিক হলেই যথাযথ ছবি হয় না। কিম্বা বলা যায়, অক্ষর লিখতে জানলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না কিন্তু সাহিত্যিক হতে গেলে অক্ষর জ্ঞানটা অবশ্যই চাই।'[২৩৬] নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রেও একই কথা। অভিনয়, বিন্যাস, আলোক, মঞ্চ থাকলেই সার্থক নির্দেশনা হবে এমন বলা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে অভিনয়, বিন্যাস, চলন, দৃশ্যায়ন, ছন্দ, নির্বাক অভিনয় ইত্যাদি ছাড়া কোনো সার্থক নাট্য উপস্থাপনাও সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার যে, নাট্যোপস্থাপনার নানা রীতি ও প্রক্রিয়া থাকে। একই নাটক বিভিন্ন রীতিতে সফলভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই 'পঞ্চ-সূত্রে'র উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ রীতির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা নয়। এর উদ্দেশ্য এই বহু রীতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যেও যে সাধারণ নিয়মগুলি কাজ করে সে সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষাদান। যেমন, নির্দেশক যে রীতিতেই নাটক উপস্থাপনা করুক না কেন মঞ্চের গুরুত্ব অনুসারে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাস নির্দেশককে করতেই হয়। কতো প্রকারে বিন্যাসের ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে সেগুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এইরকম সাধারণ কিছু প্রাথমিক কৌশল, প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুনই এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের রূপরেখা নির্ণয় করা ও পাশ্চাত্য নাট্য-নির্দেশনা অর্থাৎ নির্দেশনায় যে 'পঞ্চ-সূত্রে'র বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের ছাপ, তা বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) পরিচালকের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে সেটা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

[২৩৬] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল

'নাট্যাভিনয়' এবং 'নাট্য-নির্দেশনা' প্রসঙ্গ দুটি যেহেতু পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, সেহেতু বলা যেতে পারে নাট্য-নির্দেশনার ইতিহাস নাট্যাভিনয়ের সমান বয়সী। কেননা নাট্যাভিনয়ে পূর্বপরিকল্পনা বা পূর্বপ্রস্তুতির আবশ্যকতা থাকায় পরিকল্পকের (নির্দেশক) অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পকরূপী নির্দেশকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব নাটক উদ্ভবের অনেককাল পরে। 'বাঙলা নাট্যাভিনয়ের সূচনাপর্ব থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) নির্দেশিত– *সীতা* (১৯২৩) নাটকটি উপস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত নাট্য প্রযোজনায় 'নির্দেশনা' প্রসঙ্গটি পরিলক্ষিত হলেও, নির্দেশক নামে পৃথক কোনো সত্তার সন্ধান মেলে না। যদিও এ সময়ের নাট্যচর্চায় নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো প্রধান ব্যক্তি নির্দেশনার কাজটি সম্পন্ন করতেন।'[১]

গবেষকের মতে, 'বাঙলা নাটকের মধ্যযুগ (১৮৫০) পর্যন্ত নাটক কথাটি সচরাচর দৃষ্ট না হলেও গৃহাঙ্গন বা আসরকেন্দ্রিক দর্শক-গায়েন-দোহার অধ্যুষিত আখ্যানমাত্রই নাট্য রূপে বিবেচ্য।'[২] উল্লিখিত সময়ের নাট্যচর্চায় অধিকাংশ নাট্যে একজন প্রধান ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষণীয়। যিনি পালা-বাঁধা, গীতরচনা অভিনয় এবং দলের অন্যান্যদের নাট্য বিষয়ে শিক্ষাদানসহ পুরো নাট্যাভিনয়কে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অর্থাৎ পরিবেশিত নাট্যের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনার কর্মটি সম্পন্ন করতেন প্রধান অভিনেতারূপী দলের এ মুখ্য ব্যক্তিটি। 'সময়, স্থান ও নাটকের আঙ্গিক-অনুযায়ী তিনি পরিচিত ছিলেন সঙমাস্টার, ওস্তাদ, সূত্রধার, অধিকারী এবং মোশন মাস্টার অভিনয়।'[৩] চৈতন্যদেবের নাট্য-প্রসঙ্গ ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এ পর্বের নাট্যচর্চার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ কোনো আলোচনার অবকাশ নেই। অর্থাৎ এ সময়ের নাট্য-নির্দেশনা প্রসঙ্গটি অনেকটাই অনুমান-নির্ভর আলোচনায় সীমাবদ্ধ।

চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় এবং নাট্য-নির্দেশনার খানিকটা সাহিত্যিক প্রমাণ মেলে চৈতন্যজীবনীকারগণ রচিত চৈতন্যদেবের সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে। যেমন বৃন্দাবনদাস রচিত– *শ্রীচৈতন্যভাগবত* (১৫৪৪ থেকে ১৫৫৩-৫৫ খ্রিঃ) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত– *চৈতন্যচরিতামৃত* (আনু. ১৬১৫) গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নাট্য-নির্দেশনা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সূত্রাকারে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখিত তথ্যগুলো বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত বাঙলা

---

[১] এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা ১৯৭২-২০০০* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০), পৃ. ১৭।

[২] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৪১।

[৩] ড.মনীন্দ্রলাল কুণ্ডু, *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ* (কলকাতা : সাহিত্য লোক, ২০০০), পৃ.১৯৫-৯৬।

নাট্য-নির্দেশনার প্রাচীনতম এবং একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রামাণ হিসেবে সমালোচকদের কাছে বিবেচ্য। উক্ত গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে এ কালের সতর্ক বিচারে চৈতন্যদেবকে একজন আধুনিক নাট্য-নির্দেশকের নিকটতম পূর্বসূরি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আধুনিক নির্দেশনা-কর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায় চৈতন্যদেবের নাট্য-নির্দেশনায়। উল্লেখ্য যে, 'নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবকে আমরা পাই একই সঙ্গে নাট্যকার, প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশক রূপে। চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙলা নাট্যাভিনয়ের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ হচ্ছে– বিভিন্ন প্রকার *মঙ্গলকাব্য*, *প্রণয় পাঁচালি*, *পীর পাঁচালি* এবং *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*। এসব নাট্যের নির্দেশনা-কর্মটি সম্পন্ন হতো গায়েনরূপী প্রধান অভিনেতা কর্তৃক।'[৪]

প্রাচীন ভারতের– '*ভরত নাট্যশাস্ত্রে* (খ্রিঃ ৪র্থ-৫ম শতক) নাট্য-নির্দেশক পরিচিত হয়েছেন নাট্যাচার্য বা সূত্রধার নামে।'[৫] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, নির্দেশকের কার্য সম্পর্কে সুচিন্তিত মতবাদ প্রথম লক্ষ্য করা যায় ভরত নাট্যশাস্ত্রে। নাটকের প্রয়োগিক দিক সম্পর্কে ভরতের শিল্পচিন্তা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত আধুনিক বিধায় ভরতকে বিশ্বের প্রথম আধুনিক নির্দেশক রূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তবে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ রয়েছে। কারণ, ভরতের নাট্যচর্চা আবর্তিত হতো মূলত ধর্মীয় ক্রিয়ার অনুষঙ্গে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী থেকে বাঙলা থিয়েটার গড়ে ওঠে ইংরেজদের থিয়েটারের আদর্শ অনুসারে। অর্থাৎ নাটক রচনা, অভিনয়, প্রয়োগ-পরিকল্পনা, মঞ্চ এবং নির্দেশনাসহ সার্বিক বিষয়ে পাশ্চাত্য-রীতিরই অনুসরণ হতে থাকে বাঙলা নাট্যাভিনয়ে।

তাইতো আধুনিক থিয়েটারে নির্দেশকের ভূমিকা অপরিসীম। একজন নির্দেশকের পরিচয় অন্তত আধুনিক নাট্যচর্চার অঙ্গনে আজ কারোই অজানা নয়। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা সবারই আছে। সামগ্রিক বিষয়কে সমন্বিত করে নাটককে সুষ্ঠু সম্পাদন তথা শৈল্পিক উৎকর্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়াই তাঁর মূল দায়িত্ব। এক কথায় তিনি হলেন দর্শকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চলমান, দৃশ্যমান, অভিনেয় নাটকটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যিনি নাটকের পাণ্ডুলিপি হৃদয়ঙ্গম করে, প্রয়োজনবোধে নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ কৌশলে দর্শককে একটি সফল প্রযোজনা উপহার দিতে প্রয়াসী হন। তাই সফল ও রসোত্তীর্ণ প্রযোজনার কৃতিত্ব অনেকখানি নির্দেশকের ভাগ্যে জুটে যায় তেমনি অসফল প্রযোজনার দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়। চলচ্চিত্রশিল্পেও নির্দেশক বা পরিচালক সমভাবে প্রধান ব্যক্তি। বর্তমান থিয়েটারে আমরা নির্দেশক নামকরণে যে শিল্পীকে পাই, তার ধারণা ইউরোপ থেকেই প্রথম আসে। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ

৪. এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা ১৯৭২-২০০০* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০), পৃ. ১৮।

৫. ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র ৪র্থ খণ্ড* (কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ২৩১-৩২।

শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় থিয়েটারে ব্যাপক পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়, যা ছিল মূলত অভিজাততন্ত্রের বৃত্ত থেকে বের করে থিয়েটারকে গণমানুষের নিকটবর্তী করার এক অপূর্ব প্রয়াস। এই পরিবর্তনকালে (উনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকে) একজন ভিন্ন ব্যক্তিকে নাটক প্রযোজনায় নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সে সময়ে তাঁর ভূমিকা ছিল অভিনয়সহ থিয়েটারের অন্যান্য দিকগুলোকে পর্যবেক্ষণ, পরিশোধন ও সমন্বয়সাধন করা। 'বিংশ শতাব্দীতে নির্দেশক সত্তাটি আরো পরিশীলিত ও পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। এমনকি সমকালীন প্রযোজনার নান্দনিকতা ও সফলতা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও চিন্তা-চেতনার ফসল বলেই ধরা যায়।'[৬] এক কথায় আধুনিক মঞ্চ নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সিংহভাগের দায়-দায়িত্ব নির্দেশকের। প্রত্যেক নির্দেশকই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও সৃজনশীল। এঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত নির্দেশনা-পদ্ধতি ও প্রয়োগ-কৌশল থাকে যা বিচিত্র, অভিনব, অদ্ভুত, চমকপ্রদ ও মজার।

নাট্যকার নাটক রচনা করে তাঁর কাজ শেষ করেন– সাহিত্য সৃষ্টিতেই তাঁর কাজের সমাপ্তি। তারপর চলমান ও দৃশ্যমান থিয়েটারের অঙ্গনে পদার্পণ করেন নির্দেশক, যিনি এই প্রয়োগশিল্পের জগতে দল-প্রধান এবং অগ্রগণ্য সৃজনশীল ব্যক্তি। বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা-ম্যানেজার হেনরী আরভিং এ প্রসঙ্গে অনেকটা দম্ভভরে বলেছিলেন– 'নাট্যকারের চাইতে থিয়েটার বড়, কোনো ব্যক্তি বিশেষের মাউথপিসের তুলনায় এর পরিণতি অনেক গভীর ও ব্যাপক এবং সবশেষে নাটক থিয়েটারের জন্যে এবং থিয়েটার নাটকের জন্যে নয়।'[৭] একজন সত্যিকার 'নাট্য-নির্দেশক' এই উক্তিটির মর্ম বুঝতে পারবেন এবং একজন নাট্য-নির্দেশকের দৃষ্টিকোণ থেকে আরভিং-এর উক্তি মোটেই দাম্ভিক ছিল না। নির্দেশকের 'কর্তব্য' ও 'ভূমিকা' সম্পর্কে নাট্য-প্রাবন্ধিক লি-সিম্পসন তাঁর 'দ্য ষ্টেজ ইজ সেট' বইয়ে লিখেছেন যে– 'একজন ভালো নাট্য-নির্দেশককে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ নাট্যানুষ্ঠানটি আগে থেকেই দেখতে হবে এবং প্রতিটি বিযুক্ত মুহূর্তগুলোকে শৃংখলাবদ্ধ করে এক সুতোয় গাঁথতে হবে।'[৮] এই নাট্য-সংগঠককে নিজস্ব 'ক্ষমতার' সম্পূর্ণ আওতাভুক্ত করে আলোক, পোশাক, রূপসজ্জা, আবহসংগীত, মঞ্চ-পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি অভিনয়কে কঠোর শৃংখলায় সংঘবদ্ধ করে নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই অভিমত শুধু স্তানিস্লাভস্কি বা আঁতোয়ারই নয় আরো অনেকের। অবশ্য বের্টল্ট ব্রেখট এ বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মতে– এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ চেতনায় নাটকীয় শৃংখলা অসম্ভব। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন, 'যন্ত্রণায় কাতর শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সবারই একটি সাধারণ মাউথপিস থাকতে পারে না।'[৯] ব্রেখট হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, যতই বলা হোক না কেন শিল্প নিরপেক্ষ,

---

[৬] আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩১-৩২।

[৭] আতাউর রহমান সম্পাদিত, *নাটক করতে হলে* (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১১২।

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

কার্যক্ষেত্রে শিল্প ক্ষমতাসীন প্রশাসনিক যন্ত্রের হাতের কর্কশ বীণা। তাই তিনি তাঁর এপিক থিয়েটারে উদ্‌ভাবন করেছিলেন 'বিযুক্তিকরণ' পদ্ধতির, যাতে করে স্থবির চেতনা আঘাতে-আঘাতে বুঝতে পারে যে, এ সমাজ গতিময় ও পরিবর্তনশীল। ব্রিটিশ নাট্য-সমালোচক ও লেখক আইভর ব্রাউন তাঁর 'পার্টিস অব দ্য প্লে' গ্রন্থে নির্দেশকের কর্তব্য সম্পর্কে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তাঁর মতে :

> নির্দেশকের অবশ্যই সহজাত অভিনয় ক্ষমতা থাকতে হবে। মঞ্চে প্রায়োগিক অসুবিধাগুলো তাঁকে যথার্থভাবে বুঝতে হবে। নির্দেশকের তার চেয়েও বড় কাজ হলো, নাট্যকার যে মূল বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নাটকটিকে বিচার করা। শব্দকে দৃশ্যমান এবং কল্পনাকে পরিবেশের বাস্তবতায় আবদ্ধ করাটাও নির্দেশকের কাজ। এক কথায় বস্তু ও মননের সমন্বয় ঘটিয়ে নির্দেশক এক সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মে নিয়োজিত হন, যেখানে তাঁর মূলধন হলো নিজের বোধশক্তি, অন্যের ধারণক্ষমতা. যোগ্যতা এবং সর্বোপরি নাট্যশালার কারিগরি সুযোগ-সুবিধা।[১০]

হেলেন ক্রিক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'দ্য ইমারজেন্স অব দ্য ডাইরেক্টর'-এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে– 'নির্দেশক হলেন এমন এক সৃজনশীল ব্যক্তি যে তাঁর সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নিরিখে উপস্থিত বাস্তব অবস্থাসমূহকে শৃংখলাবদ্ধ করে থিয়েটারকে তার চূড়ান্ত সত্যনিষ্ঠ আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হন।'[১১] ফাইলিস হার্টনোল তাঁর 'দ্য অক্‌সফোর্ড কোম্পেনিয়ন টু দ্য থিয়েটার' বইয়ে লিখেছেন যে– 'একজন আদর্শ নাট্য-নির্দেশককে একাধারে অভিনেতা/ত্রী, অঙ্কন শিল্পী, স্থপতি, বৈদ্যুতিক কারিগর, ভূগোল ও ইতিহাসে পণ্ডিত, সুদক্ষ পোশাক ও দৃশ্য পরিকল্পনাকারী হতে হবে এবং সর্বোপরি তাঁর মানব চরিত্র বোঝার অসাধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে।'[১২]

হেরল্‌ড ক্লারম্যানের অভিমত হলো– 'যখন একজন নাট্য-নির্দেশক নাটকের কোনো দৃশ্যের কার্যক্রম আবিষ্কার করেন তখন তাঁর কাছে মানবিক দ্বন্দ্বের প্রকাশটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ সংলাপ উচ্চারণ নয়। সেই কারণেই হয়তো বলা হয় যে বধির দর্শকই অভিনয়কলার প্রকৃত বিচারক, কারণ তাঁর কাছে নাটকের সংলাপ গৌণ এবং দৃশ্যমান ঘটনা প্রবাহ মূখ্য। ক্লারম্যান আরও মনে করেন, নাটকের সংলাপ জাগতিক

---

১০. আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩৫।

১১. আতাউর রহমান সম্পাদিত, *নাটক করতে হলে* (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১১২।

১২. আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩৫।

ক্রিয়াকর্মের বিশ্বজনীন ভাষা নয়, সুতরাং সংলাপের সুষ্ঠু প্রকাশ সুন্দর বাচনভঙ্গিতেই নিহিত নয়, সংলাপ সার্থকতা খুঁজে পায় নির্ভেজাল নাটকীয় সংকল্পের মাধ্যমেই।'[১৩]

নাট্যাঙ্গনে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাট্য-নির্দেশনা সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বমূলক মন্তব্য করেছেন। জন মেস ব্রাউন বলেছেন– 'নির্দেশক হলেন একজন সক্রিয় সমালোচক।'[১৪] সুবিখ্যাত নাট্য-নির্দেশক টায়রন গাথরির অভিমত হলো– 'নির্দেশক হলেন একজন আংশিক শিল্পী যিনি একদল শিল্পীর পৌরহিত্য করেন এবং সেই শিল্পীরা কেউ ছেলে-মানুষ কেউবা উচ্ছৃংখল, আবার কেউ-কেউ মুহূর্তের ব্যবধানে উত্তেজিত, উদ্দীপিত বা নির্বাপিত।'[১৫] রুশ নির্দেশক মেয়ারহোল্ড মনে করেন– 'নির্দেশক, দর্শক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেন যেখানে দর্শক শুধু উচ্চারিত শব্দমালাই শ্রবণ করে না বরং অন্তর্নিহিত ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।'[১৬] বিশিষ্ট ফরাসি নির্দেশক লুই জুভে নির্দেশকের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলেছেন– 'নির্দেশককে এমন একটি ভূমি তৈরি করতে হয় যেখানে মঞ্চের প্রত্যক্ষ ও মিলনায়তনের পরোক্ষ অভিনেতাদের (দর্শকদের) আত্মিক সাক্ষাৎ সম্ভব।'[১৭]

আধুনিক পাশ্চাত্য থিয়েটারে জিনিয়াস 'গুরু' অভিধায় অভিহিতো পিটার ব্রুক বলেন– 'আমার নির্দেশনা পদ্ধতি অনেকটা তৈলচিত্র আঁকার মতোই। প্রথমে আমি একটি বিশাল ক্যানভাসে সহজ সরল স্কেচ আঁকি, তারপর ধীরেসুস্থে আমি ডিটেইল-এর দিকে এগোই। প্রতিদিনই স্টেজ ব্লকিং বদলাতে থাকি যতোক্ষণ পর্যন্ত না সঠিক অবস্থানটি খুঁজে পাই। পিটার ব্রুক আরও মনে করেন যে, একজন সু-নির্দেশকের বেশকিছু বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান হলো কল্পনা শক্তি, ধৈর্য এবং আপাত সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন থেকে কাজ করার ক্ষমতা।'[১৮]

স্যার জন গিলগুড মনে করেন যে :

> নির্দেশক অত্যন্ত বিতর্কিত একটি শব্দ। তাঁর মতে থিয়েটারের ইতিহাসে কুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রী নিজগুণেই বিখ্যাত হয়েছেন। কেউ কোনোদিন জানবে না যে, সেইসব নামী ও দামী অভিনেতা-অভিনেত্রী মহড়ার সময় কোনো-কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত সহকর্মীর পরামর্শে, উপদেশে বা

---

১৩. আতাউর রহমান সম্পাদিত, *নাটক করতে হলে* (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১১৩।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
১৮. আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩৬।

> সমালোচনায় ক্ষতিগ্রস্ত বা উপকৃত হয়েছিলেন। আসলে নির্দেশক শব্দটিই তো নতুন যা আগের দিনের করিৎকর্মা ষ্টেজ-ম্যানেজারের পদটি দখল করে বসে আছে। একজন বিশ্বনন্দিত নাট্য-নির্দেশক হয়েও স্যার জন গিলগুড বিশ্বাস করতেন যে, মঞ্চে পর্দা উঠে যাবার পর সামগ্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর, যদিও মহড়া চলাকালীন অবস্থায় নির্দেশকই হলেন নাটকের সর্বময় অধিকর্তা। নাটকের চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। গিলগুডের আর একটি অনুপম ধারণা হলো যে, সহজাত প্রবৃত্তিই হলো সু-অভিনয়ের সবচাইতে বড় গুণ এবং বৈদগ্ধ আরোপিত অভিনয়ের প্রচেষ্টা ভুল। তাঁর অভিজ্ঞতায় অনেক সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তিনি অভিনয় সম্পর্কে অনেক চুলচেরা ও স্বচ্ছ সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে শুনেছেন, আবার অনেক প্রতিভাধর অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অভিনয় সম্পর্কে অত্যন্ত অর্থহীন ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে দেখেছেন।[১৯]

নাট্য-নির্দেশক সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তির মধ্যে থেকে বলা যায় যে, নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে নির্দেশকের প্রধান কর্তব্য হলো নাটকের বিশদ 'ব্যাখ্যা' প্রদান এবং সেটা তখনই সম্ভব হয় যখন পাণ্ডুলিপি নির্দেশকের 'বুদ্ধি' ও 'বোধের' সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকে অর্থাৎ নাট্যকারের সৃষ্ট নাটকের ভেতরে তিনি 'মানসিকভাবে' অবস্থান করেন। তারপর নির্দেশক প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের 'হৃদয়' ও 'মেরুদণ্ড' খুঁজে বেড়ান যা দিয়ে তৈরি হবে অভিনেয় নাটকের শরীর। টায়রন গাথরির কার্যপদ্ধতি ছিল অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'স্বতঃস্ফূর্ত' অনুভূতি ও 'কৌশলের' মিশ্রণ ঘটাতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন এবং এই কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি বা 'ইনটুইশান'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে– সৃজনশীল চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অবচেতন মনের প্রকোষ্ঠ থেকে, যুক্তিতর্ক বা বুদ্ধি দিয়ে নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর-সুন্দর ধ্যান-ধারণাগুলো সোনালী ঈগলের ডানায় ভর করে হঠাৎ করে উর্ধলোক থেকে এসে পৌঁছে, তার জন্যে প্রাণপাত করতে হয় না। তাই তাঁর মতে সবচেয়ে উত্তম পথ হলো, 'দেহ-মন'কে শিথিল করে দিয়ে আয়াশ করা এবং নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যে স্বর্গীয় দেবদূত নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার ডালি সাজিয়ে যে কোন সময় এসে পৌঁছবে। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, নির্দেশকই হলেন নাটকের পরিশেষ ব্যাখ্যাদাতা।

এতোক্ষণ নাট্য-নির্দেশকদের সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হলো তা ফরাসী অভিনেতা-নির্দেশক লুই জুভেরের একটি বক্তব্যে হয়ত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে তবুও বক্তব্যটি উদ্ধৃতি দিতে হয় কারণ বক্তব্যটি মঞ্চ নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্দেশকদের অনেকেই এই বক্তব্যের সাথে অভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। লুই জুভের বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন :

---

[১৯]. আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩৬।

একটি মহড়া কক্ষ, একজন লোক চোখ, কান এবং সমস্ত স্নায়ুকে সজাগ রেখে, উত্তেজনায় কঠিন হয়ে একাগ্রচিত্তে মহড়া দেখছেন। কখনও তিনি পরিতৃপ্তিতে হাসছেন, কখনও ভুরু কুঁচকাচ্ছেন, কখনও উত্তেজনায় পায়চারি করছেন, আবার কখনও বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে ভুল উচ্চারণের সংলাপ শুনছেন এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অভিনয় দর্শন করছেন। বুঝতেই পারছেন এ লোকটি কে? ইনিই নাটকের নির্দেশক। এ লোকটিকে বলা যেতে পারে চেতনার উদ্যানপাল, ছিন্ন গ্রন্থির ধাত্রী, পরিবেশের মুচি, কথার রাঁধুনী, আত্মার গোমস্তা, থিয়েটারের সম্রাট এবং মঞ্চের ভৃত্য, ভেলকিবাজ ও যাদুকর, ধাতুপরীক্ষক এবং জনতার কষ্টিপাথর, কূটনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, পরিসেবিকা, বাদ্যকরদলের অধিনায়ক, ব্যাখ্যাদাতা, চিত্রশিল্পী এবং পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারক এমনি শত-শত সংজ্ঞায় তাঁকে ভূষিত করা যায় কিন্তু সবগুলোই অর্থহীন, নির্দেশকের কোনো সংজ্ঞা থাকতে পারে না, কারণ তাঁর কর্তব্য ও বৃত্তি সংজ্ঞাতীত এটাই হলো মোদ্দা কথা।[২০]

সুতরাং উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, নির্দেশক নাটক প্রযোজনার 'সৃজনশীল' ব্যক্তি। মঞ্চশিল্পের প্রত্যেকটি বিষয় প্রধানত তাঁরই ওপর নির্ভর করে। প্রযোজনার প্রধান দায়দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। অন্য শিল্পীর চেয়ে নির্দেশকের মতামতকেই সবচেয়ে বেশি 'গুরুত্ব' দেওয়া হয়। প্রযোজনার বিষয়ে যে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। যেহেতু নাটক মানব সমাজ ও বিশ্ব প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে এবং নাট্য-প্রযোজনায় নৃত্য, সংগীত, চিত্রকলা, মঞ্চ-কৌশল ও অভিনয় ইত্যাদির প্রয়োজন, তাই নির্দেশককে হতে হয় 'বহুমুখী জ্ঞান' ও 'বিদ্যার' অধিকারী। পক্ষান্তরে যদি নির্দেশকের কাছে নাটকের সব আঙ্গিকের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উচ্চ শিল্পমান দাবি করি তবে সেটাও হয় বাড়াবাড়ি। নাটক রচনা, অঙ্কন, সুর ও বাদ্যযন্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা নাও থাকতে পারে, এমন কি অভিনয় ভালো নাও করতে পারেন।

এই যদি হয়, তাহলে মঞ্চ নির্দেশনার কাজ সহজ না কঠিন? উত্তরে বলা যেতে পারে, নির্দেশনাকে যদি ক্র্যাফ্‌ট (কারিগরি বিষয়) হিসেবে ধরা হয় তাহলে সহজ, আর আর্ট (শিল্প) হিসেবে ধরা হয় তাহলে কঠিন। কারিগরি কাজেও অবশ্য কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়, যেমন– 'সৃজনশীলতার বদলে প্রচুর পরিশ্রম ও উদ্যোগ, কিছু আত্মবিশ্বাস এবং কল্পনা শক্তির জায়গায় ভালো স্মৃতিশক্তি। এইভাবে নতুনদের কাছে বিশেষজ্ঞরূপে কিছুকাল তিনি খ্যাতিও পেতে পারেন। কিন্তু কখনই তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ তিনি চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর কিছুই

[২০]. আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩৭।

জানেন না। যিনি যথার্থ নির্দেশক, নাটকে আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে তিনি নতুন কিছু অবদান সৃষ্টিতে অনুসন্ধানব্রতী হতে পারেন।'[২১]

জীবন গতিশীল, কখনই থেমে থাকে না, নাটক যেহেতু জীবনের কথা বলে তাই নাট্য-নির্দেশনার রীতিনীতি প্রক্রিয়াও পরিবর্তনশীল। আজ যেভাবে নাটক নির্দেশনা হচ্ছে দু'বছর পরে সেই একইভাবে হবে এমন কোন কথা নেই। এমন কি প্রথাগত রীতি-নীতিকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন কিছুও চিন্তা করা সম্ভব। এই চিন্তা পুরোনো মতকে অস্বীকার করা নয়। প্রতি বছর নতুন প্রযোজনা মঞ্চায়নের সাথে সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্দেশক মৌলিক ধ্যান-ধারণাকে ক্রমশ উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন। এইভাবে নির্দেশনা-শিল্পের জটিল ও অভিনব প্রক্রিয়ার দিকে নির্দেশক এগিয়ে যেতে পারেন, সমসাময়িক নাট্য-প্রযোজনার আদর্শরূপটি, মানুষের সুন্দর আবেগকে উদ্বুদ্ধ করার সার্থকতম উপায় খুঁজে ফেরেন, চেষ্টা করতে পারেন মানবতার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে (ন্যায়, মহত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি) প্রতিষ্ঠা করতে। 'যে কোন অনুসন্ধানী এবং আবিস্কারকের মতোই তাই একজন নির্দেশক নতুনতর সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল, সেই কারণে তাঁর নতুন সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই।'[২২]

নির্দেশকের প্রাথমিক কাজ হতে পারে প্রতিনিয়ত জীবনকে অনুশীলন করা। তাঁকে অনেক কিছু জানতে হয়। শুধু ঘটনাকে দেখতে শেখা নয় ঘটনা সমূহের পারস্পরিক তুলনামূলক বিচার করার যোগ্যতা অর্জন করে মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত মূল উৎসকে আবিষ্কার করতে হয়। আমাদের আশেপাশে যে মানুষ আছে তাদের অন্তর্জগতের গভীরে প্রবেশ করতে হয়, নতুনের সবুজ অঙ্কুরোদমগমকে লক্ষ্য করতে হয়, নতুন ও পুরাতনের যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে তার জটিল নিয়মকে এবং বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির জীবন ও ভাগ্যের যোগসূত্রটি অনুধাবন করতে হয়। এইখানে নাটক ও নাট্যকারের সঙ্গে নির্দেশকের সম্পর্ক বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ নাটককে ঘিরেই তাঁর সৃষ্টির উদ্যম। নাট্যকার ও নির্দেশকের মৌল আদর্শ যদি পৃথক হয়, জীবন ও শিল্প সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি হয় স্বতন্ত্র তাহলে সেই নাট্য-প্রযোজনা নিষ্ফল হতে বাধ্য। গৌণ বিষয়ে নির্দেশক নাট্যকারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু মৌল বিষয়ে উভয়ের মত-পার্থক্য থাকলে কিছুতেই চলে না। অবশ্য নাট্যকারের প্রতি নির্দেশকের বিশ্বস্ততার অর্থ এই নয় যে, নির্দেশকের কোন অধিকার নেই। নির্দেশকের কর্তব্য হলো নাট্যকারের বক্তব্য ঠিকমতো প্রকাশ করা। নাটক সম্পর্কে যদি নির্দেশকের পূর্ণ ধারণা থাকে এবং নাট্যকার যদি অহঙ্কার মুক্ত হন তবে নাটকের অতিরিক্ত বিষয়গুলি সম্পাদিত করে নির্দেশক সার্থকভাবে মঞ্চে প্রযোজনা উপস্থিত করতে পারেন। নাটক একাধিক শিল্পের সমন্বয়, তাই

[২১]. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৫০।
[২২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

প্রযোজনার বহুবিধ উপাদানকে যথাযথভাবে সমন্বিত করতে না পারলে নাটক হয় না। তবে একাজ প্রধানত নির্দেশকের। এই কারণেই অন্য ভাষায় নির্দেশককে বলা যায়– 'মালাকার।'[২৩] সার্থক থিয়েটার তাকেই বলা যায় যেখানে নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী এই তিন স্তরের সুষম সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং নির্দেশক হলেন এই মিলনকাণ্ডের পথ-প্রদর্শক, সংগঠক এবং দিক-নির্দেশক।

নাটক প্রযোজনায় অনেক সাংগঠনিক ও বৈষয়িক কাজ থাকে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে সৃজনশীল কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিলে, যে জন্য এতো আয়োজন ও পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ নাটক দর্শকদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় তাৎক্ষণিক সমস্যা নিয়ে আমরা এতো মাথা ঘামাই যে শিল্পের সৃজনশীল প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা উদাসীন হয়ে পড়ি। আমাদের নাট্য-প্রযোজনা অধিকাংশ সময়েই এতো দুর্বল হয় তার প্রধান কারণ নাটক করাকে আমরা অতি সহজ ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছি। নাটক রচনা, নির্দেশনা, অভিনয় ইত্যাদির জন্য কিছু জানতে হয়, শিখতে হয়, ভাবতে হয়, সৃজনশীল চর্চা করতে হয় এ ব্যাপারটা আমরা বেশির ভাগ মনে করি না। এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে নাটকের সমূহ বিপদ।

দর্শকের নিকট নির্দেশককে হতে হয় আন্তরিকভাবে 'বিপ্লবী'। তার সমস্ত সত্তাকে বিপ্লবী শিল্প সত্তায় পর্যবসিত করতে হয়। 'একজন আদর্শ রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মী যেমন সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য সামনে রেখে তার সমস্ত সত্তাকে সেই কাজে নিয়োজিত করেন, নিজেকে প্রতি মুহূর্তে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলেন, তেমনি একজন বিপ্লবী শিল্পীকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর নিজস্ব শিল্পকর্মে আত্মোৎসর্গ করতে হয়।'[২৪] না হলে তাঁর সৃষ্টি কখনই মানুষকে উদ্দীপিত করতে পারে না। দর্শকদের উদ্দীপিত করার কাজটি করতে হলে নির্দেশককে শিল্পী হিসেবে তার নিজস্ব মানবিক অনুভূতির সঙ্গে লেখকের অনুভূতির মিলন সাধিত করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। এ জন্য চাই মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মানব হৃদয়ের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান।

নাট্য-প্রযোজনার সার্থকতা নির্ভর করে, অভিনেতা-অভিনেত্রী কতোটা নিপুণভাবে নির্দেশকের এই জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে পারছে তারই ওপর। কাজটি জটিল ও দুরূহ তাই অনায়াসে এটা হয়ে যাবে একথা ভাবার মতো বোকামী আর নেই। বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে নিজের দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন ও আবেগময় তন্ময়তা ছাড়া নির্দেশক সার্থকতার এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন না। জীবনে ও শিল্পে এমন কিছু জিনিষ আছে যা আমাদের উদ্দীপ্ত করে, চিত্তে এমন এক প্রজ্বলিত বাসনা জাগায় যা আমাদের লক্ষ্য পূরণে প্রচণ্ড সহায়ক হয়।

[২৩] আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৩৯।

[২৪] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৫১।

এই সুতীব্র বাসনাকেই বলা যায় আবেগময় তন্ময়তা। প্রত্যেক নির্দেশকেরই এই গুণটা থাকা দরকার। প্রযোজনা ব্যর্থ বা সফল যাই হোক, তার মধ্যে থেকে একধাপ এগিয়ে যাবার শিক্ষা নিজের মধ্যে গড়ে তোলা উচিত। অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নয়, শিল্পের দায়িত্ব জানা এবং তার সংশোধন করার মধ্য দিয়ে একাজ করা সম্ভব। এজন্য চাই প্রচণ্ড 'মনোযোগ'। নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা বুঝে সত্যকে জানতে পারার মতো কঠিন কাজ আর নেই।

প্রগাঢ় 'সম্পৃক্তি' এবং প্রেরণার সঙ্গে চাই 'স্থিরবুদ্ধি'। এই দুই এর সমন্বয় নির্দেশকের মধ্যে যতোটা প্রয়োজন অন্য কারো ক্ষেত্রে বোধ হয় ততোটা নাও প্রয়োজন হতে পারে। 'তিরিশ ঊর্দ্ধের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না হলে নাট্য-নির্দেশক হওয়া যায় না, কথাটা ঠিক নাও হতে পারে। কুড়ি পেরোলেই যে কেউ নির্দেশক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, যদি তার আবেগ থাকে, প্রেরণা ও বুদ্ধি থাকে চর্চা, চেষ্টা আর লক্ষ্য থাকে। এ সব না থাকলে তিরিশ ঊর্ধ্বেও কিছু হয় না। কল্পনাশক্তি ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না, নির্দেশক তো দূরের কথা। আবার কল্পনাশক্তি থাকলেও হয় না, বাস্তবে প্রয়োগ করতে জানতে হয়।'[২৫] দৃশ্য কল্পনা নির্দেশকের একটি আবশ্যকীয় গুণ হতে পারে। যে কোন নাটকই হোক মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হলেও কল্পনায় দৃশ্যরূপটি বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

নির্দেশকের চাই বাধা অতিক্রমের সাহস ও মুক্তমন, সামাজিক ও শৈল্পিক দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা। সর্বোপরি চাই সংযম। লেখককে অস্বীকার করে নিজের কল্পনাকে লাগাম ছাড়া করা নির্দেশকের একটা অপরাধ। লেখক যা বলতে চেয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাধ্যমে সততার সঙ্গে প্রকাশ করার কঠিন দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই নির্দেশকের কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে।

দর্শক নির্দেশকের কেরামতি দেখতে মঞ্চে আসেন না। তাঁরা আসেন নাট্যকারের সৃষ্টিকে যথার্থভাবে উপভোগ করতে। সেই জন্যই বলা যেতে পারে নাট্যকারকে ঠিকমত বুঝে নাটককে সমসাময়িক কালের মতো করে উপস্থাপিত করার মধ্যেই হলো নির্দেশকের কাজের সার্থকতা। আবার নাট্যকারের কাছেই তাঁর দায় নয়, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং দলের প্রত্যেকের কাছেই তাঁকে এই সংযমের পরিচয় দিতে হয়। 'অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ গোটা দল নাটক সম্পর্কে তাঁর সৃজনশীল মৌলিক ব্যাখ্যার সঙ্গে কতোটা ঐকমত্য ও একাত্ম হতে পারছে সেটাও লক্ষ্য রাখতে হয় নির্দেশককে। এঁরাই তো তাঁর মনের ভাষাকে মঞ্চের ভাষায় প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেন। যাঁরা বলেন অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্দেশকের হাতের পুতুল মাত্র, তাঁরা থিয়েটারের প্রাণ বস্তুকেই অস্বীকার করেন।'[২৬] মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত কেউ কারো দাস বা অধিনস্ত নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের

---

[২৫] আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৪০-৪১।

[২৬] ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৫৩।

বন্ধু। নির্দেশকের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নির্দেশক তাঁর স্বাধীন মতামতকে ক্ষুণ্ন করতে পারেন না, কিন্তু অন্যের স্বাধীন চিন্তাকেও ছোট করে দেখতে পারেন না। মতবিনিময়, আলোচনা এমনকি বিতর্কও হতে পারে, কিন্তু সব কিছুই হয় বন্ধুত্বের সম্পর্কে, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে নয়।

নাটক প্রযোজনার মূল লক্ষ্য দর্শক তথা জনগণ। জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের নাটক। নাটকের উৎস জনগণ, তাই সেই উৎসের সঙ্গে নির্দেশকের সম্পর্ক হবে নিবিড়, তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রাম সব কিছুর সঙ্গে নির্দেশকের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। জনগণ থেকে রসদ উপকরণ সংগ্রহ করে জনগণের সাহায্যেই তাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণই দর্শক হয়ে তাঁকে নাটক প্রদর্শনীর সুযোগ করে দেয়। তাঁর মঞ্চোপকরণ তারাই সরবরাহ করে। তাদের সাহায্য, ভালোবাসা, প্রশংসা এমনকি সমালোচনা– সবকিছুই নাটককে নাটকের মর্যাদা দেয়, নাটকের বিকাশ ঘটায়। সুতরাং যাদের অকৃপণ দানে ও সহযোগিতায় নাটক গড়ে ওঠে সেই কারণে বলা যায়– 'জনগণের শিল্পবোধ বা রস চেতনাকে ভিত্তি করে, তাকে জাগ্রত ও উন্নত করার স্বার্থেই গড়ে উঠবে আমাদের শিল্প আঙ্গিক। শিল্পমান হবে জনগণের কাছে গ্রহণীয়, শিক্ষনীয়, এবং জনগণের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।'[২৭]

বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক নির্দেশনার ইতিহাস দীর্ঘকালের নয়। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় থিয়েটার কর্মীদের মধ্যে স্বদেশ ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নিজের দেশের থিয়েটার চর্চাকে একটি বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। আপাত অর্থে বাংলাদেশে নাট্য-নির্দেশকের অভাব নেই। একটি নাটককে মঞ্চে তুলে ধরাটা যখন নাটকেরই অনুবৃত্তি থেকে যায়, নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে না তখন তাকে আমরা প্রকৃত নাট্য-নির্দেশনা শৈলী বলি না। কিংবা বলা যায় তা প্রকৃত অর্থে মঞ্চের শিল্পরূপ হয়ে ওঠে না। সর্বোপরি বাংলাদেশে মঞ্চ নাটকের নান্দনিক উপস্থাপন করার মতো নির্দেশকের সংখ্যা হাতে গোনা। এঁদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য চার জন নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব কর্ম-কৌশল, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানই বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই অধ্যায়ে যে চারজন পরিচালকের নির্দেশনা 'পদ্ধতি' ও 'কৌশল' নিয়ে আলোচনা করা হবে। তাঁরা হলেন– আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম এবং ইসরাফিল শাহীন। যদিও নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতকে স্পট করার জন্য নির্দেশক সম্পর্কে বৈচিত্রময় অভিমত ও সৃজনশীল নির্দেশক সম্পর্কে সাম্যক আলেচনা করা হয়েছে।

[২৭] আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (সম্পাদক : আজিজুন্নাহার ইসলাম), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১৪১-৪২।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আতাউর রহমান

আতাউর রহমান বাংলাদেশের নাট্যভুবনের এক উজ্জ্বল নাম– 'যাঁর সামনে থিয়েটার-দর্শকদের অভিভূত বিস্ময়ে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকে না।'[২৮] নাট্য-অনুবাদক, কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্য-শিক্ষক, সাংস্কৃতিক সংগঠক প্রভৃতি বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী আতাউর রহমান সফল নাট্য-নির্দেশক হিসেবে বাংলাদেশের নাট্যঙ্গনে সুপরিচিত ও সমাদৃত একজন ব্যক্তি। অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যশিক্ষক আতাউর রহমানের জন্ম ১৮ জুন, ১৯৪১ সালে, নোয়াখালী জেলায় বেগমগঞ্জ থানার আমিরাবাদ গ্রামে। নাট্য-জগতে তাঁর আবির্ভাব হয় ১৯৬৩ সালে, পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে একজন নাট্য-নির্দেশক হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। আতাউর রহমানের নাট্য-প্রতিভা ব্যাখ্যা-সূত্রে নাট্য-ব্যক্তিত্ব নাসিরউদ্দীন ইউসুফের মন্তব্য স্মরণীয় :

> আমাদের মঞ্চক্ষেত্র ভরে গেছে তাঁর [আতাউর রহমান] সৃষ্ট শিল্পবৃক্ষে। *গডোর প্রতীক্ষা*, *গ্যালিলিও*, *হিম্মতী মা*, *ঈর্ষা*, *রক্তকরবী*, *অপেক্ষমাণ*– এমনতরো অসামান্য নাট্যপ্রযোজনায় বাংলা নাটক এক মার্গীয় সংগীতের উচ্চতা পেল। ১৯৬৮-এ নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মতো একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের জন্ম তাঁর হাতে। সঙ্গে ছিলেন আর এক নাট্যঋষি জিয়া হায়দার এবং অনেকে, যার কাণ্ডারি তিনি– আজ প্রায় চার যুগ। দুঃসময়ে অকুতোভয় নাবিক আতাউর শিল্পের শাশ্বত লক্ষ্যে দল পরিচালনা করেছেন, পায়ে দলেছেন সকল ভীতি ও দ্বিধা। এইভাবে একটি নাট্যদলকে তিনি বাংলা সংস্কৃতিচর্চায় অনিবার্য উপাদান করে ফেলেন। তাই তো বলি তুমি এসেছে বলেই আমাদের মঞ্চ আমাদের নাটক তোমারই সৃষ্টিশীলতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে, নতুন প্রাণ পেয়েছে। তুমি বাংলা নাট্যের মঞ্চসারথি। সবশেষে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, ভেঙেছো দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়।[২৯]

গ্রামবাংলার মানুষ যাত্রা দেখে যেমন আলোড়িত হয়েছেন, আতাউর রহমানও যাত্রা দেখে তেমনি তাড়িত হয়েছেন, বিমোহিত হয়েছেন। তিনি মনে করেন থিয়েটার তার রক্তের মধ্যেই ছিল। ছোটবেলায় যখন তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন, তখন নিয়মিত যাত্রা দেখতেন। সেকালে পালা দেখা শুরু হতো রাত দশটায়। নাট্যাভিনয়ের মাঝে মধ্যরঙ্গ হিসেবে ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচতো-গাইতো। পরিবেশনা শেষ হতো সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বে। গ্রামে তিনি যে সকল নাটক দেখতেন সেগুলো ছিল প্রায় যাত্রার মতোই। বলা যায় তখন থেকেই তাঁর নাটক বিষয়টার প্রতি একটা ভালোলাগা তৈরি হয়। থিয়েটার বা নাটক যে রীতির বা বৈশিষ্ট্যেরই হোক না কেন, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়; তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর গঠন প্রক্রিয়া– এটা একটা মিলন, এক সাথে সবাই মিলে

---

২৮. নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, *উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), পৃ. ২৬০।

২৯. নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময় তোমারই জয়, *আতাউর রহমান ৭০তম জন্মদিবস উদযাপন পরিষদ*, ১৮জুন, ২০১১।

একটা পরিবেশনা তৈরি করা, সবার সঙ্গে হৈ-চৈ করা এটাই। তাঁর মতে– 'This is a very unique arts, co-operative art। যেটা অন্য কোন শিল্পমাধ্যমে ঠিক এভাবে হওয়া সম্ভব নয়।'[৩০] গানের প্রতিও একটা বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা তাঁর ছিল কিন্তু গান গাইতে পারেন নি, কারণ তাঁর গলায় তেমন একটা সুর ছিল না। আতাউর রহমানের বাবাও অভিনয় করতেন, তিনি অফিস পাড়ার নাটক করতেন। নাটক হতো অফিস পাড়াতে; অফিস পাড়ার নাটক মানেই তা অফিস ক্লাব দ্বারা পরিচালিত। তিনি বিভিন্ন সংগঠন/ক্লাব-এর বার্ষিক নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। আতাউর রহমানের বাবা শৈশব থেকেই পাড়ার ছেলে-পেলে নিয়ে চকি-টকি ফেলে অভিনয় করতেন যা তাঁর সাথে আলাপচারিতা থেকে জানা যায়। এছাড়াও সেকালে স্কুল, কলেজ পর্যায়ে বার্ষিক নাটক হতো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নাট্য-সংগঠন নাটক করতো। বস্তুত এই ছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া আতাউর রহমানের নাট্য-পরম্পরা। আরেকটি উৎস ছিল, যারা মূলত বামধারার রাজনীতির সংঙ্গে যুক্ত ছিল, এদের সংস্কৃতি চর্চার বেশ একটা শক্ত অবস্থান ছিল এদেশে। সেখানে তাঁরা বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* বা এ ধরনের নাটক করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমনকি উন্মুক্ত স্থানেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী* মঞ্চস্থ হয়েছে তখন। এ ধরনের প্রয়াস সময়ের সাথে-সাথে হয়েছে, তখন গণ-নাট্যসংঘের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হতো। আতাউর রহমান বাবাকে দেখেছেন অফিস পাড়ার নাটকে নির্দেশনা দিতে, *সিরাজ-উদ-দৌলাতে* ওয়াটসন চরিত্রে অভিনয় করতে। 'ঢাকাতে এসে বাবা বেশকিছু নাটকের নির্দেশনা দেন। তাতে করে ওনার কাজের সাথে যাঁরা ছিলেন, নাটক করতেন ওদের সাথেও জানাশুনা তৈরি হয়। এভাবেই একটা প্রবণতা তৈরি হলো যে নাটক করতে হবে।'[৩১] এই সকল অভিজ্ঞতাই আতাউর রহমানকে থিয়েটারে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে।

প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আতাউর রহমান অভিনয়ে খুব একটা সুযোগ পেলেন না। তখন ডাকসুতে বেশ প্রতিযোগিতা হতো। বুলবুল আহমেদ, সৈয়দ আহসান আলী সিডনী এঁরা তখন খুব নামকরা শিল্পী। কাজেই ওখানে সুযোগ পাননি। তখন আবদুল্লাহ আল মামুন ঢাকা হলের ছাত্র, আজকের যেটা শহীদুল্লাহ হল হিসেবে পরিচিত। তিনি সেখানে থাকতেন, আবাসিক ছাত্র হিসেবে। আতাউর রহমানও ঐ হলের অনাবাসিক ছাত্র ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যদিও দুজন দুই বিভাগের ছাত্র ছিলেন। প্রথমে আবদুল্লাহ আল মামুন হল ছাত্র ইউনিয়নের সংস্কৃতি-বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন, তার পরের বছর আতাউর রহমান সংস্কৃতি-বিষয়ক সম্পাদক হন। তখনথেকেই আতাউর রহমান প্রথম কোনো ছোট-ছোট নাট্য-চরিত্রে অভিনয় করা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি আবদুল্লাহ আল মামুনের কোনো কানো নাটকের প্রধান চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। এই হলো তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নাট্যচর্চা। তারপর আসকার ইবনে শাইখ-এর নাট্য-

[৩০] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২০-০৭-২০১৫।
[৩১] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২০-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)

কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। শাইখের নাট্যদলের সাথে যুক্ত থেকে তিনি সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদটি পরবর্তী সময়ে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ থেকে 'ড্রামা সার্কেলে'র মঞ্চনাটক, পথনাটকসহ বেশ কিছু কাজের সঙ্গে আতাউর রহমান জড়িত ছিলেন। সে-সময়ে মুনীর চৌধুরীকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যচর্চার একটি অঙ্গন ছিল। আরেকটি অঙ্গন ছিল নাট্যকার-নির্দেশক আসকার ইবনে শাইখকে কেন্দ্র করে যেখানে আতাউর রহমান যুক্ত ছিলেন। এর বেশ কিছু সময় পরে নাট্য-ব্যক্তিত্ব জিয়া হায়দারের সঙ্গে প্রেসক্লাবে দেখা আতাউর রহমানের এবং কথা প্রসঙ্গে জিয়া হায়দার তাকে একটা নাটকের দল করার প্রস্তাব দিলেন। পরবর্তী সময়ে জিয়া হায়দারের উৎসাহে এবং আতাউর রহমানের চেষ্টায় একটা নাটকের দল গঠন করে দুজনে মিলে নাট্যচর্চা শুরু করেন। এই দল গঠনের মধ্য দিয়েই কার্যত আতাউর রহমানের সাংগঠনিক পর্যায়ের নার্টচর্চার শুরু। নাট্য দলের নামকরণ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন, 'বোধ হয় জিয়া হায়দার-ই 'নাগরিক' নামটা রেখেছিলেন।'[৩২] মূলত ষাটের দশক থেকে নাট্য-সংগঠনের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ত হওয়া এবং নাট্যচর্চার বিভিন্ন পথ-পরিক্রমার ধারাবাহিকতায়ই নির্দেশক আতাউর রহমান আজকের এই জায়গায় এসে উপনীত হয়েছেন।

নাটক একটি মিশ্র শিল্প। কার্যত নাট্য রচনা, অভিনয়, মঞ্চ ও আলোক প্রভৃতি শিল্পকলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি নাট্য-উপস্থাপনা। আর এই কারণে নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুরকার, গীতিকার, মঞ্চ-পরিকল্পক, আলোক শিল্পী প্রমুখের প্রয়োজন হয় একটি দল বা সংগঠনে। প্রথাগতভাবে এই সকল সংগঠনের নাট্য-নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দান করেন 'নাট্য-নির্দেশক'; তাই নির্দেশকই সাধারণত উপস্থাপনার জন্য 'নাটক নির্বাচন' করেন। কিন্তু যে সকল সংগঠন নাট্য-নির্মাণ প্রক্রিয়াকে একটি যৌথকর্ম বা যৌথ নির্দেশনার বিষয় বলে মনে করে তাদের নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংগঠনের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নাটক নির্বাচনের বিষয়টি কোনো একক ব্যক্তির কর্ম প্রক্রিয়া হিসেবে না দেখে যৌথ ভাবনা হিসেবেই দেখা হয়। আতাউর রহমান নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের সদস্য, তাই তিনি মনে করেন– 'ভালো নাটক দেশ, কাল এবং ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে, তাঁরা ভালো নাটক ভালোভাবে করতে চায়। রূপান্তর ও অনুবাদসহ নানা দেশ-ভাষায় নাটক করেছে নাগরিক।'[৩৩]

আতাউর রহমান মনে করেন, পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়ার পরই নির্দেশককে সেটি পাঠ করা প্রয়োজন, যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আসে। চরিত্র বাছাইয়ের পূর্বে নানভাবে পাণ্ডুলিপির বিষয় ও প্রেক্ষাপট মনে ও মননে এঁকে নিতে হয়। কৌশল হিসেবে কখনো নারী চরিত্র পুরুষ অভিনেতা অথবা পুরুষ চরিত্র নারী

---

[৩২] মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ* ১৯৭২-২০০৪ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১৭৩।

[৩৩] ইসরাফিল শাহীন সম্পাদিত, *পরিবেশনা শিল্পকলা* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ২৯০-৯১।

অভিনেত্রী দ্বারা পাঠ করিয়ে থাকেন। এতে নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি হয় এবং ক্রমান্বয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও তাৎপর্য নির্ণয় করা সহজ হয়। এ প্রক্রিয়া অনুসরণে চরিত্রের পারিপার্শ্বিকতা ক্রমশই সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়। এ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নাট্য-নির্দেশনার বিষয়গুলো একটা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। পাণ্ডুলিপিটি পাঠের এই প্রক্রিয়াটি অন্তত দুই থেকে তিন সপ্তাহ ধরে চর্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন– 'পাণ্ডুলিপিটি এক ধরনের নিজের মতো একুম্যুলেশন করে নেয়া। প্রত্যেকটি নাটকে নাট্যকারের একটা ইনটেন্ড থাকে। কিন্তু নির্দেশক হলেন এমন ব্যক্তি যাকে ভাবতে হবে এর সুপার অবজেক্টিভ কী? আমি কি নাট্যকারের সমান্তরালে চলব নাকি নিজের মতো করে চলব। পারফরমিং আর্টের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। না হলে সত্যজিৎ রায় *চারুলতা*-য় 'নষ্টনীড়' থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার সাহস দেখাতেন না। তেমনি আমি শেকসপীয়রের *ম্যাকবেথ*সহ অন্যান্য নাটক করতে গিয়ে নির্দেশক হিসেবে অনেক কিছু সম্পাদনা করেছি। ব্রেখটের *মাদার কারেজ* করার সময় একটা দোদুল্যমানতা ছিল আমার। নাটকে জননী, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরি করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু নির্দেশক হিসেবে আমার চোখটা গিয়ে পড়লো তার বোবা মেয়েটার প্রতি। এটা ব্রেখটের ইনটেন্ড ছিল কিনা আমি জানি না।'[৩৪] তিনি মনে করেন এভাবেই পাণ্ডুলিপি বার-বার পাঠ করে বিষয়ের অন্তর্গত একটি পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করে নাট্যিক ক্রিয়াসূত্রে উপস্থাপন করা নির্দেশকের কাজ। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন নাটকের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে নির্দেশকের কাজের উপর। নাটক নির্বাচনের পর মহড়া প্রক্রিয়ায় পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি ও ব্যাখ্যা সর্ম্পকে আতাউর রহমান বলেন :

> নাট্য-নির্দেশনাকে আমি জীবনের একেবারে ছাপচিত্র করতে চাই না। নাটকে যদি প্রতীক না থাকে, বিমূর্ততা না থাকে, অ্যাবস্যুলিটি না থাকে– সেই নাটক আমাকে টানে না। আমার নির্দেশিত নাটকের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, যেমন– স্যামুয়েল বেকেটের *গডোর প্রতীক্ষা*, ব্রেখটের *গ্যালিলিও* এবং সৈয়দ শামসুল হকের *বাংলার মাটি বাংলার জল*। এই নাটকের বিষয়গুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার মনে হয়– হোয়াট ইজ বিউটি? আবার ব্রেখটের কথায় একজন মানুষ যখন কাজ সুন্দর করে সম্পাদন করে তখনই সুন্দরের সৃষ্টি। নাট্যকারকে আমি ছোট করি না। তবে যেহেতু এটা পারফরমিং আর্ট সেহেতু নির্দেশককে কেন্দ্র করে গ্রুপ, তাই তাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। হাজার-হাজার বছর পরও নাট্যকারের কথা মানুষ মনে রাখে কিন্তু যুগে-যুগে করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় হারিয়ে যায়। তবু কেন আমরা নাটক করি? করি, যে মুহূর্ত তৈরি হয় তার জন্য। ডিজিটাল ফর্মেটে অনেক কিছু ঠিক করা যায় কিন্তু মঞ্চ-নাটকে ঠিক করা যায় না। আমি আমাদের দেশের

[৩৪] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধান কালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২০-০৭-২০১৫।

নাট্যকারের নাটক মঞ্চায়ন করলে তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহলে তাঁর সাথে প্রচুর আড্ডা দেই। তাকে বোঝার চেষ্টা করি। তাঁর অন্যান্য রচনা পড়ে নাট্যকার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করি এবং নির্বাচিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে কখনো কখনো তাঁর সাথে বাকবিতণ্ডা করি, নির্বাচিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করি। সেটা আমার কাজের একটা বৈশিষ্ট্য। আর নাট্যকার যদি মৃত অথবা বিদেশের অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকেন তখন আমাকে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হয়। উইলিয়াম শেকসপীয়রকে হয়তো জানি কিন্তু দারিও-ফো করতে হলে তাঁর সম্পর্কে আমাকে জানতে হয়। আজকাল তো ইন্টারনেটের কারণে অনেক তথ্য সহজ হয়ে গেছে। একজন চাইনিজ নাট্যকার হলেও আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ব না। আমি তার জীবনদর্শন, জীবনবোধ ইত্যাদি জানব। তার সাথে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এগ্রি করি কী না করি সেটা পরের ব্যাপার।[৩৫]

এই উক্তির মধ্যদিয়ে 'নির্দেশনা প্রক্রিয়া' বিষয়ে নির্দেশকের ব্যক্তিগত ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। আতাউর রহমান একটি পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ঘটনা ও চরিত্রকে "ছাপচিত্র" বা হুবহু অনুকরণের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে আগ্রহী নন। বরং তিনি নাট্যকার প্রদত্ত বিষয়কে একাধিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে গ্রহণপূর্বক 'নাট্য-মুহূর্ত' তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আতাউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নসূত্রে নাটকের সাথে যুক্ত থেকেই নাটক-নির্দেশনা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। তিনি মনে করতেন নাটকের নির্দেশকই 'সর্বশক্তিমান কর্তা'। এমন কি নির্দেশককে নাটকের সর্বাধিনায়ক বা ডিকটেটর হিসেবেও ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। নির্দেশকরা তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চের উপর হাঁটা-চলা, অঙ্গ-সঞ্চালন, অভিব্যক্তি প্রকাশ, সংলাপ উচ্চারণ ও প্রক্ষেপণ সব কিছু শিখিয়ে দিতেন এবং কার্যত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁকেই একধরনের অন্ধ অনুকরণ করতেন। ফলে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ– অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর স্ব-প্রতিভা উদ্ভূত সাবলীল নাট্যাভিনয়ের তেমন করার কিছু থাকত না। তখন অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্দেশককেই অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন :

এমন কি আমিও আমার নির্দেশনা বৃত্তির প্রথম দিকে এই সনাতন ধারাতেই কাজ করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমি নিজেকে একজন আধুনিক নির্দেশক হিসেবে ভাবতে ভালবাসি। আমার নির্দেশনার প্রথমদিকে আমি নাটকের পাণ্ডুলিপি অনেকবার পড়তাম এবং মহড়ায় যাওয়ার পূর্বে অনেক পেপার ওয়ার্ক করতাম। এক কথায় নাট্য-নির্দেশনার একটা 'ব্লু-প্রিন্ট' আমি করোটিতে আগে-ভাগেই তৈরি

[৩৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধান কালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২০-০৭-২০১৫।

করে ফেলতাম এবং কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনা সাপেক্ষে সে ছকটাকেই মঞ্চে মূর্ত করতাম। আমার এ বৃত্তির প্রথমদিকে আমি বেশ বিভ্রান্ত, দোদুল্যমান, হতবুদ্ধি ও দুর্বল নাট্য-নির্দেশক ছিলাম। দুর্দান্ত সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিভিন্ন পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম এবং নার্ভাস বোধ করতাম এবং স্টেজ ব্লকিং থেকে নিয়ে প্রযোজনার বিভিন্ন উপকরণ বদলাতে থাকতাম। এই কমজোর অবস্থাতেই আমি নাগরিক নাট্য-সম্প্রদায়ের তিন-চারটি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছি এবং কিছুটা পরিচিতি এবং স্বীকৃতি পেয়েছি। এরপর থেকে নাট্য-নির্দেশনা পদ্ধতি নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কুল-কিনারা পাইনি। নাট্য-নির্দেশনার কোনো ব্যাকরণ, অভিধান বা গানের স্বরলিপির মতো কিছু নেই বলে প্রত্যেক নির্দেশক নিজ-নিজ পদ্ধতিতে নির্দেশনা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছান। একদিন বিখ্যাত নাট্য-নির্দেশক টায়রন গাস্টরির নির্দেশনা পদ্ধতি সম্পর্কে পড়তে গিয়ে জানতে পারলাম যে, উনি নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি ও টেকনিকের মিশ্রণ ঘটাতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কাজটি তাঁর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।[৩৬]

উক্তিটির মধ্যদিয়ে নির্দেশনা 'কৌশল' বা 'প্রক্রিয়া' বিষয়ে আতাউরের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে জানা যায়। তিনি মনে করতেন: 'নাট্য-নির্দেশনার কোনো ব্যাকরণ, অভিধান বা গানের স্বরলিপির মতো কিছু নেই'। কিন্তু তিনি এই ধারণা থেকে সরে এসে উপলব্ধি করেন যে নির্দেশনা ক্ষেত্রে 'স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি ও টেকনিকের মিশ্রণ' ঘটানো প্রয়োজন। মূলত, এই পরিবর্তিত উপলব্ধিসূত্রেই নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে আতাউর রহমানের পরবর্তী নাট্য-নির্দেশনাসমূহকে বিশেষ গুরুত্বে দেখা যেতে পারে। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি 'স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি' এবং 'ইনটুইশনের' উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন :

> সৃজনশীল চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অবচেতন মনের প্রকোষ্ঠ থেকে, যুক্তি-তর্ক বা বুদ্ধি দিয়ে নয়। পৃথিবীর সুন্দর-সুন্দর ধারণাগুলো সোনালি ঈগলের ডানায় ভর করে হঠাৎ উর্ধ্বলোক থেকে এসে পৌঁছে; তার জন্যে প্রাণপাত করতে হয় না। নির্দেশকই হলেন নাটকের পরিশেষ ব্যাখ্যাদাতা। নির্দেশনার ক্ষেত্রে টায়রন গাস্টরির ধারণা আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। আমি এখন দেখতে পাই যে, নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে সুন্দর-সুন্দর ধারণাগুলো যেন হঠাৎ করে কীভাবে এসে যায়। আগে অনেক মাথা খাটাতাম, অনেক পরিশ্রম করতাম, এখন নির্দেশনার কাজটা আমার সহজায়ত্ত। আমি এখন নাটকের পাণ্ডুলিপি অনেক বার পড়ি না, অভিনয়, ব্লকিং ইত্যাদি নিয়ে অযথা চাপ নেই না। সর্বোপরি নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টির নব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন-নতুন ধারণাগুলো আমি মহড়া রুমে

[৩৬] আতাউর রহমান, 'নাট্য নির্দেশনা ও আমার ধারণা', *নাগরিক নাট্যঙ্গন নাট্যপত্র শুধু নাটক* (সম্পাদক : ড. ইনামুল হক), ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১২৩-২৪।

আবিষ্কার করি। যদি মনে করি আজকের লব্ধ ধারণা গতকালকের চেয়েও ভালো, তাহলে আগেরটা বাতিল করে দেই। আমি এভাবে নিজেকেই নিজে পালটাতে থাকি। যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেন তাঁরা জানেন যে, এমনকি ড্রেস-রিহার্সালের সন্ধ্যায় আমি বড় ধরনের পরিবর্তন করে বসি। এতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর কষ্ট হয় বুঝি, তবুও প্রয়োজনীয় সার্বিক স্বার্থে তাঁরা আমার এই অরাজকতা মেনে নেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যার অভিনয় আমার মনমতো হয় তাকে অযথা নির্দেশনা দিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাচিক ও দৈহিক অভিনয়ের কোন দুর্বলতা যদি দূর করতে নাও পারি, তবুও আমি কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আমার নির্দেশিত নাটক থেকে আজ পর্যন্ত বাদ দেইনি, বরং সেই দুর্বলতাগুলোকে নাটকের স্বপক্ষ শক্তি হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি যে, একজন নাট্য-নির্দেশক হলেন একজন আবিষ্কারক, সুতরাং তিনিই অকর্ষিত ভূমি কর্ষণের দায়িত্ব নেবেন, নতুন ভূমি আবিষ্কারের চ্যালেঞ্জ নেবেন। আমার ধারণায় নির্দেশকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রযোজনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাগরে ডুব দেয়া। চেনা ভূমি অতিক্রমণে কোনো আনন্দ নেই, যে কাজে যতো বেশি ঝুঁকি সে কাজ ততো বেশি আনন্দের। নির্দেশকের কাজ মিউজিয়াম পিস উপস্থাপনায় নয়, তাঁর কাজ হলো এক্সপেরিমেনটেশান, তাতে অকৃতকার্য হলেও আমি মনে করি কিছু হারাবার থাকে না। কোনো নির্দেশকের সব কাজ সমান ভালো হতে পারে না। সত্যজিৎ রায়ের মতো এমন বড় চলচ্চিত্র নির্দেশকের সব কাজ সমান মাপের নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সর্বগ্রাসী প্রতিভাবান স্রষ্টার কাজের মধ্যেও পরস্পর মানের তারতম্য আছে, সুতরাং ভয় কীসের, হয় কাজ গ্রহণযোগ্য হবে, না হয় হবে না। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে নব থেকে নবতর নিরীক্ষার ঝুঁকি নিতেই হবে, না হলে কাজটার মজা থাকবে না এবং শিল্পকাজ হিসেবেও এই বৃত্তি স্থবির হয়ে পড়বে।[৩৭]

এই অভিমতের মাধ্যমে আতাউর রহমানের নির্দেশনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা লাভ করা যায়। আতাউর রহমান এখানে নির্দেশক 'সর্বশক্তিমান কর্তা'–এই ধারণা থেকে সরে এসে নির্দেশককে একজন 'আবিষ্কারক' হিসেবে উদ্বুদ্ধকারী 'কর্তা' রূপে দেখতে চেয়েছেন। 'নির্দেশক' সম্পর্কে তাঁর এই পরিবর্তিত ধারণাসূত্রেই তিনি আরও বেশকিছু নাটকের নির্দেশনা দেন। নির্দেশিত এই সকল নাটক সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়নে 'নির্দেশক' ও 'নির্দেশনা' বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং পরিণত অভিমত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

৩৭. আতাউর রহমান, 'নাট্য নির্দেশনা ও আমার ধারণা', *নাগরিক নাট্যঙ্গন নাট্যপত্র শুধু নাটক* (সম্পাদক : ড. ইনামুল হক), ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১২৩-২৪।

এই নিরীক্ষাধর্মী কাজ করে আমি– *গডোর প্রতীক্ষায়*, *গ্যালিলিও*, *হিম্মতী মা* এবং *ঈর্ষা* নাটকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি এবং দর্শকরা আমার কাজকে খারাপ বলেননি। নির্দেশক হিসেবে আমি তরুণদের সঙ্গে কাজ করে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি, কারণ তাদের সহজে ভেঙ্গে আবার গড়া যায়, নতুন ধারণাগুলোকে ওরা সহজে গ্রহণ ও প্রশংসা করতে পারে। এ পর্যায়ে আমি থিয়েটার স্কুলের– *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *ম্যাকবেথ* এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির– *ডেড পি কক* প্রযোজনাসমূহকে খুব মূল্য দিয়ে থাকি। এই তিনটি প্রযোজনায় আমিই নাট্যকারদের অভিপ্রায়ের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছি, নব ব্যাখ্যায় তাঁদের অভিপ্রায়কে আলোকিত করতে পেরেছি। ঢাকা পদাতিকের প্রযোজনা– *ফেরা* নাটকে আমি নির্দেশক হিসেবে অনেক নতুন ধারণাপুষ্ট কাজ করতে চেয়েছিলাম। নাটকটি ফ্রেডেরিশ ডুরেনমার্টের, আবদুস সেলিম রূপান্তর করেছিলেন। আমার ধারণায় কাজটা খারাপ হয়নি। তবুও প্রযোজনাটি খুব বেশি সন্ধ্যা মঞ্চের আলো দেখতে পায়নি। হয় ঢাকা পদাতিকের কর্মীবৃন্দ আমার কাজটি অন্তরে গ্রহণ করতে পারে নি অথবা দর্শকদের দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে নি। এটাই হলো নির্দেশকের ঝুঁকি। তবুও নির্দেশনার কাজ আমার কাছে অপার আনন্দের বিষয় এবং একটি সম্প্রীতিমূলক কাজও বটে। নির্দেশনার ক্ষেত্রে আমি বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় দেখতে চাই, তবে এই কাজে বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতিকে আমি অগ্রাধিকার দেই কারণ আমি জানি যে, মানুষের মুখে ভাষা আগে তৈরি হয়েছে, তারপরে এসেছে ব্যাকরণ। সবশেষে আমি নির্দেশনার কাজকে এসেম্বেল ওয়ার্ক বা সবার প্রয়াসে সমন্বিত একটি কাজ বলে মনে করি যার পথ-প্রদর্শক হলেন নির্দেশক।[৩৮]

মহড়ায় পাণ্ডুলিপি পাঠ শেষে যখন দেখেন যে, পড়াটা আয়ত্ত হয়েছে তখন আতাউর রহমান দাঁড়িয়ে ব্লকিং-এর দিকে এগিয়ে যান। প্রথমে মহড়ায় পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়েই পড়েন। কেউ হয়তো প্রম্প্ট করেন। আজকাল অনেকেই পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে পড়েন। তবে তাঁর কাজের শুরুতে দেখা যায় যে প্রম্প্টিংই চলে অনেক সময় ধরে। আবার কখনো দেখা যায় যে হাতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়তে-পড়তে ঐ ব্লকিংগুলো দাঁড়ায়। ব্লকিংগুলো দাঁড়িয়ে গেলে হঠাৎ হয়তো দেখলেন যে, পাঠে কোথাও গণ্ডগোল আছে, বিশেষ করে সংলাপ প্রক্ষেপণে; তখন আবার হয়তো পাণ্ডুলিপি পাঠে চলে গেলেন। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর হয়তো দেখা গেলো নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনে কিছু সংগীত প্রয়োজন। সংগীত দিলে ঐ পরিবেশটা হয়তো আরও ভালোভাবে পাওয়া যায়। এভাবে মহড়ায় নাট্য-অনুষঙ্গ হিসেবে সংগীত-এর সাথে ব্লকিং শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক সময়ে

[৩৮]. আতাউর রহমান, 'নাট্য নির্দেশনা ও আমার ধারণা', *নাগরিক নাট্যঙ্গন নাট্যপত্র শুধু নাটক* (সম্পাদক : ড. ইনামুল হক), ঢাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১২৪।

দেখা যায় যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পাণ্ডুলিপিটা মুখস্থ হয়ে গেছে। তবে এর সাথে প্রম্প্ট করাটা থেকেই যায় কারণ হঠাৎ করে কারও সংলাপ ভুলে যাবার আশঙ্কা রয়েই যায়।

মহড়ার পরবর্তী পর্যায়ে নির্দেশক আতাউর রহমান সংশ্লিষ্ট নাটকের মঞ্চ-পরিকল্পনা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিজাইনার হয়তো ইতোমধ্যে মঞ্চ-পরিকল্পনাটা করে ফেলেছেন। নির্দেশক মঞ্চের নকশাটা সামনে ফেলে রেখে ছোট্ট ঘরের মধ্যে মহড়াটা চালান। কক্ষের মাঝে মঞ্চের নকশাটা ফেলে রাখলে নির্দেশক এবং কলাকুশলী উভয়েরই চলন ব্যাপারটাতে খুবই সুবিধা হয় এই ভেবে যে, একটা অনুমান করা যায় এইতো মঞ্চ। হয়তো এখানে গাছ আছে, ঐখানে সিঁড়ি আছে, ওখান দিয়ে খালি পথ সুতরাং এভাবে ঘুরে যেতে হবে ইত্যাদি-ইত্যাদি। কোন-কোন নাটকের মহড়ায় আতাউর রহমান সেট [পরিকল্পিত মঞ্চ] ফেলেই মহড়া করেছিলেন, যেমন– সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন*। এই নাটকের মহড়ায় তিনি নিজ বাসার উন্মুক্ত স্থানে সেট ব্যবহার করেই মহড়া করিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে আতাউর রহমান মনে করেন– 'সব নাটকে এ রকম একটা সদৃশ মঞ্চের মাধ্যমে মহড়া দিতে পারলে প্রত্যেকটা নাটক অনেক ভালো হতো।'[৩৯] এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন– 'সেট কিংবা সেটার অনুরূপ কিছুর ওপর মহড়া না দিলে সেটের উপর চলনটা রপ্ত হয় না, সিঁড়িটা যথাযথ রপ্ত হয় না। ফলে দেখা যায় যে, মঞ্চের অনেক স্থানই অব্যবহৃত থেকে যায়। কখনো-কখনো দেখা যায় সিঁড়িতে উঠতে গেলে দেখে-দেখে উঠতে হয়। যার ফলে অভিনয় প্রক্রিয়াটা বাধাগ্রস্থ হয় এবং স্বাভাবিকতা হারায়। বাসার সিঁড়ি তো প্রত্যেকের অভ্যস্থ সেখানে কাউকেই দেখে-দেখে উঠতে হয় না। এ ক্ষেত্রে নাটকের মহড়াটা বিশেষ করে টেকনিক্যাল বিষয়ের ক্ষেত্রে একটু ডিটেল এবং অপেক্ষাকৃত অধিক সময় নিয়ে করাই ভালো। তাতে করে মঞ্চের উপর চলাফেরাটা অনেকটা সহজতর হয়।'[৪০] তবে আতাউর রহমান নির্দেশিত এবং অভিনীত– *রক্তকরবী* নাটক মূল্যায়ন করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নাটকের সেট, লাইট এবং আবহসংগীত ব্যবহারে প্রক্রিয়াগতভাবে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* যেন প্রাণ হারাবার ভয়ে কাঁপছে। কারণ রিয়্যালিস্টিক সেট, এবং শব্দ প্রক্ষেপণের জন্য যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যদিয়ে প্রযুক্তিগত যে সুবিধা তিনি নিতে চেয়েছিলেন তা মূলত যান্ত্রিকতাতেই পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রাণের অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে *রক্তকরবী*-র যে চিত্রকল্প এবং মাধুর্য তা অনেকটই বিঘ্নিত হয়েছে।'[৪১] আতাউর রহমানের মতে :

> নিজস্ব মঞ্চ থাকা জরুরি। আমরা দু'একটা নাটকে সেট ফেলে মহড়া করতে পেরেছি, শীতকাল বা বৃষ্টির সময় ছাড়া। তবে সচরাচর সেট আমাদের জন্য একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যখন

৩৯. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২০-০৭-২০১৫।

৪০. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২০-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)

৪১. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১০৭-০৮।

> আলোক-পরিকল্পনা আসে, তখন আলোক-পরিকল্পককে আলো বিষয়ে ধারণা দেই। ধারণা দিয়েও আলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ঐ কারিগরি শোতে গিয়ে ঠিক করতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করি নাটকে আলোক-মঞ্চ-পোশাক-দ্রব্যসামগ্রী সবকিছু মিলে যেন একটা ঐক্য তৈরি হয়। মোটকথা, নাটকের চরিত্রটা যেন বজায় থাকে। নাটক করতে গেলে আমরা সচরাচর বিষয়বস্তুটা বোঝার চেষ্টা করি। প্রত্যেকটা নাটকের একটি রঙ আছে, রঙ-টা কি ধূসর? উদাহরণস্বরূপ– সফোক্লিসের *রাজা ইডিপাস* নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, নাটকের মধ্যে রক্ত আছে, চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সর্বোপরি একটা ঐক্য অবস্থান করছে। কাজেই এইভাবে আমরা পাণ্ডুলিপি পাঠ থেকে ব্লকিং, আবার পাঠ করতে-করতে ব্লকিং, তারপর এর সাথে সংগীত অথবা শব্দ মেলাই, এর সাথে সেটের চিন্তাটা মেলাই, সেট করতে না পারলে পোশাকটা আমি আগে থেকেই দেখে নেই মঞ্চে যাওয়ার আগে। এভাবেই আমরা আমাদের সীমিত অবস্থার মধ্যদিয়ে নাটক করি।[৪২]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে খুব সহজেই নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক আতাউর রহমানের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে তিনি যেভাবে কাজটাকে দেখছেন সেটা অবশ্য তাঁর কাজের এক ধরনের সহজাত প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই কর্ম-প্রক্রিয়াকে নির্দেশকের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' প্রয়োগ করেন কি না জানতে চাইলে তাঁর ব্যাখ্যায় স্ব-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি দাবি করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো মেথড অনুসরণ করেন না। বরং তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর নির্দেশনা-কৌশলের তত্ত্বমূলে রয়েছে 'সহজাত' তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তথাপিও তাঁর নির্দেশিত নাটক এবং নাট্য-বিষয়ক একাধিক আলোচনাসূত্রে ব্রেখট, স্তানিস্লাভস্কিসহ একাধিক তাত্ত্বিকের অভিমত ব্যবহার করতে দেখা যায়। নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা মেথড অনুসরণ অথবা প্রয়োগ না করার ক্ষেত্রে থিয়েটার করে রুটি-রোজগারের বিষয়ে অনিশ্চতার বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় পেশাদারিত্ব অনুপস্থিতির কারণে নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় মেথড বা তত্ত্ব বিকশিত হয়নি। তাঁর মতে, 'থিয়েটার কর্মীরা যদি রোজগারের তাগিদে থিয়েটার শিল্পকে ছেড়ে অন্যত্র ছুটাছুটি না করে নিবিষ্ট মনে থিয়েটার চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই এতদিনে এই বাংলাদেশেও নাট্য-নির্দেশনার বিভিন্ন আঙ্গিক, ধারা, তত্ত্ব-সূত্র তৈরি হওয়া খুব একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না।'[৪৩] তিনি মনে করেন শিল্পের কর্ম-প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত কিছু আবিষ্কারের পেছনে যে জিনিসটির অত্যধিক প্রয়োজন তা হলো নিরলস চেষ্টা, নিমগ্ন সাধনা। এ দু'য়ের সম্মিলিত প্রয়াসে

[৪২] মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১০৮-০৯।

[৪৩] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২০-০৭-২০১৫।

অবশ্যই সৃষ্টিশীল কিছু উপহার দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে আধুনিক বাংলা নাটকের নির্দেশনার কাল খুব একটা বড় না হলেও পঁয়তাল্লিশ বছর তো কম সময় নয়। কিন্তু নিষ্ঠা. সততা, একাগ্রতা আর চেষ্টার অভাবে সেখানে নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' অনুসরণ বা প্রয়োগের ব্যাপারটি আর অগ্রসর হতে পারেনি। প্রসঙ্গটির যথার্থতা আতাউর রহমানের বক্তব্যেই খুঁজে পাওয়া যায় :

> আমি কোন 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' প্রয়োগ করি না। কিন্তু এগুলো আমার মাথার মধ্যে আছে, যেহেতু আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াই। আমার মাথার মধ্যে ব্রেখট-এর এপিক ফরম আছে, যাত্রার ফরম আছে, আছে কথকতা, মঙ্গলকাব্য এবং পালাগান। থাকবে না কেন? যেহেতু আমি স্তানিস্লাভস্কি পড়াই তাই তাঁর মেথড এ্যাকটিং আমার জানা আছে। ব্রেখট-এর এপিক, এ্যালিনিয়েশনও আমার জানা আছে। এগুলো মাথার মধ্যে আছে কিন্তু All are theory, contradicts the Practice। ব্রেখট যখন মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাটক দেখতে গেলেন, তিনি চিৎকার করে বললেন– Look here, he is following me। স্তানিস্লাভস্কি'র একেবার আলাদা। দেখা যাচ্ছে স্তানিস্লাভস্কি ব্রেখটের নাটক অনুসরণ করছেন। ব্রেখট আবার স্তানিস্লাভস্কির নাটক অনুসরণ করছেন। ব্রেখট বলতে চাচ্ছেন– তুমি চরিত্রের সঙ্গে একটা আড়াল রাখবে। চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবে না। তোমাকে চরিত্রের মতো হতে হবে। আমি কি সিরাজউদদৌলা হতে পারব? আমার তো Talks medium stage মনে রাখতে হবে, আমার বাবার নামটা আমি ভুলতে পারব না। This is stupid kind of thing যে একাত্ম হয়ে যাওয়া। আমি সত্যের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে পারি; কিন্তু আমি সত্য হতে পারব না। সত্যের মতো Nearest to life, লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে। ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দের মানুষ গ্যালিলিও। তাঁকে দেখার কোনো উপায় নেই। তাই সে কীভাবে হাঁটতো-চলত, পড়া-লেখা করত, আস্তে-আস্তে কীভাবে সে বুড়িয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি শিল্পীর মনন, কল্পনায় মিশিয়ে আমরা অভিনয়ের কাজটা করি। সেক্ষেত্রে কখনো-কখনো মেথড এ্যাকটিং খুব কার্যকর। আধুনিক থিয়েটার মেথড এ্যাকটিং ছাড়া চলে না। মেথড এ্যাকটিং কী বলে? You should be mindful। Method eye-contact-এর কথা বলে। এই যেমন চা খাওয়া। চা খেয়ে বোঝাতে হবে যে চা গরম। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিমগ্ন হয়েই নিরীক্ষণ ক্ষমতা রাখতে হবে। তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে; রিক্‌সাওয়ালা কীভাবে প্যাডেল চালায়। রিক্‌সাওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করতে হলে, ঘামটা সে কীভাবে মুচ্ছে, এগুলো অবশ্যই তাকে লক্ষ্য করতে হবে।[88]

---

[88]. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১১১।

একজন নির্দেশক হিসেবে অবশ্যই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার ধৈর্য ও চিন্তাশক্তি থাকতে হয়। আর বাস্তবতাকে বিবেচনা না করে যদি ফ্যান্টাসি ধরনের নাটক হয়, সেখানেও এক ধরনের বিবেচনা করার ব্যাপার থেকেই যায়। অবস্থা, পরিস্থিতি অবশ্যই সেটা করতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারটা নির্বিঘ্নেই চলে আসে। বিযুক্তিকরণ তত্ত্ব ব্রেখট-এর নাটক করলে হয়তো ব্যবহৃত হয়। ব্রেখট বলছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামনের দর্শককে বিজ্ঞানমনস্ক দর্শকে পরিণত করতে হবে, যাতে করে তারা বাসায় গিয়ে ভাবতে পারে। এটা একেবারেই আপেক্ষিক বিষয়, কেননা কোন নাটকে কীভাবে তত্ত্ব প্রয়োগ হবে সেটা কার্যত নির্দেশকের চাহিদা বা ইচ্ছাধীন বিষয়। ব্রেখটের উদ্ধৃত করে আতাউর রহমান বলেন– ‘Never use colured lights in my theatre. The magician give me more light. How can we expose ourselves such a deam lights।’[৪৫] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, আতাউর রহমান তাঁর নির্দেশিত *গ্যালিলিও* নাটকে ব্রেখটের এই উক্তির আলোকে মঞ্চ-প্রয়োগ করেননি। তিনি বিচিত্র আলোর ব্যবহার করে নাট্যক্রিয়ায় মায়া তৈরি বা মোহবিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হলো :

> যা বলার তা বলা আছে। এগুলো মাথার মধ্যে থাকাটাও খুব জরুরি। দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, আগ্রহ থাকতে হবে, কানটা খোলা রাখতে হবে। এইটাই হচ্ছে মূল কথা। যেহেতু বিষয়টা বিজ্ঞান-সম্মত, সেহেতু এটা কোনো না কোনো ভাবে আমাদের মানতেই হয়– কখনো না জেনেও আমরা সেটা মেনে নিই। যেমন আমরা বলি, ভালো করে তুমি মনোসংযোগ করছ না কেন? এটা আসলে কী? এটাতো স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন। এই তুমি ফুলটা এভাবে ধরেছ কেন? একজন প্রেমিক কি ফুল এভাবে ধরে? এটা কিন্তু আমরা বলে ফেলি। তাহলে প্রেমিক ফুল ধরবে কীভাবে? এই তুমি পিনটা এভাবে খুঁজছো কেন? পিনটা লুকানো আছে পর্দার মধ্যে, এগুলো মূলত স্তানিস্লাভস্কির মেথড। এবং যা বিশ্বনাট্যের জন্য একটা বিরাট অবদান। তাঁর তত্ত্ব অভিনেতা-অভিনেত্রী মেনে চলে, নিজের অজান্তেই ব্যবহৃত হয়। বিষয়টি এখন কিছুটা আত্মগত হয়েছে, ফলে অজান্তে স্তানিস্লাভস্কির কাছে যেতেই হয়।[৪৬]

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে বলা যায় যে, আতাউর রহমান নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেখট-এর এ্যাকটিং মেথড বা তত্ত্বকে অভিনয়ের কার্যকর উপায় হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনা-কৌশল (পঞ্চ-সূত্র) প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। এক নজরে তাঁর নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়– পাণ্ডুলিপি নির্বাচন (নির্দেশকের একক পছন্দ অথবা দলগত

---

৪৫. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১১১।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

সিদ্ধান্ত), পাণ্ডুলিপি পাঠ, ব্লকিং ও প্রম্পটিং, ব্লকিং, কম্পোজিশন, চরিত্রায়ণ, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আলোক ও আবহ সংগীত পরিকল্পনা এইরূপ ক্রম তিনি অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু এই নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর (চরিত্রের) যৌক্তিক উপস্থিতি নির্ণয়ে 'কৌশলগত পদ্ধতি' বা সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর অবস্থান এরকম যে, নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কোনো 'তত্ত্ব' বা 'মেথড' অনুসরণ করে নয় বরং মেথড সম্পর্কিত সহজাত চিন্তা ও পদ্ধতির 'অজান্তে' প্রয়োগকেই কার্যত তিনি গুরুত্ব দেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই তিনি স্বাছন্দ্য বোধ করেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে আতাউর রহমানের সম্পর্ক থাকে বন্ধুর মতো। তিনি বলেন– 'কথা বলতে-বলতে আড্ডা দিতে-দিতে আমি নাটক নির্দেশনা দেই। যেদিন মনে হয়েছে কাজ হবে না, সুর লাগছে না, সেদিন কাজ বন্ধ করে দেই। যেহেতু নাটক এখনো গুরুমুখী বিদ্যা নয়, যে অর্থে নৃত্য বা সংগীত। সেখানেও আলাদা ঢং আছে তবু নাটকের ক্ষেত্রে নির্দেশকই পথ দেখাবে। যে কাউকে দিয়ে অভিনয় হতে পারে। তবে এটা প্রেসক্রিপশনের মতো নয়। নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্কের উপর এটা নির্ভর করে। আসল কথা হচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রী কীভাবে অভিনয়টা করতে চান। সেক্ষেত্রে নির্দেশকের সাথে অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিশ্বাস ও সহমর্মিতা থাকতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি নির্দেশককে শ্রদ্ধা করতে না পারে তবে ভালো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশ্যই উভয়ের সম্পর্কের আদর্শরূপ থাকা প্রয়োজন। ছড়ি হাতে নয় ভালোবাসা দিয়ে বুঝতে হবে। সর্বোপরি একটা সমঝোতা থাকতে হবে।'[৪৭]

অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে নির্দেশকের সম্পর্ক 'বন্ধুর মতো' হলেও একটি সফল নাট্য-নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতি, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার উন্নয়নের বিষয়গুলো সর্বাগ্রে চলে আসে। আর এক্ষেত্রে নির্দেশকের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নির্দেশক আতাউর রহমান মনে করেন :

> একজন সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার, নির্দেশক, মঞ্চ-আলো-পোশাক পরিকল্পক হতে হলে ব্যক্তিগত অনুশীলনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অবশ্যই একজন নির্দেশকের চিন্তা শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক হবে– যা নিঃসন্দেহে তাকে সৃষ্টিশীল করে তুলবে। তবে এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা, বই পড়া, বিভিন্ন নির্দেশকের কর্ম সম্বন্ধে জানা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি গুণও থাকতে হয়। সারা পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সকল কিছু সম্পর্কেই তাকে আপটুডেট থাকতে হয়। কথায় আছে যে, Theratre is the epitome of all arts। যদি তাই সত্য হয় তাহলে অবিরাম চেষ্টা আর সাধনার মধ্য

[৪৭]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২০-০৭-২০১৫।

দিয়েই কোনো মানুষ তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছায়। কারণ যেকোন বিষয়ে আশানুরূপ ফল পেতে গেলে নিরলস চেষ্টা আর একাগ্রতা ছাড়া কখনোই উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয়, আর নাট্য-নির্দেশনার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে নাটক, মূলত মঞ্চ-নাটকের বিষয়টি একেবারেই একটি প্রায়োগিক শিল্পমাধ্যম। যেখানে নিয়মিত চর্চার আর সাধনার মধ্য দিয়ে একটি শিল্পকর্ম তার চূড়ান্ত শিল্পিত রূপ অর্জন করে। নাট্যকলার সকল পর্যায়কেই এ মন্ত্রে সিদ্ধ হতে হয়। সে ক্ষেত্রে একটি অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর লেগে থাকার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।[৪৮]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর 'নিরন্তর লেগে থাকা' ও 'অবিরাম চেষ্টা আর সাধনা' করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এই বক্তব্যসূত্রে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আতাউর রহমান নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে একদিকে নির্দেশকের 'সহজাত জ্ঞান', অপরদিকে অভিনেতার 'নিরন্তর লেগে থাকা' এ দুয়ের সমন্বয়ে এমন এক নাট্য-ভাষ্য তৈরির কথা বলতে চেয়েছেন, যেখানে নাট্যক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ হয়ে উঠতে পারে সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

দায়িত্ব, কর্ম-প্রক্রিয়া ও সৃজনশীলতার বিবেচনায় আতাউর রহমান নাট্য-নির্দেশককে দুটি ভাগে শ্রেণিকরণ করেন। এক শ্রেণির নির্দেশক রয়েছেন যাদের কাছে 'নাটক'ই (নাট্যকার রচিত পাণ্ডুলিপি) হচ্ছে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং অপর এক শ্রেণির নির্দেশক রয়েছেন যারা নিজেকেই প্রথম ও প্রধান বলে মনে করেন– যাদের নিকট নাটক বা পাণ্ডুলিপি কেবলই একটি মাধ্যম মাত্র। নানাবিধ কারণে এই দ্বিতীয় শ্রেণির নির্দেশকের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই ধরনের নির্দেশকের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠে তার চারিত্রিক কিছু দুর্বলতা। বিশেষত, অহম ও আমিত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কারণে নির্দেশনার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি জটিল আর্বতে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়াও চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণের অভাবে কিংবা দৃশ্য বা ঘটনার প্রতি যুক্তিহীন আবিষ্টতা প্রভৃতি নানাবিধ দুর্বলতার কারণেও এই শ্রেণির নির্দেশকের নির্দেশিত নাটক বিশেষ সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। বিপরিতক্রমে, একজন সফল নির্দেশক হয়ে ওঠার প্রশ্নে আতাউর রহমান মনে করেন– 'তিনটি গুণই নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মূলধন–জোরালো সাধারণ জ্ঞান, তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও মানসচক্ষে দেখার ক্ষমতা। একজন নাট্য-নির্দেশক সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হলো, নির্দেশক তখনই নিজ ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে ওঠেন যখন তিনি পারিপার্শ্বিক সব সুবিধা-অসুবিধাকে মেনে নিয়ে, নিজস্ব সীমিত অবস্থার মধ্যে লভ্য সকল উপকরণাদির সর্বাধিক ব্যবহার করতে সক্ষম হন। কারণ আমাদের নাট্যচর্চা হলো সঙ্কট ও সীমিত

[৪৮]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।

অবস্থার মধ্যে বিরতিহীন এক শিল্পের সাধনা। এদেশের নাট্য-কর্মীদের জন্যে কোনো কিছুই সহজলভ্য নয়, এ কথাটা ঢাকার ও ঢাকার বাইরে সব নাট্য-নির্দেশকের মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।’[৪৯]

এতক্ষণের আলোচনাসূত্রে মেথড এ্যাকটিং এবং নির্দেশকের দায়িত্ব ও কর্ম-কৌশল বিষয়ে আতাউর রহমানের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গেলেও ‘নির্দেশনা কৌশল’ বা পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর অবস্থান অনেকটাই অস্পষ্ট। ‘পঞ্চ-সূত্র’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– ‘বিন্যাস (কম্পোজিশন) নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ, যা চোখে দেখা যায়। দর্শক তো থিয়েটার দেখতেই আসে। আঙ্গিককে দিয়েই তো আমি হৃদয় স্থাপন করি। থিয়েটারে শিল্পের সবকিছুর সিম্ফনি তৈরি করতে হবে, তা না হলে দর্শকের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।’[৫০] ‘দৃশ্যায়ন’ (পিক্‌চারাইজেশন) প্রসঙ্গে তিনি বলেন– ‘একটার পর একটা মালা গেঁথে আমাকে দৃশ্যায়ন করতে হয়। আমি দর্শককে একটা বোধের পরিচয় দিব। এরপরে কী? একটি দৃশ্য হয়তো তুঙ্গে আছে। তারপরের দৃশ্যে আমি প্রশান্তি ছড়িয়ে দিব।’[৫১] ‘চলন’ (মুভমেন্ট) সম্পর্কে তাঁর মত হলো– ‘শেকসপীয়রের যুগে ঝাঁকি মেরে কথা বলা হতো। ঋজু হয়ে দাঁড়ানো ছিল তখনকার বৈশিষ্ট্য।’ একজন মাস্তান কেবল থ্রেট দেয় না। ‘ওই শালা ধর’ বলা কিংবা ‘ওই কই যাইতাছস’-এর চলন দুই রকম হতে পারে। মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী এটি নির্ধারিত হয়।’[৫২] তিনি মনে করেন, নির্দেশনা কৌশলের ক্ষেত্রে ‘ছন্দ’ একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। প্রত্যেকটা ক্রিয়ার লয় ও ছন্দ থাকে। থিয়েটারও এর বাইরে নয়। পঞ্চ-সূত্রের শেষ সূত্র ‘নির্বাক অভিনয়’ (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) সম্পর্কে আতাউর রহমান বলেন– ‘আমি এর ব্যবহার করি নি। তবে কেউ করলে আমার ভালোলাগে। আমি কেবল মূকাভিনয় বুঝি। তবে কেউ কেউ বলে এর সাথে নির্বাক অভিনয়ের পার্থক্য আছে। মূলত এই সবকিছুর কম্বিনেশনই হলো নাটক।’[৫৩]

‘পঞ্চ-সূত্র’-বিষয়ক উপর্যুক্ত অলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মেথড এ্যাকটিং বিষয়ে পাশ্চাত্যের স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেখট-এর ওপর আতাউর রহমানকে যতোটা গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়, নির্দেশনা কৌশল হিসেবে পঞ্চ-সূত্রের প্রায়োগিক বিষয়ে ততোটা নয়। ‘বিন্যাস’ (কম্পোজিশন) সম্পর্কিত তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– তিনি ‘বিন্যাস’ বলতে মনে করেন ‘যা চোখে দেখা যায়, দর্শক তো থিয়েটার দেখতেই আসে’। অথচ পঞ্চ-সূত্র মতে এটি সম্পূর্ণতই ‘দৃশ্যায়ন’ (পিকচারাইজেশন)-এর একটি বিষয়। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের ‘বিন্যাস’ সম্পর্কিত আলোচনায় উদ্ধৃতিসূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ‘বিন্যাস’ কেবলই প্রদর্শিত দৃশ্যের ‘অর্থ’ (meaning of the picture) প্রকাশ করা নয় বরং সামগ্রিক অর্থে ‘বিন্যাস’

[৪৯]. আতাউর রহমান সম্পাদিত, *নাটক করতে হলে* (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ১১৬।
[৫০]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।
[৫১]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)
[৫২]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)
[৫৩]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)

হচ্ছে এমন এক কৌশল যা রঙ (color), লাইন/রেখা (line), ভর (mass) এবং আঙ্গিক (form)-এর সাহায্যে 'বিষয়' (subject)-এর অনুভূতি (feeling), ভাব (mood) এবং গুণমান (quality) প্রকাশ করা। সুতরাং পঞ্চ-সূত্র বিষয়ে আতাউর রহমানের উচ্চারিত 'বিন্যাস'-বিষয়ক উক্তিটিকে কৌশলগত যুক্তি নয় বরং একটি ধারণাগত উক্তি হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। তা সত্ত্বেও তৃতীয় অধ্যায়ে আতাউর রহমান নির্দেশিত *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাটকের প্রায়োগিক কৌশল বিশ্লেষণে পঞ্চ-সূত্রের কিছু উপাদানের কার্যকর উপস্থিতি এবং অর্থপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এটা সম্ভব হলো কী করে? এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন :

> শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে নির্দেশককে হতে হবে সর্বগুণে গুণান্বিত। অর্থাৎ নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় জ্ঞাপনও অবশ্যম্ভাবী। আমরা না জেনেই থিয়েটার করা শুরু করেছিলাম। পরে ধীরে-ধীরে জেনেছি। আমি মনে করি প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থিয়েটার ডিপার্টমেন্ট খুলেছে বলে আমি খুবই খুশি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও খোলা উচিত। আমরা আমাদের ছাত্রজীবনে এই সুযোগ পাইনি, কিন্তু এখন যেহেতু হাতের কাছে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কেন করব না। আমরা কি ইন্টারনেট ব্যবহার করছি না। তৈমুর লং সম্বন্ধে শোনা যায়, তাঁর টেন্টের পাশে কেউ গান গাইতে পারতো না। কেননা গান গাইলে তার মন নরম হয়ে যাবে। মানুষ হত্যা করতে পারবে না। তাই বলি শিল্প-বিহীন জীবন আসলে কাটানো যায় না। শিল্প ছাড়া জীবন কি আদৌ আছে? গরুর মতো ঘানি টানা মানুষ আছে। তবে তার মধ্যেও শিল্প থাকে। আমাদের দেশে মানুষ সকালবেলা ঝুলতে-ঝুলতে অফিসে যায়। আবার সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরে। ক্লান্ত শরীর নিয়ে হয়তো সন্তানকে একটু পড়ায় এবং ঘুমাতে যায়। এর মধ্যেও হয়তো একটু সবুজ দেখে তার ভালো লাগে। শিল্প তো কেবল নাচ, গান আর নাটক নয়। ওয়ে অব লাইফ। শেষ পর্যন্ত ভালো মানুষ হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এই শিল্প-ভাবনাকে কাজে লাগাতে হয় তার চরিত্রায়ণে। জীবনের সবক্ষেত্রে রয়েছে আনন্দের উৎস। অহংকার বর্জন করতে না পারলে ভালো নির্দেশক হওয়া কঠিন। আমি যা জানি তা আর কেউ জানে না এই ভাবনা থাকা অনুচিত। আমাকে নির্দেশনার কাজে প্রয়োজনে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের সাথেও মিশতে হবে। প্রত্যেক পেশার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। নোবেল পুরস্কার পাওয়া একজন লেখকের যে অবস্থান সেই একই অবস্থান থাকবে একজন শ্রমিকেরও। শিল্পের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতাও থাকতে হবে।[৫৪]

[৫৪]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।

আতাউর রহমানের নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে–একটি হচ্ছে বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যক্তির সম্যক 'জ্ঞান' অর্জন করা, যাকে তিনি বলেন 'গুণ' বা 'বিচক্ষণতা' এবং অপরটি হচ্ছে কঠিন বাস্তবতার মধ্যে 'শিল্প' অন্বেষণ করার সক্ষমতা। বস্তুত শিল্প, সংস্কৃতি এবং নাট্য বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং জ্ঞানই তাঁর এই সহজাত নির্দেশনা প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পদ্ধতিগত 'গুণ' বা কৌশল প্রয়োগের 'বিচক্ষণতা'-সূত্রেই কেবল একজন 'নির্দেশকের' নির্দেশনা প্রক্রিয়াকে বিচার করার সুযোগ থাকে না। বরং একজন 'ভালো নির্দেশক' হওয়া বা 'কালোত্তীর্ণ নির্দেশনা' প্রদানের ক্ষেত্রে নাট্যকলার সামগ্রিক সাংগঠনিক প্রতিবেশে পেশাদারিত্বের উন্নয়নকেও একটি পূর্বশর্ত বলে তিনি মনে করেন। পেশাদারিত্ব একদিকে যেমন নাট্যকর্মীর দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করতে পারে; একই সাথে অভিনয় এবং নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'পদ্ধতি' বা 'কৌশলগত' চর্চাকেও বিকশিত করতে পারে। ফলে বাংলাদেশের গ্রুপ-থিয়েটারকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় পেশাদারিত্বের অনুপস্থিতিকে একটি গভীর সংকট হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান নির্দেশক আতাউর রহমান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> স্বাধীনতা-উত্তর নব্বই-এর দশক পর্যন্ত গ্রুপ-থিয়েটার চর্চায় যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে নাট্য-কর্মীরা আত্মনিবেদিত ছিল সে-তুলনায় বর্তমানের নাট্যচর্চায় কিছুটা টানাপড়েন লক্ষ্য করা যায়। গ্রুপ থিয়েটার চর্চার ক্ষেত্রে নাট্যকর্মীরা দিনদিন তাদের কমিটমেন্ট থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। যা ভবিষ্যৎ বাংলা নাট্যের জন্য সত্যিই হতাশার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ শুধু নাটক করে তো কিছু করা যায় না। রোজগারের কথা বলছি। কাজেই নাটকের ছেলে-মেয়েরা এখনো কোনো না কোনোভাবে মিডিয়া প্রডাকশন হাউজ-এর সাথে যুক্ত। কাজেই সন্ধ্যাবেলাটায় ওদের কাজ থাকে। এই কাজের কারণে মঞ্চনাটক থেকে কিছুটা হলেও দূরে সরিয়েছে নাট্য-কর্মীদের। কিন্তু এটা যদি এমন হয় যে, প্রোফেশনালভাবে সপ্তাহে একটি মঞ্চ নাটক তিন দিন করে কেউ যদি তিনশতো টাকা উপার্জন করতে পারতো। মাসে দুই হাজার টাকা আয় হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু এই মঞ্চের ক্ষেত্রে কমিটমেন্ট হারানোর মনসিকতা দূর হয়ে যেত। তদুপরি মঞ্চনাটক মানুষ করে কেন? এক্ষেত্রে একটি বোধ সবার মধ্যেই আছে যে মঞ্চনাটকে সম্মানের জায়গাটা অর্জিত হয়েছে। আমাদের সরকার যদি সাবসিডি দিত। দশটা গ্রুপ করে বছরে দশ লক্ষ টাকা বেতন দিত। বেতন দিতে পারলে তখন আগ্রহটা অবশ্যই থাকতো, তখন অন্য জায়গায় মনটা টানলে তাকে একথা বলা যেত যে, তুমি তো নাটকে কাস্টিং আছ। সুতরাং তোমাকে এখানে থাকতে হবে। He or she, bound to do the theatre properly। এখন তো আমরা বলতে পারছি না। কাজের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রফেশনালটা আনতে

হবে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকলকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাছাড়া ভালো নির্দেশক বা কালোত্তীর্ণ নির্দেশনার কথা যদি চিন্তা করি সে ক্ষেত্রেই বা কী করণীয় আছে।[৫৫]

মহড়া শেষে একটি নাটকের প্রথম প্রদর্শনী বা প্রিমিয়ার শো-এর পর নির্দেশকের উপস্থিতি কতটা অত্যাবশ্যকীয় ও প্রাসঙ্গিক এ বিষয়ে আতাউর রহমান মনে করেন– 'হ্যাঁ এটি খুব প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশে। তবে পাশ্চাত্যে নির্দেশকের কাজ ফুরিয়ে যায়। হয়তো চার-পাঁচটা প্রদর্শনীতে তিনি থাকেন। এরপর দায়িত্ব অর্পিত হয় স্টেজ-ম্যানেজার বা প্রোডাকশন ম্যানেজারের ওপর। কিন্তু আমাদের দেশের নির্দেশককে লেগেই থাকতে হয়। আমাদের তো নিজস্ব অডিটোরিয়াম নেই।'[৫৬] এইরূপ উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায় তিনি নাট্য-নির্দেশনা প্রক্রিয়া এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এই দুটি পৃথক ক্ষেত্রের সাথে 'নির্দেশকের' উপস্থিতি ও দায়বদ্ধতাকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, নাট্যচর্চার এইরূপ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বস্তুত বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠে, যে প্রক্রিয়া নির্দেশককে 'সর্বময় কর্তায়' রূপান্তরিত করে এবং একই সাথে নাট্যচর্চায় পেশাদারিত্বের বিপরীতে কেবল 'নেতৃত্ব'মূলক নাট্যচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

'নাট্য-নির্দেশনার কোনো ব্যাকরণ বা সংগীতের মতো কোনো স্বরলিপি নেই, যেটা যথার্থভাবে অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব'– এরূপ উক্তির মাধ্যমে নির্দেশক আতাউর রহমানের নির্দেশনা প্রক্রিয়া ও কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়। উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 'পঞ্চসূত্র'কে গ্রহণ না করলেও পাশ্চাত্যের একাধিক নাট্যকার ও নির্দেশকের কর্ম-প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে আতাউর রহমান বিবেচনা করেছেন। এমনকি মহড়াকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাবলীল উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মেথড এ্যাকটিং-এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার উপরেও তাঁকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে এই দীর্ঘ আলোচনার পাশাপাশি তাঁর নির্দেশিত নাটক পর্যবেক্ষণেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে– নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্যের নাট্য-চিন্তা বিশেষত স্তানিস্লাভস্কির পদ্ধতিগত অভিনয় এবং ব্রেখট-এর নির্দেশনা কৌশলকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। এই আলোচনা-সূত্রে তাঁর নাট্য-চিন্তার আরও একটি দিক স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমা নাট্য-চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকেই তিনি শিল্পের শাশ্বত সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ শামসুল হক-সহ বেশকিছু বাঙালি নাট্যকারের নাটকও নির্দেশনা দিয়েছেন, তথাপিও পাণ্ডুলিপি নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিনয় পদ্ধতি, মঞ্চ-পরিকল্পনা এবং নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নাট্য-চিন্তা ও

[৫৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।
[৫৬] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)

চর্চাতেই থেকেছেন আস্থাশীল। তাঁর কাজের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক চেতনা কাজ করে। আর এই চেতনা নিজের দেশকে ছাপিয়ে অনেকটাই বিশ্ব-প্রসারিত। যদিও আতাউর রহমানের ভাবনায় বাঙালির ঐতিহ্যবাহী যাত্রা আছে, পাঁচালি আছে, পালাগান আছে এবং লোককবিদের স্টেপিং মুভমেন্টও আছে, তথাপিও তিনি কোন বিশেষ 'ঘরানায়' বিশ্বাসী হয়ে থাকেননি। ফলে নির্দেশনার ক্ষেত্রে আতাউর রহমান একদিকে যেমন নাট্যকার-বর্ণিত সময় বা কালের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, তেমনি আবার নির্দেশকের কালটাকেও গুরুত্ব দেন সচেতনভাবে। এই দুই কালের সংশ্লেষের মধ্যদিয়েই আতাউর রহমানের নির্দেশনা প্রক্রিয়ার একটি মিশ্ররূপ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। মূলত তিনি 'মিক্সড ফরমে' কাজ করে থাকেন, আর এর মূলে রয়েছে ব্যক্তি আতাউর রহমানের পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য। বলা যায়, এ বিষয়ে রয়েছে তাঁর বিস্তর জ্ঞান। তবে পাশ্চাত্য নাট্যকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নির্দেশনার কৌশল সম্পর্কিত আলেক্সজাণ্ডার ডিন ও লরেন্স কারা'র 'পঞ্চ-সূত্র' বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এমনটা অন্তত তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপনে মনে হয়নি। নাট্য-নির্মাণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস এমন যে– 'নাটক একটি সার্বজনীন শিল্পমাধ্যম এবং সকল সভ্যতার জন্যই তার দ্বার উন্মোচিত থাকা উচিত।'[৫৭] অর্থাৎ তিনি কোনো একটি বা বিশেষ পদ্ধতি অথবা প্রক্রিয়া মেনে নিয়ে নাট্য-নির্দেশনার পক্ষপাতি নন। তিনি মনে করেন– 'পৃথিবীর শাশ্বত যা কিছু সুন্দর, তা সকল মানুষের, সকল সভ্যতার আর এই সুন্দরকে পৃথিবীর সকল রূপ, রস, রঙের মাধ্যমে যে কেউ প্রকাশ করতে পারেন তার মেধা বিদ্যা-বুদ্ধি আর মনন শৈলীর মধ্য দিয়ে।'[৫৮] তিনি আরও মনে করেন– 'পশ্চিম আমাদেরকে যেমন অনেক কিছু দিয়েছে আবার নিয়েছেও তেমন। শিল্পের বিনিময়টা যে কোনো কিছুকে আরও সুদৃঢ়, সুসংহত ও সাবলম্বী করে তোলে।'[৫৯] তাৎপর্যপূর্ণ এই সকল বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত কোন একটি মেথড বা তত্ত্ব-সূত্র অনুসরণ করতে চাননি। তিনি মনে করেন– 'নির্দেশনার ক্ষেত্রে মেথড বা তত্ত্ব-সূত্র তৈরির বিষয়টা আরও অনেক সময় সাপেক্ষ এবং সাধনার ব্যাপার। একজন নাট্যকর্মীর অপ্রতিরোদ্ধ চেষ্টা, নিরলস সধনা, সততা, নিষ্ঠা আর একাগ্রতার মধ্যে দিয়েই মেথড আবিষ্কারের পথটি সুগম হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।'[৬০] ফলে নির্দেশক হিসেবে তিনি সর্বদাই একাধিক নাট্য-চিন্তা বা তত্ত্বের সমন্বয়ে নির্দেশনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন– 'নির্দেশনার ক্ষেত্রে আমার কোনো আদর্শ গুরু নেই। সুতরাং কারো প্রভাব আমার উপর পড়ার কথা নয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী হলেন মঞ্চনাটকের প্রধান সম্পদ। তারাই আমাকে শেখান এবং নতুন ধারণা আবিষ্কারে প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন। আমি মনে করি ভালো নির্দেশকের কাজ

---

৫৭. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।

৫৮. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)

৫৯. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫ (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য।)

৬০. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত, পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১১৯।

কখনো আরোপিত মনে হয় না। তাঁর ভাবনা সমগ্র নাট্য প্রযোজনার শরীরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। নির্দেশক মিলিটারি স্বৈরশাসক নয়। তিনি নাট্য প্রযোজনার মালাকার।'[৬১]

উপর্যুক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বর্তমান আলোচনার উপসংহার উপস্থাপন করা যেতে পারে। নির্দেশক আতাউর রহমান 'নির্দেশনা'কে একক ব্যক্তির শিল্পচিন্তাপ্রসূত সৃজনকর্ম হিসেবে না দেখে, একটি সমন্বিত সৃজনপ্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। যে প্রক্রিয়ায় নির্দেশনার সফল বাস্তবায়নে অভিনেতা-অভিনেত্রী, ডিজাইনার এবং নির্দেশকের উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বিত অভিব্যক্তিকেই প্রধান বিবেচ্য বলে মনে করেছেন। তবে মেথড এ্যাকটিং বিষয়টিকে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অত্যাবশ্যকীয় উপায় হিসেবে মেনে নিলেও নির্দেশনার ক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগে তিনি কোনো একক সূত্র বা তত্ত্বকে উপায় হিসেবে না দেখে বরং একটি সমন্বিত সৃজন-প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে আগ্রহী। 'নির্দেশনা' বিষয়ে নির্দেশক আতাউর রহমান প্রদত্ত এই সকল চিন্তা এবং ধারণাগত অভিব্যক্তির আলোকেই অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর নির্দেশিত *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাটক বিশ্লেষণসূত্রে পুনঃনিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬১. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মামুনুর রশীদ

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে মামুনুর রশীদ– 'নাট্যকার, অভিনেতা এবং নির্দেশক হিসেবে পরিচিত। নাটকের ত্রয়ী সত্তার সম্মিলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর মধ্যে।'[৬২] ১৯৪৮ সাল, লিপ-ইয়ার। ঠিক যে তারিখটির কারণে বছরটি অন্য-বছর থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকে, সেই ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখটিতে টাঙ্গাইলের কালিহাতি থানার পাইকড়া গ্রামে জন্ম নিল আবুল কাশেম মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ খান, আজকের বাংলা থিয়েটারের নাট্য-পথিক মামুনুর রশীদ। 'বাবা হারুনুর রশীদ খান সরকারি চাকুরে ছিলেন, পোস্টমাস্টার-এর চাকরি। প্রায়শই বদল করতে হতো কর্মস্থল। ফলে সব সময় পরিবারকে থাকতে হয়েছে নানান জায়গায়।'[৬৩] 'আলো' ডাকনামের মামুনুর রশীদ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যতই আলো ছড়াক না কেন, তিনি তাঁর মা রোকেয়া খানম-কে অতিক্রম করতে পারেন নি, পারবেনও না কখনো, কেন-না, এই রোকেয়া খানমই পরবর্তী সময়ে আরও ক'জন উজ্জ্বল নক্ষত্র'র জন্ম দিয়ে আজাদ প্রোডাক্টস লিমিটেড প্রবর্তিত 'রত্নগর্ভা মা'[৬৪] উপাধিতে ভূষিত হন ২০০৮ সালে। প্রায় সব বাঙালির সাহিত্যচর্চা নাকি শুরু হয় 'কবিতা' দিয়ে, মামুনুর রশীদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না। কবিতা দিয়েই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়। তবে মামুনুর রশীদের কিন্তু ইচ্ছা ছিল গায়ক হবার। তবলা শিখছিলেন, নিয়মিত গলা ছেড়ে গান গাওয়া শুরুও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা একটু কনজারভেটিভ মানুষ ছিলেন, ফলে, বাবার অত্যাচারে সেই চর্চা আর দীর্ঘ করা যায় নি। তখনই গান ছেড়ে তিনি কবিতার দিকে ঝোঁকার চেষ্টা করেন। 'এর আগেই বল্লা গ্রামের স্কুলে পড়া অবস্থায় মামুনুর রশীদের অভিষেক ঘটে ক্ষুদে অভিনেতা হিসেবে। সতীনাথ স্যারের হাত ধরে চৌকি দিয়ে বানানো মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেছিলেন মামুনুর রশীদ *বিজয় সিংহ* নাটকে। অর্থাৎ নাটকের মামুনুর রশীদ-এর যাত্রা তাঁর স্কুল শিক্ষকের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল।'[৬৫]

মামুনুর রশীদ মাধ্যমিক পাশ করেন ১৯৬৩ সালে, টাঙ্গাইল বল্লা করনেশন হাই স্কুল থেকে। এর পর তাঁর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় ঢাকায়। এবং তখন থেকেই মামুনুর রশীদ ধীরে-ধীরে হয়ে ওঠেন নাটকের মামুনুর রশীদ। মাধ্যমিকের পর মামুনুর রশীদ ভর্তি হন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অল্প কদিনেই তাঁর মনে হয়েছিল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রসপেক্ট নেই। এটা ১৯৬৩ সালের কথা। তারপরই ঢাকা কলেজে ভর্তি হন একাদশ শ্রেণিতে। মাধ্যমিকের পরে পলিটেকনিক-এ ভর্তি হলেন। এখানে মামুনুর রশীদের শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন– রাকিব উদ্দিন, অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদের স্বামী। নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদারের বড় ভাই রণেন্দু

---

৬২. এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা ১৯৭২-২০০০* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০), পৃ. ৭১।

৬৩. ফয়েজ জহির ও হাসান শাহরিয়ার, *মামুনুর রশীদ : থিয়েটারের পথে* (ঢাকা : বাঙলা পাবলিকেশনস্, ২০১৬), পৃ. ১৫।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

মজুমদার, উনিও তখন পলিটেকনিকের শিক্ষক। ওনারা সবাই নাট্যনুরাগী ছিলেন এবং নাটক নিয়ে খুব ভাবতেন। মামুনুর রশীদের তখন মনে হতো, নাটক নিয়ে আবার ভাবার কী আছে। পলিটেকনিকে প্রচুর সাংস্কৃতিক কাজকর্ম হতো। 'সেখানেই এক সময় মামুনুর রশীদ নবীন-বরণ অনুষ্ঠানে একটা নাটক লিখে ফেললেন। এখানকার আরেক নাট্যব্যক্তিত্ব আবুল কাশেম তখন পলিটেকনিকের শিক্ষক। তিনি নাটকটি পড়ে তাঁকে উৎসাহিত করলেন। ঐ নাটকটা তখন বেশ সাড়া ফেলেছিল। এর পর পলিটেকনিকেই আরও কয়েকটি নাটক লিখেছেন তিনি, কিন্তু সেগুলোর মান নিয়ে মামুনুর রশীদের ছিল যথেষ্ঠ সন্দেহ।'[৬৬] মামুনুর রশীদ যখন ছোটবেলায় যাত্রা বা থিয়েটার দেখতেন, তখনই ভাবতেন– এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে নিশ্চয়ই একজন মানুষ আছে যিনি এটা লিখেছেন। তার মানে ঐ পেছনের মানুষটা তো দারুণ ক্ষমতাবান। মামুনুর রশীদ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মনে করেন– 'সেখান থেকেই হয়তবা তিনি নাটক লেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হন। তারপর থেকে নাটকের ওপর তিনি বেশি-বেশি পড়াশোনা করতে থাকেন।'[৬৭] পলিটেকনিক-এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হন মামুনুর রশীদ। ডিসকন্টিনিউ করে এক সময় পাশ করে বেরুলেন তিনি। মামুনুর রশীদের মঞ্চনাটকের মানস গঠন মূলত শুরু হয় তখন থেকেই, যখন তিনি পলিটেকনিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝামাঝি সময়টা পার করছিলেন। সেই সময় তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, 'কোথাও নাটক করা যায় কিনা। নাটক মানে মঞ্চনাটক। টিভি নাটকে তো তখন তাঁর রমরমা অবস্থা। একটা টেলিভিশন নাটক লিখে আয় করেন ৪৮০ টাকা। যা কিনা একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বেতনের সমান প্রায়।'[৬৮]

মামুনুর রশীদ খবর পেলেন, আসকার ইবনে শাইখ মঞ্চ নাটকের সথে যুক্ত। তখন থেকেই তিনি আসকার ইবনে শাইখের পেছন-পেছন ঘুরতে লাগলেন। এবং কিছু দিনের মধ্যেই নাট্যকার-নির্দেশক-সংগঠক আসকার ইবনে শাইখের 'সহকারী নির্দেশক' হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। 'মামুনুর রশীদ আসলে ততদিনে টেলিভিশনে নাটক লেখার সুবাদে অনেকের কাছেই পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। মুনীর চৌধুরী, মুস্তফা মনোয়ার, নুরুল মোমেন আরও অনেকের সাথেই তখন পরিচয় ঘটে তাঁর।'[৬৯] ঐ সময় একে-একে অনেকের সাথে পরিচয় ঘটতে শুরু করলো। ড্রামা সার্কেলের কোনো নাটক দেখার সুযোগ না ঘটলেও বজলুল করিমের সাথে পরিচয় হলো। টেলিভিশনে লেখার সুবাদে আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, আবদুল্লাহ আল-মামুন, মুস্তফা মনোয়ার, জিয়া হায়দারদের সাথে পরিচয় হয়েছে আগেই। তাঁদের মধ্যেও মঞ্চনাটক নিয়ে অনেক ভাবনা তিনি টের পেতেন। তখন 'উল্টোরথ' নামে একটা পত্রিকা আসতো কলকাতা থেকে, তার মাধ্যমে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের কাজের কথা জানা হতো। এছাড়াও কলকাতা থেকে যারা আসতেন, তাদের কাছে মঞ্চনাটকের গল্প

---

৬৬. ফয়েজ জহির ও হাসান শাহরিয়ার, *মামুনুর রশীদ : থিয়েটারের পথে* (ঢাকা : বাঙলা পাবলিকেশনস্, ২০১৬), পৃ. ১৫।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

শুনতেন। এভাবেই মঞ্চনাটক করার ব্যাপারে মামুনুর রশীদের মানস গঠন প্রক্রিয়া চলছিল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই মঞ্চনাটকের একজন সহকারী নির্দেশক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। চীন-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতির ব্যানারে আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমামের নির্দেশনায়, বুলবুল আহমেদ, নাজমূল হুদা বাচ্চু অভিনীত *লাল লর্ন্ঠন* [৭০] নাটক দিয়েই মূলত মামুনুর রশীদের মঞ্চনাটকের সাথে পুনরায় সম্পৃক্ততা শুরু।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মামুনুর রশীদ যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে সাক্ষাৎ মেলে মুস্তফা মনোয়ার, হাসান ইমাম, আশরাফুল আলম, শহীদুল ইসলাম, মুস্তফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ আল ফারুক, আব্দুল জব্বার, জামিল চৌধুরী, বাদল রহমান ও স্বাধীন বাংলার নিউজ কাস্টার আলী যাকেরের সাথে। মুস্তফা মনোয়ার বল্লেন– চলো নাটক করি। মামুনুর রশীদ যেন প্রতিধ্বনি ছুঁড়ে দিলেন– 'চলেন করি। লেখা হয়ে গেল মামুনুর রশীদের প্রথম পরিপূর্ণ মঞ্চ নাটক *পশ্চিমের সিঁড়ি*। তবে *পশ্চিমের সিঁড়ি*–র অনেকদিন মহড়া চললেও তা মঞ্চ পর্যন্ত গড়ায় নি।'[৭১] এই সময় কলকাতায় অনেক মঞ্চনাটক দেখা আর অনেক মঞ্চনাটকের মানুষের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল মামুনুর রশীদের। এঁদের মধ্যে উৎপল দত্ত ছিলেন তাঁর কছে একটা বিস্ময়। উৎপল দত্তের *টিনের তলোয়ার* নাটকটি মামুনুর রশীদ ও মুস্তফা মনোয়ার একসাথে দেখেছিলেন। এই নাটক দেখে মামুনুর রশীদ রীতিমতো অভিভূত। তারপর অন্যান্য নাটকও দেখেছেন, পড়েছেন। কেবল উৎপল দত্তের না শম্ভু মিত্রের নাটকও দেখেছেন তিনি। *ডলস হাউজ*–র অনুবাদ *পুতুল খেলা* ও *পাগলা ঘোড়া* দেখেছেন। আরও দেখেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় তাঁকে বেশ মুগ্ধ করেছিল। কলকাতায় মুক্তাঙ্গন নামের একটা জায়গায় নাটক হতো, সেখানেও নাটক দেখেছেন তিনি।

এসবকিছু মিলিয়ে আসলে মঞ্চনাটক করতে হবেই, এমন একটা ব্যাপার তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করেছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে পরবর্তী সময়ে মঞ্চনাটকের মানুষ হওয়ার পেছনে উৎপল দত্তের প্রভাবই বেশি। উৎপল দত্তের একটা কথা এখনও তিনি স্মরণ করেন। উৎপল দত্ত বলতেন– 'আই এ্যাম নট এন আর্টিস্ট, আই এ্যাম এ প্রোপাগান্ডিস্ট। মামুনুর রশীদ স্বীকার করেন, তিনিও নিজেকে আসলে একজন প্রচারকই মনে করেন।'[৭২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে শুধু একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়েছিল তাই নয়। 'সুদীর্ঘ দিন ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থেকে যে বোধ ও স্বপ্নগুলো চাপা পড়েছিল সেগুলোও নতুন করে উজ্জীবিত হবার একটা সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল। সেই সম্ভাবনার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়েই বাংলাদেশে শুরু হয় শহুরে মঞ্চ নাট্যচর্চা।'[৭৩] রনাঙ্গন থেকে ফিরে আসলেন মুক্তিযোদ্ধারা। এর পরপর অর্থাৎ ১৯৭২ সালেই ঢাকায় কয়েকটি

---

[৭০] ফয়েজ জহির ও হাসান শাহরিয়ার, *মামুনুর রশীদ : থিয়েটারের পথে* (ঢাকা : বাঙলা পাবলিকেশনস্, ২০১৬), পৃ. ৫১।
[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭।
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
[৭৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

নাট্যদলের উত্থান ঘটে। গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে– আরণ্যক নাট্যদল, নাট্যচক্র, থিয়েটার, বহুবচন, প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যগোষ্ঠী'র আগমন ঘটে। মামুনুর রশীদের দলের নাম 'আরণ্যক নাট্যদল'। দলের নামের ব্যাপারে ছোট্ট একটা গল্প স্মরণ না করলেই নয়। স্বাধীনতার পরও মামুনুর রশীদের টেলিভিশনে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আবদুল্লাহ আল-মামুন তখনও প্রযোজক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। একদিন মামুনুর রশীদ আবদুল্লাহ আল-মামুনের সাথে কথা বলছিলেন নাটকের দল করা নিয়ে। দলের একটা নাম দেয়ার জন্য আবদুল্লাহ আল-মামুনকে অনুরোধ করতেই তিনি বল্লেন– 'নাগরিক' তো আছেই, তোমরা 'আরণ্যক' হয়ে যাও। ব্যস, তারপরই মামুনুর রশীদের নাটকের দলের নাম হয়ে গেল 'আরণ্যক' নাট্যদল। প্রতিষ্ঠাকাল ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।'[৭৪] এবং এই দলের কাঠামোতে মামুনুর রশীদের সাথে ছিলেন– 'আলী যাকের, সুভাষ দত্ত, ড. ইনামুল হক, মুজিব বিন হক ও নাজমুল হুসাইন।'[৭৫] স্বাধীনতার পর আরণ্যক নাট্যদলই প্রথম মঞ্চনাটকের স্বাদ দেয় দর্শককে। '১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মামুনুর রশীদের নির্দেশনায়, মুনীর চৌধুরী রচিত *কবর* নাটকটির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্যচর্চার শুরুটা হয়ে গেল।'[৭৬]

এই পৃথিবীতে যেদিন থেকে নাট্য-নির্দেশকের আবির্ভাব হয়েছে তারপর থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে নির্দেশকের মাধ্যম এবং নির্দেশক একটি নাটককে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। তবে এক্ষেত্রে একজন ভাল নির্দেশক হতে হলে যে-যে বিষয়গুলো রপ্ত করা দরকার তা হলো– 'নির্দেশককে পড়তে হবে, তাঁকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।'[৭৭] অর্থাৎ একজন ভাল নাট্য-নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে হরে– 'সততা', 'নিষ্ঠা' এবং 'সাধনা'র কোন বিকল্প পথ নেই বলে মনে করেন মামুনুর রশীদ । তাছাড়াও একজন নাট্য-নির্দেশক হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভব করেন মামুনুর রশীদ। তিনি বলেন :

> নির্দেশকের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নাট্যকার তো দর্শকের সামনে উপস্থিত থাকেন না। থাকেন অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং এদের পরিচালনায় যিনি থাকেন সে নির্দেশক। তাহলে দর্শকের মুখোমুখি তো দাঁড়াল নির্দেশক। নির্দেশকের যদি সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকে তাহলে নাটকটা উল্টো হতে পারে। কারণ এখানে চরিত্রের ব্যাখ্যা করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন সে ব্যাখ্যাটা আমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে করব? সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে করতে পারি।

---

[৭৪] ফয়েজ জহির ও হাসান শাহরিয়ার, *মামুনুর রশীদ : থিয়েটারের পথে* (ঢাকা : বাঙলা পাবলিকেশনস্‌, ২০১৬), পৃ. ৬৩।

[৭৫] মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১৭৫।

[৭৬] ফয়েজ জহির ও হাসান শাহরিয়ার, *মামুনুর রশীদ : থিয়েটারের পথে* (ঢাকা : বাঙলা পাবলিকেশনস্‌, ২০১৬), পৃ ৬৩।

[৭৭] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

> একটা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দেশের অভ্যন্তরের যে শ্রেণিসংগ্রাম থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণি যখন এক সমাজে থাকে তখন তাদের মধ্যে ভাবনাগুলো, সংঘাতগুলো, দ্বন্দগুলো, স্বপ্নগুলো প্রতিনিয়ত চলমান। একজন শিল্পীর এই চলমান ঘটনাগুলোর উপলব্ধি প্রয়োজন। সেটাকে বোঝায় দায়দ্ধতা যা একজন নির্দেশক বা যেকোন নাট্যকর্মীর থাকা উচিৎ। তবে নির্দেশকের দায়বদ্ধতা সবচেয়ে বেশি। আমরা যারা নির্দেশনা দেই তারা কাজটা করি 'প্রফেশনালী'। একটা প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গিতে, দক্ষতার ভিত্তিতে কাজ করি। তবে আমরা যারা নির্দেশনার কাজ করি তারা কিন্তু প্রফেশনাল নই। এ থেকে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি না। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একত্রিত করে রাখা, কাজে উৎসাহ যোগান এ কাজটাও কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আসে। এখানে একটা নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে। সেই নেতৃত্ব যদি সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ না হয় তাহলে সে দল পরিচালনা করবে কী ভাবে? দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কী করে? একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অনুপ্রাণিত করবে কী করে? এবং সেই সঙ্গে একজন দর্শককে অনুপ্রাণিত করবে কী করে? কাজেই আমাদের দেশে যারা নির্দেশকের কাজটা করি তারা নেতৃত্বের কাজটাও করি। এখন নেতৃত্বের কাজ করতে গেলে সেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। যেখানে যোগ্যতার খুব প্রয়োজন।[৭৮]

উপর্যুক্ত উক্তির মধ্যদিয়ে মামুনুর রশীদ নাট্য-নির্দেশনায় নির্দেশকের 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি 'শ্রেণিসংগ্রামে'র কথা উল্লেখ করে সামাজিক দায়বদ্ধতায় নির্দেশককে সচেতন হতে বলেন। কারণ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেনির মধ্যে ভাবনা, সংঘাত, দ্বন্দ, স্বপ্ন প্রতিনিয়ত চলমান এবং এই চলমান ঘটনাগুলো উপলব্ধি করতে পারলেই নির্দেশক তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং সেই সঙ্গে চরিত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে হলে একজন মানুষের 'নেতৃত্বের' গুণ থাকতে হয়। যা একজন নাট্য-নির্দেশকের জন্য আবশ্যক। এই 'নেতৃত্ব গুণ' অবশ্যই নাট্য-নির্দেশককে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অনুপ্রাণিত করতে, দর্শককে অনুপ্রাণিত করতে এবং সর্বোপরি একটি দল/সংগঠন পরিচালনা করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং মামুনুর রশীদ তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় নির্দেশক-দর্শক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে একটি দেয়া-নেয়ার বৃত্ত রচনা করতে চান। যেখানে নির্দেশকের দায়বদ্ধতা খুব প্রয়োজন।

মামুনুর রশীদ নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রোপাগান্ডাকে প্রাধান্য দয়িয়ে থাকেন। তিনি বলেন– 'আমার কাজে শিল্পের মোড়কে একটা প্রচার থাকে। তবে সেক্ষেত্রে কাজটা কতটা সমাজ বাস্তবতা ও দর্শকের মনস্তত্ত্বের সাথে

---

[৭৮] এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা* ১৯৭২-২০০০ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০), পৃ. ১৭৮-১৭৯।

সম্পর্ক রচনা করতে পারল সেটা আপেক্ষিক। অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যদিয়ে যে শক্তি বা এনার্জি দর্শকের মধ্যে প্রবাহিত হয় সেটা যদি শক্তিশালী না হয় তবে সেই নাটক ব্যর্থ হবে, কেউ সে নাটক দেখবে না। যখন দর্শক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে দেয়া-নেয়ার একটা বৃত্ত তৈরি হয়ে যায় তখন নিশ্চই সম্পর্ক রচনা করে। যখন এই বৃত্ত তৈরি হয় না তখন পুনরায় মহড়ায় ফিরে আসি। এবং নির্দেশনার প্রক্রিয়াটা পরিবর্তন করে নতুনভাবে মঞ্চায়ন করি।'[৭৯] সুতরাং মামুনুর রশীদের বক্তব্য থেকে উপলোব্ধি করতে পারি যে তিনি শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নাট্য-নির্দেশনা প্রোপাগান্ডা পরিচালনা বিশ্বাসী। তিনি নাট্য-নির্দেশনায় দর্শকের মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্ক রচনা করতে চান। কিন্তু সে বিষয়টি আপেক্ষিক তাই তিনি নাট্য-নির্দেশনা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে পরবর্তি প্রদর্শনীতে গিয়ে লক্ষ্য করেন এবার দর্শকের সাথে নাটক সম্পর্ক রচনা করতে পারছে কিনা। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর 'স্বতঃস্ফূর্ততা'কে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন অভিনেতা-অভিনেত্রী স্বতঃস্ফূর্ত থাকলে প্রতি প্রদর্শনীই নতুন রূপ লাভ করে।

মামুনুর রশীদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতীয় দর্শন, মার্কসীয় দর্শন, রাসেলের দর্শন, জ্যাঁ পল স্যার্ত্রের দর্শন সবই তাঁর কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মামুনুর রশীদের দার্শনিক অবস্থাটা এই সবগুলো দর্শন থেকেই এসেছে। তবে তিনি কোনোটাকেই সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে কাজ করতে-করতে একজন নির্দেশকের দর্শন সৃষ্টি হয়। মামুনুর রশীদের কাছে শিল্প-ভাবনাটাও বিচ্ছিন্ন। এ্যারিস্টটলের–কাব্যতত্ত্ব, অগাস্ত বোয়ালের–থিয়েটার অব দ্যা অপ্রেস্ট, গ্রামসিসহ অনেক দার্শনিকের শিল্প ভবনা মামুনুর রশীদের নাট্য ভাবনায় যুক্ত হয়েছে। তবে তিনি কোনো শিল্প ভাবনাই হুবাহু গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন– 'কোনো শিল্প ভাবনা বা দর্শন আমাকে গ্রাস করতে পারে নি। আমি শিল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শন ও শিল্প-ভাবনা গ্রহণ করেছি।'[৮০] তার মানে মামুনুর রশীদের নাট্য ভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পভাবনা ও দর্শনের মিশ্রণে তাঁর মধ্যে একটা 'মিশ্র ভাবনা' তৈরি হয়েছে।

নাট্য-নির্দেশনায় পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মামুনুর রশীদ প্রথমত সামাজিক ঘটনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি যে দলে কাজ করেন সে দলের একটা শ্লোগান হলো– 'নাটক শুধু বিনোদন নয় শ্রেণি সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার'। এ ধরনের শ্লোগান নিয়ে অনেকেই বলে নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার কিন্তু নাটক তো বিনোদন, নাটক যদি তার নান্দনিক প্রয়োজনগুলো না মেটায় তাহলে প্রথমত এটার স্থায়িত্ব থাকে না। আবার শুধু যদি বিনোদন হয় তাহলেও মানুষ হাসে। কাজেই এক্ষেত্রে কাজটা কঠিন। মামুনুর রশীদ বলেন :

[৭৯] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

[৮০] প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

এটাই নাটকের মজার বিষয়। নাটকের প্রতি মানুষের যে বিনোদনের প্রত্যাশা বা নাটকে মানুষ যে বিনোদন চায় সেটা নির্দেশককে দিতে হবে। পাশাপাশি যে মূল্যবোধের লড়াই করছি, আমরা যে মুক্ত সমাজের জন্য কাজ করছি বা শৃঙ্খলাযুক্ত সমাজের যে চেষ্টা করছি সে বিষয়টাও থাকতে হবে। দুটো পরস্পর বিরোধী। এমন পরস্পর বিরোধী দুটো বিষয় একসঙ্গে নিয়ে আনার চেষ্টা করছি। কাজেই পাণ্ডুলিপি নির্বাচনটাও খুব কঠিন কাজ। যে কারণে আমাদের দলের অধিকাংশ নাটক আমার লেখা না হয় আব্দুলাহেল মাহমুদের নয় মান্নান হীরার লেখা। গত ৩০ বছর পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যে শ্রেণিসংগ্রাম ৭২-৮০ সাল পর্যন্ত ছিল, সেই শ্রেণিসংগ্রামও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাখ্যার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। আমি বাংলাদেশের একজন নাট্যকর্মী হিসেবে আমার ভূমিকাই কী হবে? সারা বিশ্বে এর একটা প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাবের মধ্যে আমরা কিন্তু পরিস্থিতিকে বিবেচনায় এনে কাজ করছি। সেই কাজটা এক ধরনের শৈল্পিক। আমাদের নাটক নির্বাচনের কৌশলটা কিংবা ভাবনাটাও কিন্তু সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক যে ভাবনা, সে ভাবনা দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত। কিন্তু এখানে নান্দনিকতার ব্যাপারটাও ছাড় দিতে চাই না। যাতে আমাদের নাটক রক্ত-মাংসের গড়া প্রাণহীন হতে না পারে। কাজেই যখন প্রাণের স্পন্দনও আমরা বইব তখন নান্দনিকতাটা একটা জরুরি বিষয় হয়ে পড়ে।[৮১]

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে স্পষ্ট হয় যে, মামুনুর রশীদ যে দল/সংগঠনের সদস্য সেই দলের শ্লোগান হচ্ছে, 'নাটক শুধু বিনোদন নয়, শ্রেণি সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার'। অতএব এই শ্লোগানের মধ্যদিয়েই মামুনুর রশীদের নাট্য-চিন্তা প্রকাশিত হয়। তাই তো পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এর প্রোভাব প্রতীয়মান হয়। তার মানে মামুনুর রশীদ 'পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে'র ক্ষেত্রে শুধু শ্রেনিসংগ্রামকেই প্রাধাণ্য দিয়েছেন এমন নয়। তিনি পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে দর্শকের 'বিনোদনে'র প্রত্যাশাও কোনোভাবে ক্ষুণ্ন করেননি। তিনি সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনকে মাথায় রেখে দলিয় প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিও রক্ষা করে নাটক নির্বাচন করেছেন। যে কারণে দুই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আরণ্যক নাট্য দল তথা মামুনুর রশীদের নাটক হয় তাঁর নিজের লেখা না হয় তাঁর দলের আব্দুল্লাহেল মাহমুদের নয় মান্নান হীরার লেখা। অতএব শ্রেণি সংগ্রাম, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নান্দনিকসহ সব দিক বিবেচনা করে মামুনুর রশীদ পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন।

কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়াই মামুনুর রশীদ নাটক নির্বাচন করে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন– 'একটা গল্প, ভাবনা বা কোন মহামানবের জীবনী থেকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। সেটা হতে পারে আমার নিজের লেখা

[৮১] এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা ১৯৭২-২০০০* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০), পৃ. ১৭৯।

বা অন্য কোনো নাট্যকারের ভালো পাণ্ডুলিপি আমি গ্রহণ করি। এরকম চিন্তা-ভাবনা থেকেই আমরা পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করি। সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করি না।'[৮২] তবে মামুনুর রশীদ মনে করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বা পাণ্ডুলিপি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর এর প্রয়োজনেই সুনির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ মামুনুর রশীদ বলেন– 'একটা দিয়েশলাইয়ের যদি আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা না থাকে তাহলে সেই দিয়েশলাইয়ের কোনো মূল্য নেই। তেমনি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর ক্ষমতা বা মূল্য না থাকলে সেই পাণ্ডুলিপিটিরও কোনো তাৎপর্য নেই।'[৮৩]

উপর্যুক্ত অভিমতের মধ্যদিয়ে নাট্য-নির্দেশনায় মামুনুর রশীদের পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করলেও পাণ্ডুলিপির– বিষয়বস্তু, ক্ষমতা বা মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেন নি। যে পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর 'ক্ষমতা' বা 'মূল্যমান' নেই তিনি সেই পাণ্ডুলিপি নির্দেশনার জন্য গ্রহণ করেন নি। তাই মামুনুর রশীদ মনে করেন নাট্য-নির্দেশনায় নির্দেশককে পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই সচেতন থাকতে হয়। কারণ নির্দেশকের সফলতা অনেক ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর মামুনুর রশীদ পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করাণ। পর্যায়ক্রমে তিনি বুঝতে পারেন যে, নাটক পাঠের প্রেরণাটা তৈরি হলো কিনা অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে। তারপর তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে একটা কর্মশালা পরিচালনা করেন। এই কর্মশালাটি প্রায় তিন মাস ধরে পরিচালিত হয়। কর্মশালায় যেটা হয় সেটা তাঁর নাট্য-নির্দেশনার কাজকে অনেক দূর এগিয়ে দেয় বলেই তাঁর ধারণা। এবং এই কর্মশালার প্রক্রিয়ার মধ্যেই তিনি তাঁর নাটকের 'বিশ্লেষণ' এবং 'চরিত্রায়নের' কাজগুলো করে থাকে। যেমন– মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক, যুদ্ধে কী কী ঘটনা ঘটেছে এগুলো শারীরিক ভাবে উপলব্ধি করাণ। পাশাপাশি নাটকের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তিনি তৈরি করে দেন। ফলে তাঁর নির্দেশনার পদ্ধতিগত কারণে তিনি নাটকের পাণ্ডুলিপিটাকে আলাদা করে রেখে দেন কিন্তু এই কর্মশালাটা চলতে থাকে ঐ নাটককে কেন্দ্র করেই। এভাবে সবার মানস ভুবনে ঐ বিষটা ঢুকে যায়। যেমন– তিনি *সঙক্রান্তি* নাটকটি যখন করেন তখন 'সঙ' পরিবেশনাটি যেখানে হয় সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে গিয়ে তা দেখিয়েছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী রাত-ভর সঙ দেখেছে এবং দেখে সেখান থেকে একটা প্রেরণার জায়গা তৈরি হয়েছিল বলেই তাঁর ধারণা। পুনরায় কর্মশালা চলতে থাকে। মহড়া চলাকালে সমস্ত কলা-কুশীলবদের মঞ্চের পাশঘিরে দাঁড়ানো অবস্থাতেই রাখতে তিনি পছন্দ করেন। কারণ তিনি মনে করেন তাতে করে কলা-কুশীলবদের মধ্যে এক ধরনের গতি তৈরি হয়।

৮২. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।
৮৩. প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

‘মহড়ায় মামুনুর রশীদ কখনই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ মুখস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করেন না। কারণ তিনি মনে করেন আগে মানুষটা তার দেহকে কাজের উপযোগী করবে। পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে তিনি সংলাপটা বসাবেন এবং সংলাপটা তার মধ্যদিয়েই বেড়িয়ে আসবে। তিনি মনে করেন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ‘চরিত্র’টা আগে তৈরি হোক তারপরে সংলাপ। তবে সাত দিনেই নাটক মুখস্থ করতে হবে, কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্বে চরিত্র তৈরি হওয়ার পরে একটু-একটু করে সংলাপ মুখস্থের কাজ চলতে থাকে।’[৮৪]

নাটকের ‘চরিত্র নির্বাচনে’ মামুনুর রশীদ সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। একেক সময় একেকভাবে ‘চরিত্র নির্বাচন’ করে থাকেন। কখনো-কখনো মহড়ার প্রথম দিনেই চরিত্র নির্বাচন করে ফেলেন। আবার কখনো-কখনো বেশ কিছু সময় নিয়ে চরিত্র নির্বাচন করেন। তিনি গ্রুপের সবাইকে দিয়ে চরিত্র নির্বাচনের অডিশন নিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, ‘সবাইকে সুযোগ না দিলে গ্রুপের সাংগঠনিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। সবার কাজ দেখে পরে চরিত্র নির্বাচন করেন।’[৮৫] মাঝে-মাঝে কর্মশালার মাধ্যমে নাটকের চরিত্র নির্বাচনের বিষয়টি নির্ধারণ করে থাকেন। কর্মশালায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দক্ষতা প্রকাশ পায়। তিনি যখন বুঝতে পারেন কার মধ্যে কোন ধরনের অভিনয় দক্ষতা আছে সে মোতাবেক তখন তিনি সেখান থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তুলে আনার পর তাঁর পক্ষে নাটকের চরিত্র নির্বাচন করতে আরও সহজ হয়ে যায়। চরিত্র নির্বাচনের পূর্বেই মামুনুর রশীদের অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক চলনের ওপর এবং শারীরিক ভাষার ওপর কর্মশালা শেষ করেছেন। এতে করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মানসিক স্তর তৈরি হয়। তখনো কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে যাননি। তারপর পাণ্ডুলিপির পাঠ শুরু হলো। প্রথমত মামুনুর রশীদ নাট্য-নির্দেশনায় বডি ল্যাংগুয়েজটা বের করেন। তারপরে বের করেন ভাষা। আগে চরিত্রটা বের করেন। চরিত্রের চলন, বলন এবং ম্যানার এগুলো নিয়ে কাজ করেন। তারপর সংলাপে প্রবেশ করেন। চলনের পর তিনি ব্লকিং নিয়ে কাজ করেন। এই প্রক্রিয়াটা যখন চলতে থাকে তখন তিনি নিজেকেও কিছুটা সমর্পণ করে ফেলেন। ওখান থেকে ধীরে-ধীরে চরিত্রগুলো বিনির্মিত হতে থাকে। একটা চলনের পর আরেকটা চলন আসছে, দেখা গেল যে, একটা পর্যায়ে এসে চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি সম্পূর্ণ দৃশ্যটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। প্রথমবারের মতো হয়তো এখানেই সমাপ্ত করেন। পরের দিন আবার প্রক্রিয়াটি কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়। এভাবে মহড়া চলতে-চলতে সংলাপ তৈরি হয়ে গেলে তারপর তিনি রান-থ্রুতে চলে যান। নির্দেশনা পক্রিয়ায় মামুনুর রশীদ মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কল্পনাশক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নির্দেশনা পরিচালনা করে থাকেন। মামুনুর রশীদ বলেন :

---

৮৪. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১২০-১২১।

৮৫. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

> আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে ‘চরিত্র’ ও ‘ক্রিয়া’ নিয়ে অনেক বেশি বিশ্লেষণ করি। যেমন– *সঙক্রান্তি* নাটকে কর্ণেট-টা হারিয়ে গেছে এবং পরে সেটা ফিরেও পেয়েছে। এই কর্ণেট-টা অভিনেতা কী ভাবে ধরবে সেটা হলো ‘ক্রিয়া’। এই ক্রিয়াটা নিয়ে সাত-আট দিন মহড়া চলছে। কর্ণেট-টা ধরতে হবে নবজাতক শিশুর মতো কিন্তু সে হারানো সন্তান। এই ক্রিয়াটা সম্পন্ন করতে আমাকে অনেক সময় দিতে হয়েছে। এই ক্রিয়ার সাথে-সাথে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্রেন-স্টরমিং হচ্ছে, বিশ্লেষণ হচ্ছে এবং সাথে-সাথে মহড়া এগিয়ে চলছে। এভাবে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে সংযুক্ত হই। তবে আমি অযথা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ‘ক্রিয়া’ থামাতে পছন্দ করি না। আমি মনে করি আমার পদ্ধতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। মাঝে-মাঝে কিছু বিষয় আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর ছেড়ে দেই। যে কারণে আমার নির্দেশিত নাটকে চরিত্ররা ভিন্ন-ভিন্ন থাকে। সবাই এক রকম নয়। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর জোর দিয়ে বলি তুমি তোমার অভিনীত চরিত্র বের করো। আমার নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে আমি তিন মাস ধরে যে কর্মশালা পরিচালনা করতাম তা এখন আর করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সময় কমে গেছে। তারা ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাদেরকে নিয়ে ঢাকার বাইরে সুবিধা মতো কোথাও ক্যাম্প করছি। সেখানে সাত-আট দিন একস্থানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কর্মশালা করে থাকি। এখানে সবাই খুব মনযোগ দিয়ে কাজ করতে পারে। এই প্রক্রিয়াটা অভিনেতা-অভিনেত্রীর মানসিক প্রস্তুতিতে বেশ সহায়ক হয়েছে বলে আমার মনে হয়। বর্তমানে আমি এই প্রক্রিয়ায় নাট্য-নির্দেশনা পরিচালিত করছি।[৮৬]

এই অভিমতের মাধ্যমে মামুনুর রশীদের নির্দেশনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা লাভ করা যায় যা। যেখানে মহড়া পরিচালনার পূর্বেই তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে একটা কর্মশালা পরিচালনা করেন। এই কর্মশালাটিই হলো মামুনুর রশীদের নির্দেশনা প্রক্রিয়ার একটি স্বতন্ত্র দিক। এই কর্মশালায় তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক চলন এবং শারীরিক ভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এতে করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর বডি ল্যাংগুয়েজ ও মানসিক স্তর তৈরি হয়। বডি ল্যাংগুয়েজ মানে চরিত্রের ‘চলন’, ‘বলন’ এবং ‘ম্যানার’ এই বিষগুলোকে তিনি কর্মশালায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মামুনুর রশীদের কর্মশালা পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায় তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মঞ্চের পাশঘিরে দাঁড়ানো অবস্থাতেই রাখতে পছন্দ করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন কলা-কুশীলবদের মধ্যে এক ধরনের গতি তৈরি হয়। যা মামুনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনাকে প্রাতিস্বিক রূপ দান করে। পরবর্তীতে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে তিনি ‘বিশ্লেষণ’ এবং

---

[৮৬] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

‘চরিত্রায়নের’ কাজগুলো করে থাকে। তিনি তাঁর প্রক্রিয়ায় ‘চরিত্র’ ও ‘ক্রিয়া’ এই দুই বিষয়েই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যা দীর্ঘ আলাপচারিতায় জানা যায়। এছাড়া মামুনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনায় আরেকটি গুরুত্বপর্ণ দিক হলো তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ মুখস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করেন না। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো– ‘চরিত্র’। তিনি পূর্বে ‘চরিত্র বিশ্লেষণ’ করে সংলাপ তৈরি করতে চান। সর্বোপরি মামুনুর রশীদ অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতির দিকটি বিবেচনায় রেখেই মহড়া পরিচালিত করে থাকেন।

মামুনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনার মহড়া প্রক্রিয়ায় একটা বড় স্থান দখল করে রাখে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া (ইম্প্রোভাইজেশন ডিভাইস)। প্রযোজনা পূর্ব কর্মশালায় তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকেন। তবে পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর মহড়ায় তিনি পাণ্ডুলিপি এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে মহড়া সম্পন্ন করেন। মামুনুর রশীদ বলেন :

> আমি নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির সম্ভাব্য সংশোধন করে ইম্প্রোভাইজেশনে চলে যাই। ইম্প্রোভাইজেশন করার পর যদি পুনরায় দেখি পাণ্ডুলিপি কাজ করছে না তখন আবার পাণ্ডুলিপি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে থাকি। এভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে থাকি। নাটকের প্রয়োজনে এমনো হয়েছে যে, ইম্প্রোভাইজেশন করে দেখি একটা দৃশ্য তৈরি হচ্ছে না তখন সেই দৃশ্যটি বাদ দিয়েছি। আবার কখনো হয়েছে যে, দৃশ্যের একটি ইঙ্গিত নিয়ে দিনের পর দিন ইম্প্রোভাইজেশন করে মহড়া পরিচালনা করেছি। সেক্ষেত্রে সংলাপ বাদ দিয়ে ইঙ্গিত নিয়ে ইম্প্রোভাইজেশন করে থাকি। অবশ্য এই সমন্বয়টা নির্দেশককে করতে হয়। লিখিত পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করবে না ইম্প্রোভাইজেশন করবে এই সিদ্ধান্তটা নির্দেশককে মহড়ায় প্রতি মুহূর্তে নিতে হয়। আমি কখনই পাণ্ডুলিপির দাস নই। আবার তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ারও দাস নই। দুটোর সমন্বয় ঘটিয়ে আমি আমার নাট্য-নির্দেশনা পরিচালনা করে থাকি।[৮৭]

মামুনুর রশীদ কর্মশালায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে চরিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া (ইম্প্রোভাইজেশন ডিভাইস) নিয়ে কাজ শুরু করেন, যা উপর্যুক্ত উক্তির মধ্যদিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি লিখিত পাণ্ডুলিপি গ্রহণের পাশাপাশি ইম্প্রোভাইজেশন করে মহড়া পরিচালিত করে থাকেন। মামুনুর রশীদ-এর সাথে আলাপচারিতায় যানা যায় *সঙক্রান্তি* নাটকের ইম্প্রোভাইজেশন প্রক্রিয়ার কথা। যেখানে ‘কর্ণেট’-টা হারিয়ে গেছে এবং পরে সেটা ফিরেও পেয়েছে– এই হলো ‘ক্রিয়া’। যা নিয়ে মামুনুর রশীদ দীর্ঘ সময় ধরে

---

[৮৭]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

অভিনেতার সাথে ইম্প্রোভাইজেশন করে একটি সার্থক অবস্থানে উপনিত হয়েছিলেন। যে কারণে মামুনুর রশীদের নির্দেশিত নাটকে চরিত্ররা ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। মূলত মামুনুর রশীদ পাণ্ডুলিপি এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে মহড়া সম্পন্ন করেন।

সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাট্যকারের মতো একজন ভাল ও খ্যাতিমান নাট্য-নির্দেশক হওয়ার জন্য অনুশীলন ও চর্চার নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে বলে মামুনুর রশীদ মনে করেন। তিনি নির্দেশককে একজন কারিগর; শিল্পীর কারিগর হিসেবে দেখতে চান। মামুনুর রশীদ-এর সাথে আলাপনসূত্রে যানা যায়– 'নির্দেশককে প্রতি মুহুর্তে শিখতে হবে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তাকে শিখতে হয়। চলচ্চিত্র মাধ্যম থেকে তার শেখার আছে। বিভিন্ন লোক আঙ্গিক আছে, যেখান থেকে তার শেখার আছে। বিভিন্ন ধরনের শিল্প থেকে তার শেখার আছে। চিত্রকর্ম একটা শেখার বড় জায়গা। গানটা একটা শেখার জায়গা, করিওগ্রাফিও শেখার জায়গা। নির্দেশককে সারা পৃথিবীর কাছ থেকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যতো ধরনের জ্ঞান আহরণের জায়গা আছে সব জায়গা থেকেই শিখতে হয়। কিন্তু নির্দেশকের মূল জায়গাটা হচ্ছে থিয়েটার। থিয়েটারকে বুঝতে গিয়ে ডাক্তারি শিখতে হবে, শরীর বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সবই নির্দেশককে জানতে হয়। এবং নির্দেশকের স্থানটা হচ্ছে একটা সম্মানের জায়গা। নির্দেশকের মতো এমন একটি গুরু দায়িত্ব পালনে সংকল্পবদ্ধ হলে তাকে কিন্তু অনেক-অনেক কিছু জানতে হবে। পাশাপাশি তার যেটা সৃজনশীলতা এবং মৌলিকত্ব সে সব বিষয়ে নির্দেশককে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।'[৮৮] তবে নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন থাকতে হবে এমটা তিনি দাবি করেন না। আবার থাকলেও কোন আপত্তি নেই বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, 'নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকলে ভালো। তবে অনেক নির্দেশক আছেন যাঁদের সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে আবার অনেকেরই নেই। কেউ-কেউ একেবারে অন্য নিয়মানুবর্তিতা থেকে এসে থিয়েটারে কাজ করেন। এটা আসলে একটি আপেক্ষিক বিষয়। থাকলে ভালো না থাকলেও তেমন যায় আসে না।'[৮৯] মামুনুর রশীদ আরো বলেন– 'শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রী অনুকরণ করা শুরু করে। তখন নতুন ভাবনা সৃষ্টি হয় না। এটা সমস্যা তবে যারা এটা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির চেষ্টা করে সেটা ভাল। তবে প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম গুরুত্বপূর্ণ।'[৯০]

উপর্যুক্ত অভিমতের মধ্যদিয়ে মামুনুর রশীদ নির্দেশককে 'অনুশীলন', 'চর্চার', 'নিয়মানুবর্তিতা', 'নিরন্তর লেগে থাকা' ও 'অবিরাম চেষ্টা আর সাধনা' করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এই

---

[৮৮]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

[৮৯]. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১২৭।

[৯০]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

বক্তব্যসূত্রে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মামুনুর রশীদ নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে একদিকে নির্দেশকের 'জ্ঞান/শিক্ষা' অপরদিকে অভিনেতার 'নিয়মানুবর্তিতা' এ দুয়ের সমন্বয়ে এমন এক নাট্য-ভাষ্য তৈরির কথা বলতে চেয়েছেন, যেখানে নাট্যক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ হয়ে উঠতে পারে সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি পৃথিবীতে যতো ধরনের জ্ঞান আহরণের জায়গা আছে সব জায়গা থেকেই নির্দেশককে শিখতে উৎসাহিত করেছেন তবে 'অনুকরণ' বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। অনুকরণ না করে বরং মৌলিক ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে কাজ করতে নির্দেশকে আহ্বান করেছেন।

মামুনুর রশীদ নির্দেশনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ধারার কোনো পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙলা নাট্যের উপস্থাপনকে তিনি ফলপ্রসূ এবং উপযোগী বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের অনেক দিক থেকে চোখ খুলে দিয়েছে। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে, স্তানিস্লাভস্কির পূর্বে অভিনয়ের সূত্রের ওপর কোনো বই ছিল না, কোনো তত্ত্ব ছিল না। স্তানিস্লাভস্কি না জেনে অভিনয় করাই সম্ভব না। একেবারে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নির্দেশনা সূত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে বাঙলা নাটকের উপস্থাপনকে তিনি কোনো অশুভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন না। তিনি মনে করেন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য রীতিতে নাটক করলে খারাপ কিছু তো আর হচ্ছে না। যেমন তিনি প্রতিটি নাটকে স্তানিস্লাভস্কি চিন্তা করেন, তখন তিনি জাপানের কাবুকিও ব্যবহার করেছেন আবার এর পাশাপাশি দেশের যে লোকজ আঙ্গিক আছে, যেমন– যাত্রা, পাঁচালী, পালাগান, সংগীত ইত্যাদিও ভাবছেন। তিনি মনে করেন নির্দেশককে স্তানিস্লাভস্কির দাস হতে হবে না। তবে কেউ যদি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নির্দেশনা রীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে বাঙলা নাটককে উপস্থাপন করতে চান তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। নটক কখনই একভাবে হতে পারে না। মামুনুর রশীদ কাজের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতায় বিশ্বাস করেন। নির্দেশক আতাউর রহমানের মতো তিনিও নির্দিষ্ট তত্ত্ব-সূত্র অনুসরণ করেন না। কিন্তু প্রাচ্য–পাশ্চাত্য নির্দেশনা তত্ত্ব-সূত্রের আদলে তিনি তাঁর কাজের নিজস্ব একটা রীতি তৈরি করে নিয়েছেন। নাট্য-নির্দেশনার তত্ত্ব-সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে মামুনুর রশীদ যে মতামত দিলেন তা উপস্থাপন করা হলো– 'তত্ত্ব-সূত্রের ক্ষেত্রে আমি যেকোনো একটা তত্ত্ব-সূত্র অনুসরণ করি না। তবে হ্যাঁ পিটার ব্রুকের 'এমটি-স্পেস' তত্ত্ব আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। আবার ব্রেখট, মেয়ারহোল্ড তাদের মেথডও আমার কাছে খুব চিত্তাকর্ষক মনে হয়। সবগুলো তত্ত্ব-সূত্রই মাথায় থাকে কাজ করার সময়, আবার চাইনিজ অপেরাও ব্যবহার করেছি *জয় জয়ন্তী* নাটকে। কাবুকি ব্যবহার করেছি, আমাদের দেশের কীর্তনের আঙ্গিককে ব্যবহার করেছি। একটা তত্ত্ব-সূত্র ব্যবহার করবো কেন? আমি

প্রোসেনিয়াম মঞ্চ ব্যবহার করবো কেন? এই সবগুলো মিলেই আমার একটা নির্দেশনা পদ্ধতি তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে।'[৯১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে খুব সহজেই নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক মামুনুর রশীদের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে তিনি যেভাবে কাজটাকে দেখছেন সেটা অবশ্য তাঁর কাজের এক ধরনের সহজাত প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই কর্ম-প্রক্রিয়াকে নির্দেশকের স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' প্রয়োগ করেন কী না জানতে চাইলে তাঁর ব্যাখ্যায় স্ব-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি দাবি করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো মেথড অনুসরণ করেন না। বরং তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর নির্দেশনা কৌশলের তত্ত্বমূলে রয়েছে তাঁর 'সহজাত' তাত্ত্বিকদৃষ্টিভঙ্গি। তথাপিও তাঁর নির্দেশিত নাটক এবং নাট্য-বিষয়ক একাধিক আলোচনাসূত্রে লোকজ আঙ্গিক আছে, যেমন– যাত্রা, পাঁচালী, পালাগান, সংগীত ইত্যাদির পাশাপাশি ব্রেখট, স্তানিস্লাভস্কি, পিটার ব্রুক, বারবা, মেয়ারহোল্ড, গ্রোটস্কিসহ একাধিক তাত্ত্বিক অভিমত ব্যবহার করতে দেখা যায়। মূলত তিনি সব 'তত্ত্ব-সূত্র'কে প্রেরণা হিসেবে নিয়ে 'সহজাত' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

পাশ্চাত্যের মতো আমাদের নাট্যে, নির্দেশনার তত্ত্ব-সূত্র তৈরি অবান্তর না ভেবে বরং পাশাপাশি হাজার বছরের বাঙলা নাট্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বললে ভুল হবে না, যদি না বাঙলা নাট্যকর্মীরা তাদের নিষ্টা বা একাগ্রতার মধ্য দিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে নাট্য চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। এটা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের যে আমাদের এখানে তেমনটি হয়ে ওঠেনি। নাট্য-নির্দেশনার তত্ত্ব-সূত্রের নানাবিধ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে নির্দেশক মামুনুর রশীদ এই মত ব্যক্ত করেন যে, 'আজকের দিনে তত্ত্ব প্রতিমুহুর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। স্তানিস্লাভস্কির সব তত্ত্বের সম্পূর্ণ প্রয়োগ কিন্তু সবাই করছে না। আবার গ্রোটস্কিও আমাদের কাছে একটি বিরাট বিস্ময়। 'ফিজিক্যাল থিয়েটার'–এ পুওর থিয়েটার বিষয়টি তিনি নিজেই এখন আর বিশ্বাস করেন না বলে মনে করেন নির্দেশক মামুনুর রশীদ। সুজকি বলে একজন আছেন জাপানে তারও নানান তত্ত্ব-সূত্র আছে মার্শাল আর্ট এসব মিলিয়ে। কিন্তু তিনিও এখন পুরোনো হয়ে গেছেন। কিন্তু ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। পিটার ব্রুক-এর সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা সূত্র আছে বলে আমার মনে হয় না। তবুও পিটার ব্রুক আমার কাছে অনেক সম্মানের শুধু তাঁর কাজের মানোচ্চতার জন্য। তারপর আছেন বারবা তবে অগাস্ত বোয়াল হচ্ছে সবচাইতে বড় দৃষ্টান্ত। অগাস্ত বোয়ালও এক জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন কিন্তু আর

[৯১]. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১২৪।

সেই জায়গায় নেই। বরং তিনি এখন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন যে, আগের তত্ত্বগুলো ঠিক ছিল না। এখন সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটছে শুধু সময়ের প্রয়োজনে।’[৯২]

উপর্যুক্ত অভিমত আলোচনা সাপেক্ষে প্রতীয়মান হয় যে, মামুনুর রশীদ নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে– লোকজ আঙ্গিক, যেমন : যাত্রা, পাঁচালী, পালাগান, সংগীত ইত্যাদির পাশাপাশি ব্রেখট, স্তানিস্লাভস্কি, পিটার ব্রুক, বারবা, মেয়ারহোল্ড, গ্রোটস্কি, চাইনিজ অপেরা, জাপানের কাবুকি-এর ‘এ্যাকটিং মেথড’ বা তত্ত্বকে অভিনয়ের কার্যকর উপায় হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ‘নির্দেশনা-কৌশল’ (পঞ্চ-সূত্র) প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এই নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর (চরিত্রের) যৌক্তিক উপস্থিতি নির্ণয়ে ‘কৌশলগত পদ্ধতি’ বা সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই আলাপনসূত্রে নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর অবস্থান এরকম যে, নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কোনো ‘তত্ত্ব’ বা ‘মেথড’ অনুসরণ করে নয় বরং মেথড সম্পর্কিত সহজাত চিন্তা ও পদ্ধতির ‘অজান্তে’ প্রয়োগকেই কার্যত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই তিনি স্বাছন্দ বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ বলেন– ‘মূলত আমি সব তত্ত্ব-সূত্রই প্রেরণা হিসেবে নেই। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব-সূত্র দ্বারা প্রোভাবিত হয় নি বা তীব্র ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নি। সব তত্ত্ব-সূত্র মাথায় রেখে আমি আমার নাট্য-নির্দেশনার প্রক্রিয়া বা কৌশল পরিচালিত করি।’[৯৩]

ক্রমাগত মহড়া প্রক্রিয়ায় ব্লকিং ফাইনাল হলে মমুনুর রশীদ নির্দেশক হিসেবে ডিজাইনিং শুরু করেন। মামুনুর রশীদ বলেন– ‘অনেক অভিজ্ঞ নির্দেশক মহড়ায় বসে ডিজাইনিং সম্পন্ন করেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন, আমি পাণ্ডুলিপি পাঠের সময় ডিজাইন নিয়ে চিন্তা করি আর পরের অংশ করি মহড়া প্রক্রিয়ায় ব্লকিং ফাইনাল হলে।’[৯৪] মামুনুর রশীদের কাজে ডিজাইনিং মানে শুধু– মঞ্চ, পোশাক, আলোক, মেকাপ ও দ্রব্য-সামগ্রী নয়। তাঁর কাছে ডিজাইন মানে এ্যাকটিং ডিজাইন। মহড়া প্রক্রিয়ায় নির্দেশক মামুনুর রশীদ পুরো প্রক্রিয়াটা এক সাথে সঙ্গীকৃত করে নেন। তিনি বলেন– ‘পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর আমি সেই পাণ্ডুলিপির অভিনয় পদ্ধতি মেথড এ্যাকটিং-এর দিকে যাব না মেথড এ্যাকটিং-এর দিকে যাব না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেই। কেননা আমি মনে করি এ্যাকটিং মেথডের সাথেই যুক্ত নাটকের সব ডিজাইনিং প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে দ্রুততার সাথে সবকিছু নির্ধারণ করা সম্ভব। আমি *এবং বিদ্যাসাগর* নাটকে মেথড এ্যাকটিং ব্যবহার করেছি কিন্তু *রাঢ়াঙ* ও *চেরসাইকেল* নাটকে আবার মেথড এ্যাকটিং ব্যবহার করি নি। পাণ্ডুলিপি পাঠের

[৯২]. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১২৪-১২৫।

[৯৩]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

[৯৪]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৬-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

পর আমি সিদ্ধান্ত নেই এ্যাকটিং-টা কোন প্রক্রিয়ায় করবো। এর সাথে-সাথে আমাকে মঞ্চ নিয়েও ভাবতে হয়। আমি কি নাটকটা 'এমটি স্পেস' করবো না মঞ্চ তৈরি করে করবো। আমি লক্ষ্য করেছি অনেক সময় বাহুল্যপূর্ণ মঞ্চ পরিকল্পনা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দক্ষতা কমিয়ে দেয়। তাই আমি অর্ধেক পরিকল্পনা মহড়ার পূর্বে করি আর অর্ধেক পরিকল্পনা করি মহড়ার সময়। এইভাবে নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় ডিজাইনিং বিষয়ে আমার অভিযোজন ঘটে।'[৯৫] মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকের ডিজাইনারদের কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। কারণ তিনি মনে করেন স্বাধীনতা দিলে ডিজাইনার চিন্তা করার সুযোগ পায়। তিনি বলেন এই প্রক্রিয়ায় অনেক ডিজাইনার নতুন কিছু চিন্তা করতে পারে আবার অনেকে চিন্তা করতে পারে না। ডিজাইনারের নিজস্ব পরিকল্পনা হয়ে গেলে তাদের সাথে মামুনুর রশীদ তাঁর পকিল্পনাটা মেলানোর চেষ্টা করেন। এভাবে কথা বলে তিনি তাঁর নাটকে ডিজাইনিং করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ বলেন– 'আমি বেশির ভাগ সময়ই বাহুল্যপূর্ণ মঞ্চ পরিকল্পনা এড়িয়ে চলি। পোশাক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ডিজাইনারের সাথে বসে পোশাকের স্কেচ, কালার চার্ট ইত্যাদি দেখে নেই। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একটা পোশাক তৈরি করি। সেটার ওপর কাঁট-ছাট করে বাকীসব পোশাকগুলো তৈরি করি।'[৯৬]

এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে নির্দেশকের নির্দেশনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা লাভ করা যায়। এক নজরে তাঁর নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়– পাণ্ডুলিপি নির্বাচন, পাণ্ডুলিপি পাঠ, ব্লকিং, কম্পোজিশন, চরিত্রায়ণ, মঞ্চ পরিকল্পনা, পোশাক, আলোক ও আবহ সংগীত পরিকল্পনা এইরূপ ক্রম তিনি অনুসরণ করে থাকেন। তিনি 'এ্যাকটিং মেথড' বা তত্ত্বকে অভিনয়ের কার্যকর উপায় হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত 'নির্দেশনা-কৌশল' (পঞ্চ-সূত্র) প্রয়োগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। তিনি সহজাত ভাবেই 'নির্দেশনা-কৌশল' প্রয়োগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মামুনুর রশীদ সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেন । তিনি নির্দেশক ও ডিজাইনারদের মধ্যকার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। 'বস' প্রথাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। ডিজাইন তো একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম তাই তাকেও যথাযথ সম্মান দেখাতে তিনি কার্পন্য করেন না। এটাই তিনি কায়মনবাক্যে বিশ্বাস করেন। নির্দেশকের একার সিদ্ধান্তই সবকিছু নয় এক্ষেত্রে নির্দেশক ও ডিজাইনারদের মধ্যে বোঝা-পড়া থাকতে হয় বলে তিনি মনে করেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশিল হওয়ার পক্ষে মামুনুর রশীদ। নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্ক কাজের প্রক্রিয়ার কেমন থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর মামুনুর রশীদ বলেন :

[৯৫]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৬-০৬-২০১৬।
[৯৬]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৬-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

এক্ষেত্রে কোনো আদর্শ রূপ আমার নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নির্দেশক এক-এক প্রক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন। পূর্বে নির্দেশকরা যেটা বুঝতেন সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর চাপিয়ে দিতেন। সেটার ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে। কিন্তু আমি মনে করি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে নির্দেশকের সম্পর্ক হতে হবে সহজ-সরল। যাতে তারা সমস্যার কথা সহজভাবে ব্যাক্ত করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে। আমি অনেক নির্দেশককে দেখেছি যাঁরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর কথা একেবারেই শুনতে চান না। আমি সেরকম নির্দেশক নই। আমি বুঝি সব অভিনেতা-অভিনেত্রীর সীমাদ্ধতা থাকে। সেই সীমাদ্ধতাকে নির্দেশককে বুঝতে হয়। কখনো-কখনো সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব। আবার কখনো সম্ভব নয়। ক্রমাগত মহড়ার শেষ প্রান্তে গিয়ে অনেক সময় নির্দেশককে হতাশ হতে হয়। তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সীমাবদ্ধতাকে মেনে যতটুকু সম্ভব তার কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব তাই নিয়ে নির্দেশককে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অথবা নির্দেশককে নির্দেশনা কৌশলের পরিবর্তন করতে হবে। চরিত্রের ভঙ্গিমা পরিবর্তন করে দিতে হবে। এমনও লক্ষ্য করছি চরিত্রের ভঙ্গিমা একটু পরিবর্তন করে দেয়ার সাথে-সাথে কাঙ্ক্ষিত চরিত্র তৈরি হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমি দুই ধরনের অভিনেতা-অভিনেত্রী পেয়েছি। কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী আছে অলস আবার কিছু আছে যারা আকাঙ্খার তুলনায় অতিরিক্ত প্রদর্শন করে। এই দুই ধরনের অভিনেতা-অভিনেত্রীই প্রযোজনাকে খতিগ্রস্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে দুই ধরনের অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে কাজ করতে হয়। আমাদের বাঙলা অঞ্চলের অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রধান সমস্যা হলো ‘জড়তা’। এই জড়তা কাটানোর জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তাদেরকে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একটা ‘খেলার’ মধ্যেদিয়ে নিয়ে যেতে চাই। খুব জটিল চাপ প্রয়োগ করে আমি নির্দেশনাকর্মে বিশ্বাসী নই। কাজে চাপতো থাকবেই তবে সেটা যেন অভিনেতা-অভিনেত্রী গ্রহণ করতে পারে। এভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যেদিয়ে আমি নির্দেশনার কাজ পরিচালনা করে থাকি। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করলেই নির্দেশককে আর চাপ প্রয়োগ করতে হয় না। আমার নাট্য-নির্দেশনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেতা তারিক আনাম খান বলেন– ‘মামুন ভাই, আপনার অভিনেতা-অভিনেত্রী যখন অভিনয় করে তখন তার খুব মজা নিয়ে অভিনয় করে’। এটার গোপন তথ্য হলো আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কঠোর চাপ প্রয়োগ করি না। চাপটা কাজের প্রয়োজনে আসা উচিৎ। এই বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্কটা আমি শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথেই তৈরি করি না। এটা আমার নাট্য-নির্দেশনা প্রক্রিয়ার সবার সাথে সবার করার চেষ্টা করি। এই পুরো কাজটা আমাকে

> সমঝোতার সাথে করতে হয়। নির্দেশকের অনেক ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আমি লক্ষ্য করেছি অনেক নির্দেশক আছেন যাঁরা অধৈর্য হয়ে যান। এই অধৈর্য হলে চলবে না। আমি মনে করি খুব ধৈর্যশীলতার মধ্য দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে নির্দেশককে কাজ করতে হয়। পারস্পারিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সমঝোতার সাথে কাজ করতে হয় । যাতে নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় সবাই আনন্দের সাথে কাজ করতে পারে। পিটার ব্রুক এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিয়েছেন সেটা হলো– অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে নির্দেশকের সম্পর্ক হবে অনেকটা ইন্টারকোর্সের মতো। যাতে উভয়ই অনন্দ পায়। এটা আমিও বিশ্বাস করি।[৯৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি আলোচনা সাপেক্ষে প্রতীয়মান হয় যে, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ডিজাইনার, নাট্যকারসহ সকলের সাথে মামুনুর রশীদ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে 'সহজ-সরল' সম্পর্ক রক্ষা করে তাদের 'জড়তা' দূর করার জন্য একটা 'খেলার' মধ্যে দিয়ে সামনে নিয়ে যেতে চান। কারণ, খুব জটিল চাপ প্রয়োগ করে তিনি নির্দেশনা কর্মে বিশ্বাসী নন। মূলত তিনি নাট্য-নির্দেশনায় 'সমঝোতা' ও 'ধৈর্য' ধারণের মধ্যদিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চান। যেখানে 'আনন্দের' সাথে কাজ করতে পারাটা এক মাত্র লক্ষ্য। নাট্যকার ও নির্দেশক সম্পর্কে মামুনুর রশীদ বলেন– 'দুটোই ভিন্ন শিল্প। কখনো-কখনো নাট্যকারকে চ্যালেঞ্জ করা আবার কখনো-কখনো চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করা। এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু সব নির্দেশককেই করতে হয়। সেক্ষেত্রে নাট্যকার জীবিত হোক বা মৃত হোক। সবসময় একটা ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে। দুজনে যাতে দুজনকে বুঝতে পারে।'[৯৮]

মামুনুর রশীদ এ যাবৎ যতো নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলো পর্যবেক্ষণ করলে প্রতিটির সাথে প্রতিটির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। একটা নাটক থেকে আরেকটি নাটকের অনেক পার্থক্য। তাঁর একেকটা নাটক একেকটা অভিধানের মতো। যেমন– '*নানকার পালা* নামে একটা নাটক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার পরপরই *গিনিপিগ* নাটকের নির্দেশনা দেন। *নানকার পালা* নাটকটি তিনি প্রোসেনিয়াম মঞ্চে নির্দেশনা দেন। সেটাতে নানা ধরনের আঞ্চলিক গান ব্যবহার করেছেন। পরে *গিনিপিগ* নির্দেশনার সময় একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করার চেষ্টা করেন। একটা রাষ্ট্রের আবরণ, রাষ্ট্রকে নির্মাণ না করে কীভাবে মানুষকে শোষণ করা হয়েছে সেটা

[৯৭]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৬-০৬-২০১৬।
[৯৮]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৬-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

দেখাতে চেয়েছেন। এই দুটো নাটকের উপাদান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। *সঙক্রান্তি* নাটকে আবার তিনি প্রোসেনিয়াম মঞ্চ ব্যবহার করেন।'[৯৯] *রাঢ়াঙ* নাটক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মামুনুর রশীদ বলেন :

> আমি নাটকটি যখন লিখি এবং নির্দেশনার কাজটা করতে শুরু করি তখন প্রথম এক মাস মহড়া কক্ষের আশে-পাশে ঘুরতাম। কিছুই পাচ্ছিলাম না, অভিনেতা-অভিনেত্রী সময়মত মহড়ায় আসছে কিন্তু আমি কোনো নির্দেশনা দিতে পারছি না। কারণ পাণ্ডুলিপিটা আমার কছে একটা বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তখন আমি যেটা করলাম তা হলো এই নাটকের জন্য মিউজিক/সংগীত সংগ্রহ করলাম। সাঁওতালদের সংগীত সংগ্রহ করে সংগীত পরিকল্পককে দিয়ে বললাম এর গানগুলো আমাকে গেয়ে শুনাও। সংগীত পরিকল্পক তাই করলেন কিন্তু সংগীতগুলো ঢিমা তালে হওয়ায় আরেকটি সমস্যায় পড়ালাম। হঠাৎ একদিন একটা চমৎকার সংগীত পেয়ে গেলাম। এই সংগীতটাকে ধরে আমি কোরিওগ্রাফী তৈরি করলাম। এই কোরিওগ্রাফী দাঁড়ানোর পর আমার কাছে সম্পূর্ণ জিনিষটা ধীরে-ধীরে সহজ হতে শুরু করল। এরপর আমি একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলাম এবং এক পর্যায়ে ভাবলাম যে এটা আমি প্রোসেনিয়ামে করবো না। ধীরে-ধীরে এই চিন্তাটা নিয়ে কাজ শুরু করলাম। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখলাম অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করতে সমস্যায় পড়ছে। কারণ সেখানে কোনো মঞ্চ পরিকল্পনা নেই। মানে কোনো আনুভূমিক বা উলম্ব লাইন নেই। একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি মঞ্চে একটা বাঁশ পায় তাহলেও সে বাঁশটাকে ধরতে পারে একটা সাহায্য নিতে পারে। তাই এই চ্যালেঞ্জটাকে নিলাম এই নাটকে।[১০০]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মামনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনায় 'নিরন্তর লেগে থাকা' ও 'অবিরাম চেষ্টা আর সাধনার'-এর একটি স্বার্থক উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও এই বক্তব্যসূত্রে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মামুনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'সহজাত জ্ঞান'-এর কাঙ্ক্ষিত প্রতিফলন। কারণ মামুনুর রশীদ যখন *রাঢ়াঙ* নাটক নির্দেশনার কোন তত্ত্ব-সূত্র বা কুলকিনারা পাচ্ছিলেন না তখন যদি অধৈর্য হয়ে নাটকটির নির্দেশনা ছেড়ে দিতেন তাহলে আমরা হয়তো 'অবিরাম চেষ্টা আর সাধনার' একটি স্বার্থক উদাহরণ থেকে বঞ্চিত হতাম। অপরদিকে 'নিরন্তর লেগে থাকা' এ দুয়ের সমন্বয়ে *রাঢ়াঙ* নাটকটি এমন এক নাট্য-ভাষ্য তৈরির করেছে, যেখানে নাট্যক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ হয়ে উঠেছে সরল, সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। যা সম্পূর্ণতই নির্দেশকের 'সহজাত জ্ঞান' চর্চার সার্থক উদাহরণ।

---

৯৯. এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা ১৯৭২-২০০০* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০), পৃ. ১৮৪।

১০০. মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১২২।

মহড়ার সময়-সীমা, স্থান, শিল্পীদের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মামুনুর রশীদ সদা ক্রিয়াশীল। নির্দেশক হিসেবে তিনি এসবকিছুও লক্ষ্য রাখেন। মহড়ার জন্য তিনি সবসময় একটা ক্যাম্পাস সদৃশ স্থান খুজে বের করার চেষ্টা করেন। যাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহড়া দিতে পারে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি মামুনুর রশীদের সমান দৃষ্টি থাকে। তিনি বলেন– 'আমাদের সমাজটা প্রোফেশনাল নয়। যে কারণে অভিনেতা-অভিনেত্রী সঠিক সময় মহড়ায় আসে না। আমাদের পরিবারগুলোও সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা রাখে না। প্রদর্শনীর দিনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর ফোন আসে বিশেষ করে মেয়েদের। তার পরিবার জানে মেয়ে কী করছে তারপরও ফোন করছে। এটা হলো সমস্যা। তারপর তো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মহড়ায় বিলম্ব করার স্বভাব রয়েছে। মহড়ায় এসে তাদের মন বিক্ষিপ্ত থাকে। মোবাইল ফোন এখন একটা বড় সমস্যা। ফোনটি তারা হয়তো মেকানিক্যালী বন্ধ রাখে কিন্তু মানসিক ভাবে বন্ধ হয় না। কাজেই মহড়ায় যেই বিরতি হয় তখনই ফোন খুলে কথা বলতে শুরু করে। নির্দেশক হিসেবে এই সব কিছু সমন্বয় করতে হয়। আবার অনেক সময় মানবিক দিক বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন– কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিবারের সমস্যা, কেউ হলে থাকে তার হল ৯.৩০মি. বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি। নির্দেশককে এই সব কিছু ধৈর্যসহকারে মেনে তাঁর কাজটা করে যেতে হয়। আমার এক জার্মানী বন্ধু আমাকে বলে– তুমি তোমার অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে 'পুত্রের' মতো ব্যবহার করবে। যাতে করে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বকাও দেয়া যায় আবার আদরও করা যায়।'[১০১] সুতরাং উপর্যুক্ত উক্তির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় পেশাদারিত্ব অনপুস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং নির্দেশক হিসেবে মামুনুর রশীদ এই সব কিছু সমন্বয় করেই নাট্যচর্চায় অব্যাহত রয়েছেন।

মামুনুর রশীদ নাট্য-নির্দেশনায় বেশি-বেশি রান-থ্রু দিয়ে থাকেন। কারিগরি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রেও তিনি অধিক প্রদর্শনী করে থাকেন। তিনি একটি নাটকের প্রায় পাঁচটি মতো কারিগরি প্রদর্শনী করতে চান। তিনি বলেন– 'কারিগরি প্রদর্শনীতে মূলত নাটক দাঁড়ায়। প্রথম দাঁড়ায় রান-থ্রুতে পরে দাঁড়ায় কারিগরি প্রদর্শনীতে।'[১০২] মামুনুর রশীদের সাথে আলাপনসূত্রে যানা যায়, তিনি প্রথম প্রদর্শনীকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ তিনি মনে করেন প্রথম প্রদর্শনীর পূর্বে নাটকটি সম্পর্কে কোনো কিছু বোঝা যায় না। প্রথম প্রদর্শনীতে অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেক সচেতন থাকে বিধায় ভুল-ত্রুটিসহ প্রথম প্রদর্শনীটি ভালো হয় বলে তাঁর ধারণা। এখান থেকে তিনি নাটকের গতি, পরিণতি নির্ধারণ করে থাকেন। সাথে-সাথে তিনি নাটকের মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা, প্রযোজনা-ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ, দর্শক সমাবেশকরণ, প্রচার ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ের প্রতি সমান মনযোগী থাকেন। মামুনুর রশীদ বলেন– 'বর্তমানে থিয়েটারের মার্কেটিং জরুরি বিষয়। এখন নাটক প্রদর্শনীর

---

[১০১] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।
[১০২] প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৬-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

পূর্বে জনবহুল স্থানগুলো নির্ধারণ করে আমরা একটা প্রোমশনাল মঞ্চায়ন করি। এছাড়া লিফলেট বিতরণ করি। নাটকের ফটোশেসনে আমি গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করি। এই কাজগুলো এখন প্রয়োজনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রিন্ট ও টেলিভিশন মিডিয়াতে স্বাক্ষাৎকার দিয়ে নাটকের প্রচার করে থাকি। এই পুরো প্রক্রিয়ার সাথে নির্দেশক হিসেবে আমি যুক্ত থাকি।'[১০৩] মহড়ার পর দর্শকের সমীপে নাটকের প্রথম প্রদর্শনী হয়ে যাওয়ার পরও নির্দেশক হিসেবে মামুনুর রশীদ তাঁর নাটক নিয়ে কাজ করেন। তিনি প্রদর্শনীর পর দর্শক, সমালোচক বা বিদগ্ধ-রসিকজনের সমালোচনা মনোযোগ সহকারে শুনে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'সমালোচকের বক্তব্য শুনার পর আমার মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই প্রতিক্রিয়ার পর আমার মধ্যে নতুন ভাবনা-চিন্তার জন্ম নেয়। মাঝে-মাঝে সমালোচকের প্রতিক্রিয়ায় আমি যুক্তি খুঁজে পাই। যুক্তি থাকলে আমি সেই মোতাবেক কাজ করি। তবে দর্শক, সমালোচক ও বিদগ্ধ-রসিকজনের প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে আমি কোনো পরিবর্তন করি না। কারণ আমি জানি একটি নাটক বার-বার মঞ্চায়নের ফলে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবেই। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যদি আমি মনে করি নাটকের পরিবর্তন করার প্রয়োজন তাহলে তা করে থাকি। তবে সমালোচকের ওপর নির্ভর করে আমি কোনো পরিবর্তন ঘটাই না।'[১০৪] মামুনুর রশীদের নির্দেশনা-কৌশল ও দর্শন উত্তর-প্রজন্মের নির্দেশকদের অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করেছে কিনা সে প্রসঙ্গে তিনি খুব একটা সচেতন নয়। তবে তিনি কোনো নির্দেশকের নির্দেশনা-কৌশল অনুকরণ পক্ষে নন। অনুকরণটা তাঁর দৃষ্টিতে অন্যায়। তবে তিনি মনে করেন তাঁর কাজের দার্শনিক দিকটার প্রভাব পড়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'আমি অনেক নির্দেশকের প্রযোজনায় আমার দর্শন খুঁজে পাচ্ছি। বর্তমানে আমাদের দেশের থিয়েটারে কথায়-কথায় কোরিওগ্রাফী ব্যবহার হচ্ছে। সেটা আমাকে চিন্তিত করে তুলছে। কোরিওগ্রাফী নাটককে বেগবান না করে বাধাগ্রস্থ করলে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানো কষ্টকর হয়।'[১০৫]

মামুনুর রশীদের কাজের একটি দিক হচ্ছে মুক্তনাটক। মুক্তনাটক চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনকে বিশিষ্ট মাত্রা যুক্ত করেছেন। সেই মুক্ত নাটকের নির্দেশনা প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ বলেন– 'মুক্ত নাটকে আমরা নির্দেশক শব্দটা ব্যবহার করি না। সেখানে আমরা বলি 'সঞ্চালক'। সেখানে আমরা কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণির সাথে মেলা-মেশা করি, কথা বলি, গল্প করি। এভাবে তাদের জীবনের গল্পও শুনি। গল্প শুনে একটা প্লট তৈরি করি। যে প্লটটি সেই গোষ্ঠী বা শ্রেণির ওপর ছেড়ে দেই। তাদেরকে বলি এখন আপনাদের দায়িত্ব এর দৃশ্যভাগ করা। এই আলাপ-আলোচনার মধ্য থেকে তারা সচেতন হচ্ছে। এভাবে চলার একটা পর্যায়ে আমরা যুক্ত হই। যুক্ত হয়ে এডিটর বা সম্পাদকের ভূমিকা নিয়ে থাকি। এই মুক্ত নাটকে আমরা তাদের

[১০৩]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১১-০৬-২০১৬।
[১০৪]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)
[১০৫]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

সচেতন ও নাট্য-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলার চেষ্টা করি। নাট্য-নির্দেশনার কাজটা এখানে আছে তবে সেটা অনেক দূরের বিষয়।'[১০৬] মামুনুর রশীদ একজন নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। এই ত্রয়ী সত্তার সম্মিলন ঘটাতে গিয়ে তিনি নির্দেশক হিসেবে কিছুটা সুবিধার মুখমুখি হন। আবার যখন তিনি তাঁর নাটকে প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশক হন তখন বাধারও সম্মুখীন হয়ে থাকেন বলে আলাপসূত্রে অবগত হই। তাই তিনি ইদানিং এ দুটো কাজ একসঙ্গে করতে চান না। এ কারণে তিনি *জয় জয়ন্তী* নাটকে অভিনয় করেন নি। *সঙক্রান্তি* নাটকে একটা ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রধান চরিত্রে অভিনয় এবং নির্দেশনা এ দুটো কাজ একসঙ্গে করতে গেলে দুটোর প্রতিই অবিচার করা হয়। অন্য নির্দেশকের নির্দেশনায় তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। তবে দলে অভিনেতা সংকটের সময় দুটো কাজই ভালোভাবে করার চেষ্টা করেছেন। আলাপসূত্রে তিনি যানান নির্দেশক যেন কখনই প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী না হয়। তবে অনেক শক্তিশালী মানুষ আছেন যাঁরা দুটো কাজই স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারেন। যেমন– শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, আলী যাকের ইত্যাদি। তবে মামুনুর রশীদ টেলিভিশন নাটকে এই কাজটা করতে পারেন বলে উল্লেখ করেন। নিজের নাটক নির্দেশনা প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ বলেন– 'আমার নাটক বা অন্য কোনো নাট্যকারের নাটক নিজের করে নিতে একটা ষ্ট্রাগল আছে। অনেক সময় দেখা গেছে নাট্য রচনার সময় যে নির্দেশনা চিন্তা আমার মধ্যে ক্রিয়া করেছিল কিন্তু প্রয়োগে এসে তা একদমই অনুপস্থিত থাকে। আবার কখনো–কখনো চিন্তা কাজও করে। তবে প্রযোজনা পূর্বে আমি যখন কর্মশালা পরিচালনা করি তারপরে যখন মহড়ায় আসি তখন নিজের পাণ্ডুলিপিকে সমস্যাজনক মনে হয়। তখন সেগুলোকে সমাধানের জন্য চেষ্টা করি। তাই এক্ষেত্রে সুবিধাও যেমন আছে অসুবিধাও আছে। এই নির্দেশনা প্রক্রিয়ার সময় নির্দেশককে অনেক বেশি সংযত হতে হয়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। থিতু হতে হয় এবং এর পরই আবার নতুন কিছু ভাবনা-চিন্তা তৈরি হয়।'[১০৭] নির্দেশক ছাড়াও মামুনুর রশীদ একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার, দল প্রধান, সংগঠক, টিভি কথক এই বহুবিধ বৈশিষ্ট্য নির্দেশনার কাজকে আরও লক্ষ্যমূখী করে বলে তিনি মনে করেন। তিনি মনে করেন সবক্ষেত্রগুলোই নির্দেশক হিসেবে তাঁকে অভিযোজনে সাহয্য করে।

উপর্যুক্ত আলোচনাসূত্রে মেথড এ্যাকটিং এবং নির্দেশকের দায়িত্ব ও কর্ম-কৌশল বিষয়ে মামুনুর রশীদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গেলেও 'নির্দেশনা কৌশল' বা পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর অবস্থান অনেকটাই অস্পষ্ট। অতঃপর নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহার প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ বলেন– 'আমি আমার নাটকে বিন্যাস (কম্পোজিশন) ব্যবহার করে থাকি। নাট্য-নির্দেশনায় বিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এটি চরিত্রকে ফোকাস করার জন্য প্রয়োগ করি। আবার বিন্যাসের মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্যবোধও কাজ করে।

[১০৬] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১১-০৬-২০১৬।
[১০৭] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

স্পেস বা মঞ্চ অনুসারে আমি বিন্যাস প্রয়োগ করি। প্রোসেনিয়াম মঞ্চে নাটক করলে একভাবে বিন্যাস করি। এরেনা মঞ্চে নাটক করলে ভিন্নভাবে কম্পোজিশন ব্যবহার করি। এক-এক নাটকে প্রয়োজনের তাগিদে বিন্যাস করার চেষ্টা করি।'[১০৮] 'দৃশ্যায়ন (পিকচারাইজেশন) কৌশলটিও নাট্য নির্মানে প্রয়োগ করি। নির্দেশক হিসেবে ছবির পর ছবি আঁকছি। একটা ছবি শেষ হয়ে গেলে আর একটা ছবি শুরু করছি। অন্যদিকে আবার আরেকটা ছবি শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল। দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাটকের উন্মোচন। নাটকের শুরুতে দর্শক কী ছবি দেখছে এবং শেষে কী ছবি দেখছে এটা।'[১০৯] এর সাথে-সাথে তিনি চলন (মুভমেন্ট) প্রয়োগ করেন। 'প্রযোজনায় যথাযথ চলনের অভাবে নাটক দূর্বল হয়ে পড়ে। নাটকের গতি নির্ভর করে চলনের ওপর। যথাযথ চলন ব্যবহার করলে নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। চলনের অভাবে আবার নাটক জড়ও হয়ে যেতে পারে। আমরা নাটক দেখে বলি নাটকটি খুব সচল বা মুভিং এই সচলতা তৈরি করতে চলনের বিকল্প নেই। চলন প্রয়োগে নাট্য-নির্দেশককে অধ্যাবসায়ি হতে হয়।'[১১০] পঞ্চ-সূত্রের অন্য একটি সূত্র নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)। 'এই কৌশলটি আমি আমার প্রযোজনায় প্রয়োগ করি না। এর পরিবর্তে আমি নিঃশব্দতা বা পজ ব্যবহার করি। সাথে-সাথে সংলাপ ছাড়া ক্রিয়ার ব্যবহার করি। কিন্তু মূকাভিনয় আমার কাছে ক্লিশে লাগে।'[১১১] পঞ্চ-সূত্রের শেষ যে সূত্রটি সেটি হলো ছন্দ (রিদম)। 'নাটকে ছন্দ নির্ণয় করা কঠিন কাজ। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় সংগীতে ছন্দ ও লয় দৃশ্যমান। সেখানে তবলা দিয়ে ছন্দ-লয় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিন্তু মঞ্চ নাটকে ছন্দ-লয় দৃশ্যমান নয়। তবে নাটক ছন্দে চলছে। একজন সাফল নাট্য-নির্দেশক ছন্দ তৈরি করতে সামার্থ থাকেন। এমন কি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছ থেকে ছন্দ বের করে আনতে পারেন এবং সেটা নাটকে রক্ষাও করতে পারেন। আমি মনে করি নাটকের ছন্দ-লয় একমাত্র নির্দেশক দেখতে পান। আর এটা অনুভব করে দর্শক। দর্শকের অনুভবে ছন্দ-লয় প্রথম থেকে লেগে যায়। যেমন– নাটকটি ভালো লাগছে না, গতি নেই, পুনরাবৃত্তি মনে হচ্ছে ইত্যাদি। এইভাবে ছন্দ-লয় দর্শকের কাছে ধরা দেয়। নির্দেশক হিসেবে আমি মহড়ার শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারি নাটকটি ছন্দ-লয় কেমন হওয়া উচিৎ। আর বুঝতে পারি নাটকটির প্রথম প্রদর্শনীতে, দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখে। যদি সমস্যা মনে হয় তখন পুনরায় ভেবে-চিন্তে মহড়ায় ছন্দ নির্ধারণ করে থাকি। মাঝে-মাঝে আমি ছন্দ-লয় নিয়ন্ত্রণের জন্য দৃশ্য কেটে বাদ দেই আবার দৃশ্যের অংশ বিশেষ বা কোন চরিত্রের চলন পরিবর্তন করে ছন্দ-লয় প্রতিষ্ঠা করি।'[১১২]

---

১০৮. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১১-০৬-২০১৬।

১০৯. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

১১০. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

১১১. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

১১২. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১১-০৬-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য।)

‘পঞ্চ-সূত্র’-বিষয়ক উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মামুনুর রশীদ মেথড এ্যাকটিং বিষয়ে পাশ্চাত্যের স্তানিস্লাভস্কি, পিটার ব্রুক, বারবা, মেয়ারহোল্ড, গ্রোটস্কি, চাইনিজ অপেরা, জাপানের কাবুকি -এর ওপর যতোটা গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়, নির্দেশনা কৌশল হিসেবে পঞ্চ-সূত্রের প্রায়োগিক বিষয়ে ততোটা নয়। ‘বিন্যাস’ (কম্পোজিশন) সম্পর্কিত তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– তিনি ‘বিন্যাস’ বলতে মনেকরেন ‘বিন্যাস এক ধরনের সৌন্দর্যবোধের কাজ করে’। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের ‘বিন্যাস’ সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ‘বিন্যাস’ কেবলই প্রদর্শিত দৃশ্যের ‘অর্থ’ (meaning of the picture) প্রকাশ করা নয় বরং সামগ্রিক অর্থে ‘বিন্যাস’ হচ্ছে এমন এক কৌশল যা রঙ (color), লাইন/রেখা (line), ভর (mass) এবং আঙ্গিক (form)-এর সাহায্যে ‘বিষয়’ (subject)-এর অনুভূতি (feeling), ভাব (mood) এবং গুণমান (quality) প্রকাশ করা। এছাড়া তিনি ‘দৃশ্যায়ন’ (পিকচারাইজেশন) কৌশলটি সম্পর্কে বলেন– ‘একটা ছবি শেষ হয়ে গেলে আর একটা ছবি শুরু করছি। অন্যদিকে আবার আরেকটা ছবি শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল। দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নাটকের উন্মোচন। নাটকের শুরুতে দর্শক কী ছবি দেখছে এবং শেষে কী ছবি দেখছে এটা’। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের ‘দৃশ্যায়ন’ সম্পর্কিত আলোচনায় উদ্ধৃতিসূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ‘দৃশ্যায়ন’ বা পিকচারাইজেশন হচ্ছে নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের ‘দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা’। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রগুলোকে মঞ্চে এমন ভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে চরিত্রগুলোর পরস্পরের প্রতি যে আবেগময় সম্পর্ক ও মনোভঙ্গি এবং দৃশ্যের যে নাটকীয় পরিস্থিতি রয়েছে তা যেন কোনো সংলাপ বা ক্রিয়া ছাড়াই দর্শকের বোধগম্য হয়। অতএব পঞ্চ-সূত্র বিষয়ে মামুনুর রশীদের উচ্চারিত ‘বিন্যাস’ ও ‘দৃশ্যায়ন’ বিষয়ক উক্তকে কৌশলগত যুক্তি দ্বারা নয় বরং একটি ধারণাগত উক্তি হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। তা সত্ত্বেও তৃতীয় অধ্যায়ে মামুনুর রশীদের নির্দেশিত– *টার্গেট প্লাটুন* নাটকের প্রায়োগিক কৌশল বিশ্লেষণে পঞ্চ-সূত্রের কিছু উপাদানের কার্যকর উপস্থিতি এবং অর্থপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে। সুতরাং আতাউর রহমানের মতো মামুনুর রশীদের কাছ থেকেও পঞ্চ-সূত্রের বিষয়ে অনেকটা সাদা-মাটা উত্তর পাওয়া গেল। উভয়েই মঞ্চে পঞ্চ-সূত্র প্রয়োগ করেন কিন্তু তাঁদের নির্দেশনা-কৌশল দেখে মনে হয় তাঁরা নাট্য-নির্দেশনায় পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগটা অনেকটা ধারণাগতভাবে সম্পন্ন করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে নাট্য কর্মীরা আত্মনিবেদিত ছিল সে তুলনায় বর্তমানে নাট্যচর্চায় বেশ কিছুটা টানাপোড়ন লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি নাট্যকর্মীরা দিন-দিন তাদের গ্রুপ থিয়েটার কমিটমেন্ট থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ বাঙলা নাট্যের জন্য সত্যি হতাশার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদ বলেন :

টানাপোড়ন কিন্তু প্রথম দিকেই ছিল। প্রথমে আমরা যারা শুরু করেছিলাম সেই যে একটা সঙ্ঘবদ্ধ গণজোয়ার ছিল সেই সঙ্ঘবদ্ধ গণজোয়ারটা কিন্তু দিনে-দিনে কমে আসছে। কমে আবার নতুন কিছু লোক এসেছে। এটা কিন্তু একটা নিয়ম, প্রকৃতিরই নিয়ম। সবাই শুরু করতে পারে, আমাদের দেশে তো আরও বেশি এটা যে, শুরু করে কিন্তু মাঝখান থেকে ঝরে যায় অনেকেই। শেষ পর্যন্ত কটা লোক পৌঁছায়। এই টানাপোড়নটা যেমন বেঁড়েছে, তেমনি অনেক কাজ বেঁড়েছে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্রে কাজ আছে। এই কাজগুলোর পরিধি বারার ফলে আরেকটি সমস্যা হয়েছে যে অনেকের সম্ভাবনাগুলো খোলা রয়েছে। কাজেই অনেক ঝড়ে যাচ্ছে। তবে এটা মূলত কোনো বাধা না। কারণ আজ থেকে বিশ বছর আগে যে সব নাটক হতো এবং তার যে প্রযোজনাগত মান ছিল, বর্তমানে সে মান অনেক বেড়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর টানাপোড়নের বিষয়টি নিতান্তই বাস্তবিক এবং অত্যন্ত বড় রকমের সত্যি কথা। যারা একটু 'তারকা' হয়, তাদের সময়ের মূল্য সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা তো একটা বড় ধরনের টানাপোড়নের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে কাজের প্রতি ফোকাস থাকছে না। আগের তুলনায় এখন নাটক করা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দর্শকেরও বুদ্ধি বেড়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রযোজনার মান বাড়াতে হবে। এইখানে যদি একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয় তাহলে তো একটা বড় ধরনের সংকট তৈরি হবে। কিন্তু এই টানাপোড়নের মধ্যে যারা মঞ্চ নাটককে ধরে আছে, তারা ধরে থাকবে এবং টেলিভিশন মিডিয়ার সে আকর্ষণের শক্তিটাও ধীরে-ধীরে কিছুটা কমে আসবে। আসলে কমিটমেন্ট শুধু নবাগত থিয়েটার কর্মীদের ক্ষেত্রেই লজ্ঘিত হচ্ছে না বরং আয়-রোজগারের তাগিদে ভাল থাকার নেশায় প্রবীন-নবীণ সকলের ক্ষেত্রে তা একই রূপ ধারণ করছে। তবে একজন সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাট্যকারের মতো একজন ভালো ও খ্যাতিমান নাট্য-নির্দেশক হওয়ার জন্য অনুশীলন ও চর্চার ব্যাপার রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।[১১৩]

মামুনুর রশীদের উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে পদ্ধতিগত 'অনুশীলন' এবং 'চর্চা'র পাশাপাশি একজন 'ভালো নির্দেশক' হওয়া বা 'কালোত্তীর্ণ নির্দেশনা' প্রদানের ক্ষেত্রে নাট্যকলার সামগ্রিক সাংগঠনিক প্রতিবেশে পেশাদারিত্বের উন্নয়নকেও একটি পূর্বশর্ত বলে মনে করেন। পেশাদারিত্ব একদিকে যেমন নাট্যকর্মীর দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করতে পারে একই সাথে অভিনয় এবং নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'পদ্ধতি' বা 'কৌশলগত' চর্চাকেও বিকশিত করতে পারে। ফলে বাংলাদেশের গ্রুপ-থিয়েটার কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় পেশাদারিত্বের অনুপস্থিতিকে একটি গভীর সংকট হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান নির্দেশক মামুনুর রশীদ। তাঁর মতে, 'কমিটমেন্ট শুধু নবাগত থিয়েটার কর্মীদের ক্ষেত্রেই লজ্ঘিত হচ্ছে না বরং আয়-রোজগারের তাগিদে ভালো

[১১৩] মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ ১৯৭২-২০০৪* (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১৩), পৃ. ১২৬-১২৭।

থাকার নেশায় প্রবীন-নবীণ সকলের ক্ষেত্রে তা একই রূপ ধারণ করছে'। তিনি মনে করেন শিল্পের কর্ম-প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত কিছু আবিষ্কারের পেছনে যে জিনিসটির অত্যধিক প্রয়োজন তা হলো নিরলস চেষ্টা, নিমগ্ন সাধনা। এ দু'য়ের সম্মিলিত প্রয়াশে অবশ্যই সৃষ্টিশীল কিছু উপহার দেয়া সম্ভব। উপরোক্ত টানাপোড়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা প্রসঙ্গে মামুনুর রশীদের উপলব্ধি হচ্ছে– 'বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা বেশ এগিয়েছে। আমাদের পরের জেনারেশনের অনেকেই সৃজনশীলভাবে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তবে খুব বেশি নির্দেশক তৈরি হয়েছে তা নয়, কিন্তু তারপরও নির্দেশনায়, ডিজাইনিং ও অভিনয়ে ভাল কাজ হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা যেটা সেটা হলো মৌলিক নাট্যকারের অভাব। এক্ষেত্রে সঙ্কট চলছে। নতুন নাট্যকার সৃষ্টি হচ্ছে না, নতুন নাটক মঞ্চে আসছে না। যারা আমরা সত্তর-আশির দশকের ছিলাম তারাই আছি। নতুন নাট্যকার পাচ্ছি না।[১১৪]

'মূলত আমি সব তত্ত্ব-সূত্রই প্রেরণা হিসেবে নেই। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব-সূত্র দ্বারা প্রোভাবিত হয় নি বা তীব্র ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নি। সব তত্ত্ব-সূত্র মাথায় রেখে আমি আমার নাট্য-নির্দেশনার 'প্রক্রিয়া' ও 'কৌশল' পরিচালিত করি'– এরূপ উক্তির মধ্যদিয়েই বস্তুত নির্দেশক মামুনুর রশীদের নির্দেশনা প্রক্রিয়া ও কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়। উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত 'পঞ্চসূত্র'কে গ্রহণ না করলেও পাশ্চাত্যের একাধিক নাট্যকার ও নির্দেশকের কর্ম-প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এমনকি মহড়াকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাবলীল উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মেথড এ্যাকটিং-এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়টির ওপরেও বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে এই দীর্ঘ আলোচনার পাশাপাশি তাঁর নির্দেশিত নাটক পর্যবেক্ষণেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে– নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্যের নাট্য-চিন্তা বিশেষত স্তানিস্লাভস্কি'র পদ্ধতিগত অভিনয় এবং ব্রেখটক, পিটার ব্রুক, বারবা, মেয়ারহোল্ড, গ্রোটস্কি, চাইনিজ অপেরা, জাপানের কাবুকিসহ একাধিক নির্দেশকের নির্দেশনা-কৌশলকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে তাঁদের তাত্ত্বিক উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে দেখা যায়। মূলত তিনি সব 'তত্ত্ব-সূত্র'কে প্রেরণা হিসেবে নিয়ে 'সহজাত' দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি মামুনুর রশীদ নাট্য-নির্দেশনায় বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার এক নিরলস স্বাক্ষ বহন করছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর *রাঢ়াঙ* নাটকের উপস্থাপন রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্দেশনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের 'তত্ত্ব-সূত্র'কে প্রেরণা হিসেবে নিলেও দেশজ/লোক নাট্যের উপকরণকে ব্যবহার করে তিনি নাট্য-নির্দেশনা শৈলী সৃষ্টিতে সচেষ্ট থেকেছেন। তবে মামুনুর রশীদের সাথে আলাপনসূত্রে এবং তাঁর নাটক পর্যবেক্ষণে উপলব্ধি হয় যে, নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো নিজস্ব 'ঘরাণা'

---

[১১৪]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১১-০৬-২০১৬।

তৈরি করতে আগ্রহী নন। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে প্রচলিত যে নাট্য-নির্দেশনার ধারা তা থেকে ক্ষাণিকটা হলেও মামুনুর রশীদের ধারা 'স্বতন্ত্র'। অবশ্য এই স্বতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে তাঁর 'বিষয়' ও 'আঙ্গিক' কাঠামোর ভিন্নতার কারণে। উদাহরণস্বরূপ মামুনুর রশীদের 'মুক্ত নাটক' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে তিনি সচেতনভাবেই এদেশের সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের একটা সম্পর্ক খুঁজে চলেছেন। এই মানুষের শিল্পবোধের ও শিল্পরুচির সঙ্গে মামুনুর রশীদের পাশ্চাত্যের নাট্য-চিন্তার একটা মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর মুক্ত নাটক আন্দোলনের সময়। এবং এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তিনি নতুন একটি ধারা সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটার' আন্দোলন এবং 'মুক্ত নাটক' আন্দোলন তৃণমূল পর্যায়ের নাট্যচর্চাকে বিকাশ ঘটাতে গুরুত্বর্পণ ভূমিকা রেখেছে। এবং এই তৃণমূল পর্যায়ের নাট্যচর্চার মধ্যদিয়েই মামুনুর রশীদের শিল্পবোধ বা শিল্প-শৈলী সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। মামুনুর রশীদের সাথে আলাপনসূত্রে জেনেছি, তিনি নাট্য-নির্দেশক হিসেবে 'পর্যবেক্ষণ' করেন। যা একজন নাট্য-নির্দেশকের বড় গুণ। সুতরাং তিনি 'পর্যবেক্ষণ' ও 'বিশ্লেষণ' মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর নির্দেশিত *রাঢ়াঙ* নাটকে তিনি সাঁওতালদের জীবন পর্যবেক্ষণ করে, বিশ্লেষণ করে এবং সে জীবনবোধের সঙ্গে নাট্যিক কৌশল যুক্ত করে নাটকের সত্যকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই যে সত্য, নতুন করে বিনির্মিত হলো তখনি মামুনুর রশীদের নির্দেশনা-শৈলী দাঁড়িয়ে যায়, যেটাকে আমরা বলতে পারি মামুনুর রশীদের নির্দেশনা-শৈলী। কিন্তু এটা সত্য যে মামুনুর রশীদ এককভাবে কোনো রীতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন নি। সেক্ষেত্রে বলা যায়, মামুনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনার মধ্যে একটা মিশ্ররূপ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। মূলত তিনি 'মিক্সড ফরমে' কাজ করে থাকেন, আর এর মূলে রয়েছে ব্যক্তি মামুনুর রশীদের পাশ্চাত্য শিল্প বিষয়ে পাণ্ডিত্য। বলা যায়, এ বিষয়ে রয়েছে তাঁর বিস্তর জ্ঞান। তবে পাশ্চাত্য নাট্যকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নির্দেশনার কৌশল সম্পর্কিত আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা'র 'পঞ্চ-সূত্র' বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এমনটা অন্তত তাঁর এই দীর্ঘ আলাপনে পরিলক্ষিত হয় না। নাট্য-নির্মাণ ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস এমন যে– 'কোনো শিল্প ভাবনা বা দর্শন আমাকে গ্রাস করতে পারে নি। আমি শিল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শন ও শিল্প ভাবনা গ্রহণ করেছি।'[১১৫] অর্থাৎ তিনি কোনো একটি বা বিশেষ পদ্ধতি অথবা প্রক্রিয়া মেনে নিয়ে নাট্য-নির্দেশনার পক্ষপাতি নন। তাৎপর্যপূর্ণ এই সকল বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত কোন একটি মেথড বা তত্ত্ব-সূত্র অনুসরণ করতে চান নি। ফলে নির্দেশক হিসেবে তিনি সর্বদাই একাধিক নাট্য-চিন্তা বা তত্ত্বের সমন্বয়ে নির্দেশনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া মামুনুর রশীদের *পশ্চিমের সিঁড়ি*, *ওরা কমদ আলী*, *সমতট*, *সঙক্রান্তি*, ও

[১১৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক মামুনুর রশীদের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ০৪-০৬-২০১৬।

রাঢ়াঙ নাটকের বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি তাঁর 'নাট্য-নির্দেশনা'র বৈচিত্র্যের একটা প্রবণতা রয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্যের করেন তাঁর নাটক গণমানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। নাটকের বিষয় ভাবনার সাথে এবং গণমানুষের সম্পর্কের সাথে যখন একটি শিল্প-ভাবনা সম্পর্কিত হয়, তখনই মামুনুর রশীদ, আতাউর রহমান থেকে আলাদা হয়ে যান, নাসিরউদ্দীন ইউসূফ থেকে আলাদা হয়ে যান, কিংবা লাকী ইনাম, তারিক আনাম খান বা লিয়াকত আলী লাকী থেকে আলাদা হয়ে যান। তবে তাঁর নিজস্ব কোনো নির্দেশনা সূত্র না থাকলেও নির্দেশনার উপকরণ হিসাবে আমাদের হাজার বছরের লোক/দেশজ ঐতিহ্যের ধারাকে তিনি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে। সর্বশেষে বলা যায় মামুনুর রশীদ তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় মেথড এ্যাকটিং বিষয়টিকে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অত্যাবশ্যকীয় উপায় হিসেবে মেনে নিলেও নির্দেশনা কৌশল প্রয়োগে তিনি কোনো একক সূত্র বা তত্ত্বকে উপায় হিসেবে না দেখে বরং একটি সমন্বিত সৃজন-প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে আগ্রহী। 'নির্দেশনা' বিষয়ে নির্দেশক মামুনুর রশীদের প্রদত্ত এই সকল চিন্তা এবং ধারণাগত অভিব্যক্তির আলোকেই অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর নির্দেশিত *টার্গেট প্লাটুন* নাটক বিশ্লেষণসূত্রে পুনঃনিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লাকী ইনাম

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা বয়ে আনছে নানা অভিঘাত, যেখানে শিল্পের পথচলা মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। একদিকে রয়েছে সমস্যার জটাজাল, অন্যদিকে প্রলোভনের হাতছানি। এই দুইয়ের মধ্যখানে নাট্যশিল্পের পথ-পরিক্রমণ অনেক বেশি জটিল। 'পিচ্ছিল সেই পথে নাটকের চলবার জন্য একক সাধনার পাশাপাশি যৌথতার সংহতিরচনাও সমভাবে গুরুত্বময়। চলবার পথে সঙ্গী ও সহযাত্রী অনেক জোটে, মধ্যপথে পা-হড়কে পড়ে যাওয়া কিংবা অলীকের মোহে চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া মানুষেরা সেখানে সংখ্যায় গরিষ্ঠজন। তারপরও সাথী যাই-বা জোটে সারথীতো তাদের মধ্যে হাতে-গোণা, কেননা সেজন্য প্রয়োজন কঠোর তপস্যা, নিষ্ঠার সঙ্গে সতত সৃজনশীল থাকা এবং সর্বোপরি মমত্ব ও ভালোবাসা দ্বারা সহযাত্রীদের প্রাণিত করা। বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে এমন শিল্পী-সারথী সংখ্যায় বেশি হবে না, তবে এক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে গুণধারই তো বড় বিবেচনা, আর সেই বিচারে গুণবতী, কীর্তিমতী, যশোবতী নাট্য-সারথী রূপে লাকী ইনামের চার দশকের মঞ্চ সাধনা আমাদের জন্য বিশেষ গৌরবময় বটে।'[১১৬]

লাকী ইনাম যে নিষ্ঠা নিয়ে মঞ্চ সাধনা করেছেন তাতে সকলেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছেন। 'তিনি সমস্যাভারে কখনো আক্রান্তবোধ করেন নি, সব ধরনের জটাজাল ছিন্ন করে নিজের ও অন্যদের পথচলা অব্যাহত রাখতে সদা ক্রিয়াশীল রয়েছেন। সেই কতকাল আগে মঞ্চে প্রথম পদচারণার পর দীর্ঘ সময়-পথ তিনি পাড়ি দিয়েছেন, স্বভাবে নম্র ও মৃদুভাষী এই নির্দেশক কত-না বিচিত্র চরিত্র কতভাবে রূপায়িত করেছেন, অন্তর্গত বিষণ্নতার রূপকার থেকে প্রাণোচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ, বিচিত্র চরিত্র বিচিত্রতরভাবে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে আমাদের যুগিয়েছেন শিল্প-সমৃদ্ধি।'[১১৭] সেই সাথে, দীর্ঘ এই পরিক্রমণে, আপন শিল্প-ভূমিকাও তিনি নানাভাবে পাল্টে নিয়েছেন– 'রচনা করেছেন নাটক, অভিনয় করেছেন, কাজ করেছেন নেপথ্য কর্মী হিসেবে, দল গঠন ও পরিচালনায় পালন করেছেন মূখ্য ভূমিকা, তরুণতরদের জন্য হয়ে উঠেছেন প্রেরণামূলক, নাট্যশিক্ষা প্রসারে ও নাট্যান্দোলনে আপন ভূমিকা দ্বারা তা করেছেন সমৃদ্ধ।'[১১৮]

অন্তরতম নিলয় থেকে সৌন্দর্যকে আহরণ করে দেহ-মনের অনু-পরমানুতে ছড়িয়ে দেয়ার মাঝেই সৃষ্টিশীল মানুষের আত্মমুক্তি ও শতশত আনন্দের আয়োজন। এই আয়োজন তখন আর একক সত্ত্বা নয় বহুমাত্রিক অনুভবে গড়ে ওঠে মানবিক উৎকর্ষের অপূর্ব জগৎ। সেই জগতের একটি পরিমণ্ডলে কেন্দ্রবিন্দু লাকী ইনাম। নাট্য-জগতে এক অনন্য সাধারণ নাম। 'লাকী ইনামের শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্য রৌদ্রময় দিনের উত্তাপে

---

[১১৬] মফিদুল হক, *নাট্যসারথীর প্রতি অভিবাদন*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৪০।

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০-৪১।

[১১৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০-৪১।

গড়া। যোগ্য মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মমতার স্পর্শ, উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল পরিবেশ তাঁকে আত্মবিকাশের পথে বলিষ্ঠতা যুগিয়েছে। তিনি নিজেও তা ধারণ করতে পেরেছেন তুখোড় মেধা ও দীপ্ত প্রতিভায়।'[১১৯]

লাকী ইনামের জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বাবার কর্মস্থল রংপুর শহরে। বাবা মরহুম কলিমুল্লাহ ভূইয়া ছিলেন যুগ্ম সচিব ও মা মরহুম মহুয়া ভূইয়া একজন গৃহিণী। 'পাঁচ বছর বয়সে লাকী ইনাম নৃত্য দিয়ে সংস্কৃতি অঙ্গনে পা রাখেন। শিশু বয়সের প্রথম নৃত্যগুরু– শফিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া; ভরত নাট্যম– সমর ভট্টাচার্য্য, ময়মনসিংহ; মণিপুরী নৃত্য– বাবু রামসিং, কুমিল্লা ও নৃত্যগুরু– আমানুর রহমান, ঢাকা।'[১২০] সংগীতে হাতেখড়িও শিশু অবস্থা থেকে। খালিদ হোসেন, কুষ্টিয়া; সুকান্ত ভট্টাচার্য, কুমিল্লা; ছায়ানট, ঢাকা ও ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ, ঢাকা। বাবার চাকরির বদলি সূত্রে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের বিভিন্ন জেলায়। কিশোরগঞ্জে বদলি হয়ে আসার অবকাশে লাকী ইনাম কিশোরগঞ্জে এস ভি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পান এবং ওখান থেকে এস এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিশোরগঞ্জের স্বনামধন্য ঐ বিদ্যালয়টিতে প্রায় চার বছর পড়াশোনা করার অবকাশে লাকী ইনাম ওখানে তাঁর জীবন গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করেন। 'পড়াশোনার সঙ্গে-সঙ্গে সুকুমারবৃত্তির চর্চায় অর্জন করেন উচ্চমাত্রা। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা, দেয়ালপত্রের লেখালেখি, উপস্থাপনা ও নেতৃত্বে তাঁর জুড়ি ছিল না। প্রতিযোগিতায় তাঁর অবস্থান সব সময় শীর্ষে ছিল।'[১২১] লাকী ইনাম এইচ এস সি সম্পন্ন করেন কুমিল্লা উইমেন্স কলেজ, কুমিল্লা থেকে। অর্থনীতিতে বি এ অনার্স করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ সম্পন্ন করেন।

বীজতলায় চারাগাছটি বৃক্ষে পরিণত হয় সঠিক পরিচর্যায়। 'নাট্যজগতের বিস্ময় বুয়েটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ইনামুল হক-এর সঙ্গে লাকী ইনামের পরিচয় যেন আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের। যাদুর পরশ বুলিয়ে তিনি সম্ভাবনাময় মেয়েটিকে পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্তর্নিহিত বিকাশ-উন্মুখ সুকুমারবৃত্তিগুলোর সুষম পরিস্ফুটন নাট্যমঞ্চের বৃত্তে কেন্দ্র খুঁজে নিয়ে তাকে গড়ে তুলেছে ব্যতিক্রম বিভায় শক্তিমান বৃক্ষ হিসেবে।'[১২২] এখন লাকী ইনাম একটি নিবিড় নাট্য-মগ্ন ও সংস্কৃতিমনা পরিবারের মধ্যমণি। স্বামী স্বনামধন্য নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক ড. ইনামুল হক। তাঁর দুই কন্যা ও কন্যা জামাতারা অভিনয় জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও

---

১১৯. বেগম রাজিয়া হোসাইন, শুভ *হোক সম্মুখযাত্রা*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ১৬।

১২০. মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ, (ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২), পৃ.১৩৯।

১২১. বেগম রাজিয়া হোসাইন, শুভ *হোক সম্মুখযাত্রা*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ১৭।

১২২. আতাউর রহমান, *নাট্য ভুবনের জ্যোতিষ্ক লাকী ইনাম*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৯।

জনপ্রিয়। 'ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের ধারাকে অন্তর্গত করে লাকী ইনাম নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও নির্দেশনায় সমান পারদর্শী। মঞ্চ ছাড়াও টেলিভিশন ও বেতার নাটকে লাকী ইনামের পদচারণা দীর্ঘকালের এবং নাট্য অভীপ্সার এই দুই ক্ষেত্রেও তিনি তরঙ্গ তুলেছেন। সবার ওপরে তিনি উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত একজন আদর্শ মা ও স্ত্রী। সামাজিক কর্মকাণ্ড যা সমাজকে পরিবর্তনের নবালোকে আলোকিত করে, সেখানেও লাকী ইনামের ভূমিকা অনস্বীকার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত।'[১২৩]

বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু সময় পরে লাকী ইনাম যুক্ত হন এই নাট্যদলের সাথে। তাইতো বিশিষ্ট নাট্যজন আতাউর রহমান বলেন — 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠালগ্নে লাকী ইনাম ও ড. ইনামুল ছিলেন আমার নিত্যদিনের কর্মসঙ্গী ও নাট্য পরিব্রাজক।'[১২৪] ১৯৭২ সালে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের প্রথম নাটক, আতাউর রহমানের নির্দেশনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বুড়ো সালিকের ঘড়ে রোঁ* নাটকে লাকী ইনাম অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত বেশ কয়েকটি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। আতাউর রহমান বলেন– 'আমাদের প্রাচ্য সভ্যতার একটি বিশ্বাস হলো যে, যাঁর সাথে জীবনে একটি পদক্ষেপ ফেলা হয় তিনি তদীয় সঙ্গীর সত্তার অংশ হয়ে যান। লাকী ইনামের সাথে আমি দীর্ঘ সময় পার করেছি এবং তিনি ছিলেন আমার প্রথম জীবনের নাট্যচর্চার পরম সুহৃদ-সঙ্গী এবং সেই সূত্র ধরে আমি যথার্থই দাবি করতে পারি যে উনি আমার ব্যক্তি ও নাট্য সত্ত্বার অনেকখানি অধিকার করে আছেন।'[১২৫]

১৯৯৫ সালে লাকী ইনাম এবং ড. ইনামুল হক একটি নতুন নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করলেন, নাম দিলেন 'নাগরিক নাট্যাঙ্গন'। তখন থেকে নাট্য রচনা, নির্দেশনা, অভিনয়ের মনিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়ে নাট্য-পত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন নাট্য-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়। লাকী ইনাম অক্লান্তভাবে নাট্য ভুবনে সন্তরণ করেছেন গত ৪৫ বছর ধরে এবং নিরন্তন নতুন কর্মপ্রেরণায় উনি উদ্বুদ্ধ হয়ে চলেছেন। তাঁর মতো নাট্য সংগঠকও আমাদের সমাজে বিরল। লাকী ইনাম এবং তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার বাংলাদেশে একটি নাটকের সংসার পেতেছেন। তাঁদের নিজেদের সংসার ও নাটকের সংসার মিলেমিশে একাকার হয়েছে। লাকী ইনাম নিজের দলের বাইরেও নাট্যচর্চার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন; নাটক রচনা ও নাট্য-নির্দেশনা দান করে। তিনি গত ৪৫ বছর ধরে বিরতিহীনভাবে কাজ করে আমাদের নাট্যচর্চাকে বিপুলভবে সমৃদ্ধ করেছেন।

---

[১২৩] আতাউর রহমান, *নাট্য ভুবনের জ্যোতিষ্ক লাকী ইনাম*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৯।

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

অভিনয় এবং নির্দেশনা ছাড়াও লাকী ইনাম নাটকে কোরিওগ্রাফি, আবহ সংগীত ও পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজন সংগঠক এবং প্রশিক্ষক হিসেবে লাকী ইনাম এক্ষেত্রে পালন করে চলেছেন ঈর্ষণীয় ভূমিকায়। নতুন নাট্যকর্মী সৃষ্টিতে তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে বিস্মিত হতে হয়। মোট কথা, 'সমবায়িক শিল্প নাটকের যেকোনো শাখাতেই উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখি লাকী ইনামের। মৌলিক নাট্যকার হিসেবে, ঔপন্যাসিক হিসেবে, নাট্য অনুবাদক হিসেবে লাকী ইনামের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। বৃত্তান্ত বয়ান, চরিত্র বিশ্লেষণ ও সংলাপ নির্মাণে লাকী ইনামের নৈপুণ্য ধারণ করে আছে তাঁর উপন্যাস *গেরুয়া মাটির পথ*।'[১২৬] এছাড়া ১৯৯৭ সালে নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা 'মহুয়া মিডিয়া কমিউনিকেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত, রাশিয়া, ইউকে, ইউ এস এ, জর্ডাণ, ইরাক, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া নানা দেশ ভ্রমন করেছেন লাকী ইনাম। সম্পৃক্ত আছেন বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা সমূহে। যেমন– 'সাধারণ সম্পাদক, নাগরিক নাট্যাঙ্গন; চেয়ারম্যান, নাগরিক নাট্যাঙ্গন ইন্সটিটিউট অফ ড্রামা; নির্বাহী সদস্য, আই টি আই, বাংলাদেশ কেন্দ্র; ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, টিকেট; জীবন সদস্য, ছায়ানট; উপদেষ্টা, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী; উপদেষ্টা, বাংলাদেশ হেরিটেজ স্টাডি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন; প্রাক্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।'[১২৭]

আজ যারা পাদপ্রদীপের আলোয় সমাগত, তাদের অনেকেরই কাছে লাকী ইনাম– তাঁর অভিনয় নিষ্ঠা, তাঁর অসামান্য গুণপণা, নাটকের প্রতি দায়বদ্ধতা, নাটক যে একটি সম্মিলিত শিল্পযোজনা, সেই বিশ্বাসে তাঁর ক্লান্তিহীন শ্রম এবং শিল্পের চাহিদা পূরণে নিজেকে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার ও নিবেদন প্রভৃতির মাধ্যমে বিরতিহীনভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছেন। ঢাকার মঞ্চে এই চার দশকে তারকার দ্যুতি ছড়িয়েছেন অনেকেই, কিন্তু অবিচল নক্ষত্রের নিশানা প্রদর্শন করেছেন এমন ব্যক্তি মুষ্টিমেয়। লাকী ইনাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও সবিশেষ। তথাপি আমাদের নাটকে নারীর অস্থান যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেনি, তার মূল কারণ নিশ্চিতভাবেই এই সমাজের রক্ষণশীল চারিত্র্য এবং নারীশিক্ষার দুরাবস্থা। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেই প্রায় একশ বছর আগে থেকে এই কথা বললেও, এর জন্য সংগ্রাম করলেও আজও অশিক্ষার অন্ধকার ধূসর করে রেখেছে বাংলাদেশের আকাশ। 'লাকী ইনাম এই পরিস্থিতির বিরোধিতা করেছেন তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* তিনি নির্মাণ করেছিলেন প্রথম মঞ্চে, পরে গণমাধ্যমের জন্য; *সুদূরের দিগন্ত* নামে আমাদের সমাজের ত্রয়ী নারী সংগ্রামী– রোকেয়া, প্রীতিলতা এবং ইলা মিত্রকে নিয়ে মঞ্চে নির্দেশনা দিয়েছেন আর এক প্রতিবাদগাথা; *সরমা* নামে একটি নাটক। রূপান্তর ও নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন,

[১২৬] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পুষ্পিত এক নাট্যজীবন* , (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৫৭।

[১২৭] মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২), পৃ. ১৪১-১৪২।

যেখানে যৌতুকপ্রথার অমানবিকতাকে মধ্যবিত্ত ব্যাখ্যা দানের একটা আবরণ ভেদ করার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রেখটের নাটকের অভিনয়েও নারীর অবস্থানটা তুলে ধরতে চেয়েছেন, এমন কী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাগৈতিহাসিক* নামের ছোটগল্পের অসাধারণ মঞ্চায়নের নেপথ্যেও নারীর অসহায়ত্বের কাহিনি আছে।'[১২৮]

গত দেড় দশকে অভিনেত্রী লাকী ইনাম তাঁর অভিনয়ের পরিচয়কে ছাপিয়ে নাট্যাঙ্গনে 'নাট্য-নির্দেশক' হিসেবে বিশেষ প্রতিভাময়ীর স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো– *সুলতানার স্বপ্ন*, *সরমা*, *আমি বীরঙ্গনা বলছি*, *গৃহবাসী*, *প্রাগৈতিহাসিক*, *সেইসব দিনগুলো*, *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ*, *মুক্তির উপায়*, *বিদেহ* প্রভৃতি নাটক। এ স্বীকৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের নাট্যরূপদান ও নির্দেশনা ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য কাজগুলো হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প– *আপদ*, *মহামায়া*, *মনিহার* ও *শেষ রক্ষা*। লাকী ইনামের এক অনিন্দ্য ও নন্দিত কীর্তি *প্রাগৈতিহাসিক*। সাহিত্য থেকে নাট্যায়নের যে দূরূহ কর্ম তার প্রাথমিক কাজটি করে রেখেছিলেন নাট্যকার মাহমুদুল ইসলাম সেলিম। এরপরের অমসৃণ কাজটি করেছেন নির্দেশক লাকী ইনাম। নাট্য-নির্দেশনায় নির্দেশকের যে সকল অপরিহার্য গুণাবলি আবশ্যক তারও অতিরিক্ত যোগ্যতা অনিবার্য হয়ে পড়ে ধ্রুপদী সাহিত্যের নাট্যায়ন মঞ্চায়নে। কারণ ধ্রুপদী সাহিত্যের যে ভাবনা, বিস্তার ও প্রকাশ তা মঞ্চনাটকের সীমাবদ্ধ পরিসরে উপস্থাপন সর্বত্র সহজসাধ্য নয়। 'অনেক ক্ষেত্রে নাট্য রূপকার ঔপন্যাসিক বা গল্পকারের মানস দর্শনকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে সক্ষম হন না। তখন নির্দেশককে নাট্য রূপকারের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হয় স্বীয় মেধা ও যোগ্যতায়। তাছাড়া মূল সাহিত্য এবং নাট্যরূপকে একত্রে অধ্যায়ন, অনুশীলন, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করেই তাকে মানসপটে দৃশ্যাবলির চিত্রাঙ্কন করতে হয়। ব্যতিক্রম লাকী ইনাম। তাঁর নির্দেশিত বা নাট্যরূপে ধ্রুপদী সাহিত্যের কখনোই অসঙ্গতি সৃষ্টি হয় নি। গত দুই দশক ধরে তাঁর যে নাট্যকর্ম মঞ্চে দেখা গেছে তাতে এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে যে তিনি নিষ্ঠা ও প্রযত্ন জন।'[১২৯]

লাকী ইনাম নারী হিসেবে অবগুণ্ঠন ভেদ করে নিজের নাট্যালোয়ে হয়েছেন উদ্ভাসিত। আমাদের নাটকে যে প্রধান প্রণোদনা 'মুক্তিযুদ্ধ' সেটিকেও উপজীব্য করে নির্মাণ করেছেন নাটক। মুক্তিযুদ্ধ, এতে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান, সর্বোপরি ললাটলিখন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নাট্য-নির্মাণের শৈল্পিক যুদ্ধ-এ ত্রয়ী সঙ্গমে তৈরি হয় লাকী ইনামের নান্দনিক ভুবনের জঙ্গমতা। নিলীমা ইব্রাহীমের *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* লাকী ইনামের অভিনীত ও নির্দেশিত এককাভিনয় প্রসূত নাটক। 'স্বাধীনতা যুদ্ধে লাঞ্ছিত নারীদের বঙ্গবন্ধু মাতৃ সম্মানে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি

---

[১২৮] শফি আহমেদ, *জয়তু লাকী ইনাম*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৩৬-৩৯।

[১২৯] রতন সিদ্দিকী, *সাহিত্যের নাটকে লাকী ইনাম*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৬৫-৬৬।

দিয়েছিলেন। জনকের সিদ্ধান্তে এ নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এসব নারীদের অন্তর্জ্বালা চির প্রবহমান। এ জ্বালা ও অন্তর্দহন লাকী ইনাম নিজের মধ্যে ধারণ করে নির্মণ করেন এ নাটক।'[১৩০] এই নাটক সম্পর্কে লাকী ইনাম বলেন– 'মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো নারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই আমি এই নাটকটির মঞ্চরূপ দিয়েছি। নতুন প্রজন্মের কাছে বীরাঙ্গনাদের অবস্থা উন্মোচন এবং পুরনো প্রজন্মের যারা বীরাঙ্গনাদের উপেক্ষা করে চলেন তাদের দৃষ্টি প্রসারের জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।'[১৩১]

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লাকী ইনামের খোঁড়াখুঁড়ি অব্যাহত আছেই। তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন ইনামুল হক রচিত নাটক *সেইসব দিনগুলো*। ইনামুল হক এ ডকুড্রামা রচনা করেন জীবন ঘেঁষে, নির্দেশক হিসেবে লাকী নির্মাণ করেন মনন ঘেঁষে। জীবন ও মননের মিথস্ক্রিয়ায় এটি হয়েছে অনবদ্য সৃষ্টি। সারাদেশ জুড়েই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন পরিবারে দেখা দিয়েছিলো নানাবিধ সংকট, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বেরই সারাৎসার *সেইসব দিনগুলো*। নির্দেশনার প্রাসঙ্গিকতায় এই নাটকে তিনি ব্যবহার করেন মৌসুমী ভৌমিকের বিখ্যাত 'যশোর রোড' গান। 'নাটকে এ ধরনের প্রাসঙ্গিক সংযোজন এতে নয়া দ্যোতনা দান করে। কলকাতার গঙ্গা-যমুনা উৎসবে এ নাটক প্রদর্শিত হলে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী প্রতিবেশি দেশের বোদ্ধা দর্শক আবেগ আপ্লুত হন। চাপা থাকে না এ হৃদয়গ্রহ। লাকী ইনাম নিজেও অবর্তীন হন অভিনেতৃর ভূমিকায়। নির্দেশক লাকী ইনামের মুন্সিয়ানা এই যে, তাতে তাঁর নিজস্ব ভাবনা সংযোজিত হয়েছে।'[১৩২] মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্য-নির্মাণের সর্বশেষ সংযোজন শাহমান মৈশান-এর *বিদেহ*। ত্রয়ী অভিনেত্রীর ত্রিবেণী সঙ্গমে নির্মিত হয়েছে এ নাটক। বেণীত্রয়– লাকী ইনাম, মোমেনা চৌধুরী ও জ্যোতি সিনহা। এটিও বীরাঙ্গনা কথন। স্বাধীনতার ৪০ বছর ও শিল্পের আলোয় মহান মুক্তিযুদ্ধের ছায়ায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রসবিত এ নাটক। নাটকে নির্দেশক লাকী ইনাম মেধার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এই খ্যাতিমান নির্দেশক লাকী ইনাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষাবিদ, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন :

> আমি স্বীকার করি, নাগরিক নাট্যাঙ্গনের বেশি নাটক আমি দেখতে পারি নি। চলাচল কঠিন এই ঢাকা শহরে ইচ্ছা থাকলেও সবসময় মঞ্চে গিয়ে নাটক দেখা সম্ভব হয় না। তবে দুটি নাটকের কথা এখন মনে পড়ে, এর একটি *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* এবং অন্যটি *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ*। প্রথমটি দেখতে গিয়েছি একটা আবেগ থেকে, যে আবেগটি একাত্তরে আমাদের শক্তি দিয়েছিল

---

১৩০. গোলাম শফিক, *লাকী ইনামের যুযুধান অঙ্গুলিগুচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৭১।

১৩১. সাক্ষাৎকার; নওরিন সাজ্জাদ প্রণীত *অভিনয়ে একক, উপস্থাপনে বৈচিত্র্য : একজন অভিনেতৃর বহুরূপ নাট্যপ্রকাশ* শীর্ষক এম. এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৫), অপ্রকাশিত।

১৩২. গোলাম শফিক, *লাকী ইনামের যুযুধান অঙ্গুলিগুচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৭৪।

পরাক্রমশালী একটি বাহিনীতে দেখা থেকে হটিয়ে দিতে। এবং দ্বিতীয় নাটকটি দেখেছি, যেহেতু নাটক উপলক্ষে প্রকাশিত ব্রোশিওরে আমি একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখেছিলাম। দুটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন লাকী ইনাম। তৃতীয় একটি নাটক দেখেছিলাম, যা ছিল *এন ইন্সপেক্টর কলস* এর বাংলায় রূপান্তর কিন্তু নামটি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এই নাটকের নির্দেশক ছিলেন ড. ইনামুল হক। তবে নাটক দির্নেশনায় লাকী ইনাম খুবই গোছালো। আমার মনে হয়েছে, মঞ্চকে গতিশীল রাখা, এর পরিসরটুকু যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে, তা দেখে এবং চরিত্রদের মধ্যে আদান-প্রদানে একটা টান-টান ভাব রাখাকে লাকী ইনাম গুরুত্ব দেন। আলো, পোশাক এবং শব্দের ব্যাপারে তিনি সমান যত্নশীল। আমার আরো মনে হয়েছে, মঞ্চে প্রাক-প্রস্তুতিতে (যেমন ক্রমাগত মহড়া) তিনি উচ্চমূল্য দিয়ে থাকেন। তার নাটকে মঞ্চের ওপরের এবং পেছনের কুশীলবদের কখনো অপ্রকৃত মনে হয় নি।[১৩৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে লাকী ইনামের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নাট্যকারের ভাব ও ভাষা নিজ অন্তরে অন্তস্থ করে দর্শকনন্দিত উপায়ে উপস্থাপনের জন্য নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন। সে গুণটি লাকী ইনামের রক্তধারায় বিরামহীনভাবে প্রবাহিত। এছাড়াও উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা খুব সহজেই নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক লাকী ইনামের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাই। তবে তিনি যে প্রক্রিয়ায় নির্দেশক হয়ে উঠলেন সে প্রসঙ্গে বলেন :

আমার মনে হয় নির্দেশক হঠাৎ করে হওয়া সম্ভব নয়। আমি ছোটবেলা থেকে শিল্পচর্চা শুরু করে ধাপে-ধাপে এগিয়েছি। বিগত চুয়াল্লিশ বছর ধরে আমি রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে মিডিয়ার সব শাখাতে কাজ করেছি। সকল পরিবেশের সাথে মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছি, শেখার চেষ্টা করেছি, চর্চা করেছি এবং নির্দেশনার কৌশলটাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমি অভিনয় দিয়ে থিয়েটার শুরু করেছি তাই অভিনয়টাকে ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। আলাদা একটা শক্তি নিয়ে অভিনয়টাকে রপ্ত করেছি। অভিনয়টা যখন আমার রপ্ত হয়েছে বলে মনে হলো তখন আমার ইচ্ছে হলো নাট্য-রচনার প্রতি। ১৯৮০ সাল থেকে নাট্য-রচনা শুরু করি। একটা-দুটো মৌলিক নাটক রচনার পর নাটক রূপান্তর শুরু করলাম। যে কাজটা আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের দেশের বর্তমান সমস্যার সাথে বিদেশের অনেক পূর্বের সমস্যা মিলে যায়। ফলে অনুবাদ করতে গিয়ে দেখলাম আমার রূপান্তরটাই ভাল লাগছে। তখন নাটক রূপান্তর করলাম। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমার মনে হলো এখন আমি নাটক নির্দেশনা দিতে পারি বা পারবো। কারণ আমি মনে করি নাটক নির্দেশনা

---

[১৩৩] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *লাকী সিক্স*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত, নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ), ঢাকা : নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ২০১২, পৃ. ৩৩-৩৪।

দিতে গিয়ে কেউ যদি অভিনেতা এবং নাট্যকার হন তবে তাঁর জন্য নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রটি সাংঙ্ঘাতিক সহায়ক হয়। আমি থিয়েটারের এই দুটো বিষয় চর্চা করেই নির্দেশনায় এসেছি। আমার নিজের লেখা নাটক দিয়ে শিশুদের সাথে নির্দেশনার কাজ শুরু করি। শিশুদের নিয়ে কাজ করে নির্দেশনা শিল্পে আমার বেশ অভিজ্ঞতা হলো। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের হয়ে বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* নাটকটিকে কেন্দ্র করে মঞ্চের জন্য একটি নাটক রচনা করে নির্দেশনা দেই। *সুলতানার স্বপ্ন* নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে মঞ্চে আমি একটা 'বায়ুজান' ব্যবহার করি। এটা মঞ্চে উড়াতে নির্দেশক হিসেবে আমার বড় একটা অভিজ্ঞতা হয়। 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' করেছি চব্বিশ বছর কিন্তু সেখানে আমি কোনো নির্দেশনার সুযোগ পাই নি। পরবর্তীতে নিজেরা নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছি। নাম দিয়েছি 'নাগরিক নাট্যাঙ্গন'। দলের প্রথক নাটক নির্দেশনা দিলেন ড. ইনামুল হক। পরের বার আমার সুযোগ এলো। আমি নির্দেশনা দিলাম *সরমা* নাটকটি। এই নাটকটিতে আমি অভিনয়ও করেছিলাম। এই নাটকটি করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে নির্দেশনা কৌশলের সৃজনশীল দিকটা দর্শকের কাছে উন্মোচন করতে পেরেছি। *সরমা*-র পর আমি নির্দেশনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় কাজ করেছি। সর্বোপরি আমার নির্দেশক হয়ে ওঠার পেছনে একটা ধারাবাহিক চর্চা আছে। আমি নাটক নির্দেশনা দিয়েছি সমাজের কাছে দায়বদ্ধতার কারণে। তাই আমার কজে বৈচিত্র্য আসে। এর পরে আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দলে *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* ও *সেইসব দিনগুলো* নাটক নির্দেশনা দেই। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাজ দুটো করে আমার মনে হয়েছে আমি নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের অনেক কৌশল আয়ত্ব করতে পেরেছি। আমার নির্দেশনার কাজের মধ্যে *প্রাগৈতিহাসিক* এবং *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ* নাটক দুটো মঞ্চস্থ করতে গিয়ে আমাকে অনেক পরিশ্রম ও গবেষণা করতে হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে আমি বৈচিত্র্যময় কাজ করেছি। এই ভিন্নতার কারণেই আমার দৃষ্টি ও সাহস বেড়েছে।[১৩৪]

উপর্যুক্ত অভিমতের মধ্যদিয়ে লাকী ইনামের নাট্য-নির্দেশক হয়ে ওঠার 'প্রক্রিয়া' সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি হঠাৎ করে নাট্য-নির্দেশক হয়ে উঠেছেন এমন নয়। তাঁর নির্দেশক হওয়ার পেছনে রয়েছে ধারাবাহিক, লক্ষ্যাভিমুখী ও পদ্ধতিগত চর্চার ফল। তাইতো তিনি বিগত চুয়াল্লিশ বছর থিয়েটারের সকল শাখায় কাজ করে অবশেষে সমাজিক দায়বদ্ধতার কারণে নাট্য-নির্দেশনায় এসেছেন। সমাজের কাছে দায়বদ্ধতার কারণেই লাকী ইনামকে দেখা যায় সমাজের অবহেলিত 'নারী' ও 'মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক' নাটক নির্দেশনা দিতে। লাকী ইনাম অভিনয় করেছেন, পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন, অনুবাদ করেছেন, পোশাক-সংগীত

---

১৩৪. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।

ও নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন এবং শিশুদের নিয়ে নাটক করেছে– এই সব বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক চর্চা করেই নির্দেশনায় এসেছেন তিনি। তাই তো লাকী ইনাম বলেন– 'নাটক নির্দেশনা দিতে গিয়ে কেউ যদি অভিনেতা এবং নাট্যকার হন তবে তাঁর জন্য নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রটি সাংঘাতিক সহায়ক হয়'। সুতরাং থিয়েটারের সকল শাখায় কাজ করে লাকী ইনাম নাট্য-নির্দেশনার 'পদ্ধতি' ও 'কৌশল' আয়ত্ব করতে পেরেছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সর্বোপরি উপরোক্ত উক্তির মধ্যে নির্দেশক লাকী ইনামের নির্দেশক হয়ে ওঠার পেছনে একটা ধারাবাহিক চর্চা, পরিশ্রম ও গবেষণার পাশাপাশি ব্যক্তিগত 'পদ্ধতি' ও 'কৌশল' বিষয়ে ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপন করতে হলে প্রথমেই দরকার একটি ভালো পাণ্ডুলিপি। সেই পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে লাকী ইনাম সংগঠন/গ্রুপকেই প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন– 'আমাদের গ্রুপে একটা প্রোডাকশন সেল ও কমিটি আছে। সেখানে যে কেউ নাটক মঞ্চায়নের জন্য জমা দিতে পারেন। পরবর্তীতে সেই নাটক পাঠ হয়। পাঠ করা হলে লক্ষ্য করি আমাদের পূর্বের প্রযোজনায় কোন 'বিষয়টা' এখনও মঞ্চে আসেনি বা কোন বিষয়টা নিয়ে কাজ হয় নি। যে বিষয়টা নিয়ে নাটক হয় নি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সাথে-সাথে গুরুত্ব দেই নাটকটিতে যেন আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে খাপ খায়। কারণ থিয়েটার তো এখনো মানুষকে সচেতন করে। সমসাময়িক বিষয়টাকে আমরা প্রাধান্য দেই। এই প্রক্রিয়ায় দলের সবার সাথে কথা বলে পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করি।'[১৩৫] নাটক নির্বাচনের পর লাকী ইনাম যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন সে প্রসঙ্গে বলেন– 'নাটক নির্বাচনের পর নাট্যকারের ওপর গবেষণা শুরু করি। *প্রাগৈতিহাসিক*–এর কথায়ই বলি, এটা মঞ্চস্থ করতে গিয়ে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব গল্প পড়ে ফেলেছিলাম। পাঠ করতে গিয়ে মানিকের ভাবনা, দর্শন, সংলাপ ও শব্দ-সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়ে যাই। এভাবে বিদেশী নাট্যকারের নাটক হলেও আমরা গবেষণা করি। পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের সাথে-সাথে আমি নাটক ও নাট্যকার নিয়ে গবেষণা সম্পন্ন করি।'[১৩৬] ক্রমাগত মহড়া শুরু হলে লাকী ইনাম পাণ্ডুলিপি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে ছেড়ে দেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীর মহড়া দেখে তিনি নির্দেশনার জন্য নতুন চিন্তা তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– 'মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাজ দেখে আমি আমার ভাবনার একটা সুতো দেখতে পাই। সুতোটা যেন পাখির ডানার মতো উড়ছে।'[১৩৭] লাকী ইনাম মহড়ায় 'ক্রিয়া'র (এ্যাকশন) পুনঃপুন পরিবর্তন করে থাকেন। ক্রমাগত মহড়ায় নানা কৌশল অবলম্বন করে লাকী

[১৩৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।
[১৩৬] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
[১৩৭] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

ইনাম নাট্য-নির্দেশনা সম্পন্ন করেন। নাটক নির্দেশনা প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– 'আসলে নির্দেশনার কাজে পরিশ্রমটাই মূল কথা।'[১৩৮]

সব নাটকই নাটক নয়। মানে সব পাণ্ডুলিপিকেই যে মঞ্চে আনতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই পাণ্ডুলিপিটি একজন নির্দেশক বেছে নিবেন যার সাথে সমাজ-বাস্তবতার সাদৃশ্য আছে। লাকী ইনাম বলেন :

> আমরা যারা থিয়েটার করতে এসেছি তারা প্রত্যেকেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা না থাকলে আসলে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। একজন ভালো নির্দেশক হতে গেলে দেশ-কাল-জাতি এবং শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হয়। নির্দেশককে অহংকারী হলে চলবে না। তাকে মানুষের সাথে মিশতে হবে। সেই পাণ্ডুলিপিটি নির্দেশক বেছে নিবেন যা দর্শককে কোনো না কোনোভাবে উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম বা তাকে আলোড়িত করতে পারে। ধারাবাহিক মহড়ায় যদি পাণ্ডুলিপির ভিতরে কোনো পরিবর্তন বা সংযোজন করতে হয় সেটাও কিন্তু একজন নির্দেশককে করতে হয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে নাট্যকারের সাথে কথা বলা যেতে পারে। থিয়েটারের ক্ষেত্রে কোন পাণ্ডুলিপি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি নয়। নির্দেশকের হাতে গিয়ে তা পরিবর্তন হতে পারে। তাই নাট্যকারের সাথে নির্দেশকের ভালো সম্পর্ক থাকতে হয়।'[১৩৯]

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, খুব সহজেই নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক লাকী ইনামের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেখানে তিনি প্রথমেই একটি ভালো পাণ্ডুলিপি কথা চিন্তা করেন। কারণ, একটি ভালো পাণ্ডুলিপি থিয়েটারকে একটি শক্ত অবস্থান দিতে পারে। আর তাই তো তিনি পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের জন্য একক স্বিদ্ধান্ত না নিয়ে সংগঠন/গ্রুপকেই প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। যার মধ্যদিয়ে লাকী ইনামের পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় প্রকাশ পায়। এছাড়া তিনি সমাজিক দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করে পাণ্ডুলিপির 'বিষয়' নির্ধারণ করে থাকেন। অতঃপর পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়ার পর তিনি নাট্যকারের পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন সাপেক্ষে থিয়েটারের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। কারণ তিনি মনে করেন, 'থিয়েটারের ক্ষেত্রে কোনো পাণ্ডুলিপিই পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি নয়। নির্দেশকের হাতে গিয়ে তা পরিবর্তন হতে পারে'। অবশ্য তিনি নাট্যকারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের পক্ষে। পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর লাকী ইনাম নাটক ও নাট্যকার নিয়ে 'গবেষণা' সম্পন্ন করে পাণ্ডুলিপি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে ছেড়ে দেন। এবং মহড়ায় তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'ক্রিয়া' (এ্যাকশন) দেখে নাট্য-নির্দেশনার ভাবনা-চিন্তা করতে থাকেন। এই পসঙ্গে তিনি বলেন– 'আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজে একটা সুতো দেখতে পাই।

১৩৮. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।
১৩৯. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

সুতোটা যেন পাখির ডানার মতো উড়ছে'। এভাবেই লাকী ইনাম মহড়ায় 'ক্রিয়া' (এ্যাকশন) পুনঃপুন পরিবর্তন করে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সর্বোপরি লাকী ইনাম নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরিশ্রমটাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

পাণ্ডুলিপি নির্বাচন ও বিশ্লেষণের পর লাকী ইনাম অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে (ট্রাই-আউট এন্ড কাস্‌টিং) মনোনিবেশ করেন। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র নির্বাচন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ষড়ৈশ্বর্য লাকী ইনাম বলেন– 'আমি অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী। যাকে বলে অল-রাউন্ডার। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপ বলার ক্ষমতা থাকতে হবে, তার মানসিক শক্তি থাকতে হবে, সংগীতে পারদর্শী হতে হবে, চরিত্র যদি ডিমান্ড করে ঝাঁপ দেওয়ার তাকে সেটাও পারতে হবে। এইভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করে থাকি। পরবর্তীতে চরিত্র অনুসারে কণ্ঠ, আচার-ব্যাবহার ইত্যাদি বিষয়গুলোও যেন ফিট করে।'[১৪০] লাকী ইনাম একটা চরিত্রের জন্য সাধারণত তিনজন অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করে থাকেন। অনেক সময় তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে-করতে চরিত্র নির্বাচন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি নিয়মানুবর্তিতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পারদর্শীতা ও দক্ষতা একটু কম কিন্তু সে সঠিক সময় মহড়ায় আসে এবং সকল দায়-দায়িত্বে থাকে তাকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অতিথি নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে গেলে তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠের মধ্য থেকেই বেশি চরিত্র নির্বাচন করে থাকেন। লাকী ইনাম অভিনেতা-অভিনেত্রীর আগ্রহটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। চরিত্র নির্বাচনের পর মহড়া কক্ষে লাকী ইনাম লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন (ইম্প্রোভাইজেশন ডিভাইস্) উভয় প্রক্রিয়ায় মহড়া সম্পন্ন করে থাকেন। পাণ্ডুলিপি নির্ভর কাজে তিনি রীতিমত গবেষণা করে নির্দেশনা-পদ্ধতি নির্ধারণ করে মহড়া পরিচালনা করেন। আর ইম্প্রোভাইজেশন বা তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাজের ওপর নির্ভর করে থাকেন। তিনি সাধারণত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গ্রুপে বিভক্ত করে এই ধরনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কাজ পরিচালনা করেন। এই দুই প্রক্রিয়া সংমিশ্রণে তিনি মহড়া পরিচালনা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– 'তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় নির্দেশনার কাজে আমি বেশি আনন্দ পাই। *প্রাগৈতিহাসিক* এবং *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ* নাটকে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বেশি ব্যবহার করেছি।'[১৪১] লাকী ইনাম অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্রিয়ার সাথে নিজের ভাবনার সংযোগ ঘটিয়ে মহড়া পরিচালনা করে থাকেন। চরিত্রায়নের জন্য তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন। এর পরে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা প্রকাশিত অভিনয়ের সাথে তিনি তাঁর নাট্য-নির্দেশনার কৌশলগুলো যুক্ত করে নির্দেশনা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে মহড়ার অগ্রগতির সাথে-সাথে তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে নাট্যকারের

---

[১৪০]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।
[১৪১]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

চিন্তাগুলো নির্দেশনায় ব্যবহার করেন। লাকী ইনাম বলেন– 'নির্দেশককে সুচারু দৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রায়নের কাজটা উপস্থাপন করতে হয়।'[১৪২]

লাকী ইনাম মনে করেন, নির্দেশক হিসেবে প্রত্যেক নির্দেশকেরই একটা দর্শন থাকা উচিৎ। তিনি যে দর্শনে বিশ্বাস করেন সেটা হলো মানব-দর্শন। মানব প্রেম বা মানুষকে কিছু দেয়া সম্ভব এমন আদর্শ নিয়ে তিনি নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। লাকী ইনাম বলেন– 'আমি খুব ছোটবেলা থেকেই বাবার চাকরির সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি। ফলে আমি বিভিন্ন জেলার মানুষের সাথে মিশেছি। বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পবোধটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই দেশজ বোধটা আমার মধ্যে শেকড়ের মতো গেঁথে গেছে। এখন যে কাজই করি না কেন তার মধ্যে একটা দেশজ নাড়ীর টান অনুভব করি।'[১৪৩] লাকী ইনাম তাঁর নির্দেশনার কাজে জীবন ও শিল্প এই দুটোর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে চান। জীবন যে কত গভীর এবং জীবনের ভিতরে যে কত জীবন থাকে সেগুলো তাঁর নির্দেশনায় ব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেকেরই জীবনের ভিতরে আরেকটি জীবন আছে। সেই জীবনটাকে শিল্প-রস দিয়ে সৃষ্টি করাই হলো শিল্প স্রস্টা বা নির্দেশকের কাজ। লাকী ইনাম নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁকে দেখেছি সেই চরিত্রটাকে নিয়ে গভীর মনে কাজ করতে। তিনি বলেন :

> নির্দেশকের কাজের অনেকগুলো পর্যায় বা ধাপ থাকে। প্রত্যেকটি ধাপ অনুসারে নির্দেশককে অভিনেতা-অভিনেত্রীর 'চরিত্র' নিয়ে কাজ করতে হয়। 'চরিত্র' নির্মানের ক্ষেত্রে চরিত্রায়নের সিঁড়িগুলো নিয়ে আমি ভাবি, আমি কোন প্রক্রিয়ায় দর্শকের নিকট সেই সিঁড়িগুলো উন্মোচন করব তা নিয়ে গবেষণা করি। দর্শক আসনে বসে দর্শক যা দেখছে বা ভাবছে তার সাথে নির্দেশকের নির্মাণ কৌশলটাকে সম্পৃক্ত করতে হয়। যাতে যেকোনোভাবেই দর্শকের জীবনের সাথে নাট্য-চরিত্রের জীবনের সম্পৃক্ততা স্থাপন করা যায়। তখন দর্শক অনেক বেশি নাটকটিকে উপভোগ করবে। জীবন ও শিল্পের মধ্যকার সম্পর্কটাকে তৈরি করতে হবে। এই সম্পর্ক তৈরিতে ব্যর্থ হলে নির্দেশকও ব্যর্থ হবেন। তাই নির্দেশককে মহড়ায় বিভিন্ন রকম সৃজনশীল অনুশীলন করতে হয়। দর্শকের অভিরুচির খোঁজ-খবর রাখতে হয়। সমাজের সকল ঘাত-প্রতিঘাত সামলে রেখে নির্দেশককে তাঁর সৃজনশীল কাজটাকে করে যেতে হয়।'[১৪৪]

[১৪২] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।
[১৪৩] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
[১৪৪] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে নির্দেশক লাকী ইনামের নির্দেশনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়। যেখানে লাকী ইনাম অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে (ট্রাই-আউট এন্ড কাস্‌টিং) অভিনেতা-অভিনেত্রী কাজের 'দক্ষতা' ও 'অভিজ্ঞতাকে' গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র নির্বাচন করে থাকেন। তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে অল-রাউন্ডার অভিনেতা-অভিনেত্রীকে খুঁজে বের করেন। তখন তিনি মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে চরিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া (ইম্প্রোভাইজেশন ডিভাইস) নিয়ে কাজ শুরু করেন, যা উপর্যুক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি লিখিত পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের পাশাপাশি ইম্প্রোভাইজেশন করে মহড়া পরিচালিত করে থাকেন। লাকী ইনামের সাথে আলাপচারিতায় যানা যায় তিনি *প্রাগৈতিহাসিক* এবং *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ* নাটকে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বেশি ব্যবহারের কথা। তিনি সাধারণত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গ্রুপে বিভক্ত করে এই ধরনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কাজ দীর্ঘ সময় ধরে করে একটি সার্থক অবস্থানে উপনীত হন। মূলত লাকী ইনাম পাণ্ডুলিপি এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন উভয় প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে মহড়া সম্পন্ন করেন। সেক্ষেতে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন, যা লাকী ইনামের নাট্য-নির্দেশনার একটি বড় গুণ। এছাড়া লাকী ইনাম দর্শক আসনে বসে দর্শক যা দেখছে বা ভাবছে তার সাথে নির্দেশকের নাট্য-নির্মাণ কৌশলকে সম্পৃক্ত করে জীবন ও শিল্পের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। যা লাকী ইনামের নাট্য-নির্দেশনাকে লক্ষ্যে পরিণত করতে সাহায্য করে।

মহড়া প্রক্রিয়া চলার সময় লাকী ইনাম অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন ভালো সম্পর্ক তৈরি না হলে মহড়া কক্ষে কাজ করা কঠিন। আর এই সম্পর্কটা নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ধাপে-ধাপে তৈরি হয়। যা পাণ্ডুলিপি পাঠের মধ্য থেকে শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন :

> সংগঠন/গ্রুপের নিয়ম-নীতি অনুসারে পাণ্ডুলিপি পাঠে সবাই অংশগ্রহণ করবে। এই পাঠের পর্যায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়। মহড়া প্রক্রিয়ায় আমি দীর্ঘ দিন নাটকটি পাঠ করাই। পাঠের পরে প্রত্যেকেই নাটকের আদ্যপান্ত যেনে যায়। এই সময়ে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'বাড়ীর কাজ' দেই। অভিনেতা-অভিনেত্রী সেই কাজ নিয়ে মহড়ায় ফিরে আসে এবং তারা সেগুলো নিজেদের মধ্যে বিশ্লেষণ করে। সেখানে নির্দেশক হিসেবে আমিও অংশগ্রহণ করি। তখন নাট্যকার এবং নাটকটির সাথে আমরা সবাই মিশে যাই। কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে সেটা বড় কথা নয়। এই ধাপ অতিক্রম করলেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। পরবর্তীতে ব্লকিং ও চলন (মুভমেন্ট)-এর সাথে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাথে অনুশীলনে অংশগ্রহণ করি। আমি যে নির্দেশক সেটা তখন ভুলে যাই। মহড়ার শুরুতে থিয়েটার গেমস্, শারীরিক-মানসিক ও বাচিক অনুশীলন করে নেই। এর ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে আমার

একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। আর যখন অভিনেতা-অভিনেত্রী আমার খুব কাছের হয়ে যায় তখন নির্দেশনার সব কথা বলতে সুবিধা হয়। নির্দেশক হিসেবে আমাকে ভয় পায় না। কারণ আমি মহড়ার পরিবেশটা সেরকম করে তৈরি করে নেই। একজন নির্দেশকের পক্ষে চরিত্র নির্বাচন খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু আমার প্রক্রিয়ায় আমি যখন চরিত্র নির্বাচন করি তখন অভিনেতা-অভিনেত্রী কাঙ্ক্ষিত চরিত্র না পেলে তারা কষ্ট পায় না। কারণ ইতোমধ্যে তারা নিজেরা তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে জেনে ফেলেছে। মহড়ায় সম্পর্ক পর্যাক্রমিকভাবে গড়ে ওঠে। চরিত্র নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর আমি নির্দেশক হিসেবে আমার স্বরূপে ফিরে আসি। কারণ তখন নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার বিষয়টা থাকে। কখনো-কখনো নির্দেশককে তার কঠোর রূপটা প্রদর্শন করতে হয়। তা না হলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া আদায় করা সম্ভব হয় না।[১৪৫]

এই উক্তির মধ্যদিয়ে নির্দেশনা 'কৌশল' ও 'প্রক্রিয়া' বিষয়ে নির্দেশকের ব্যক্তিগত ধারণার প্রতিফলন ঘটে। যেখানে লাকী ইনাম মহড়ার শুরুতে– থিয়েটার গেমস্, শারীরিক-মানসিক ও বাচিক অনুশীলন মধ্যদিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে চান। তিনি মহড়ায়– পাণ্ডুলিপি পাঠ, বিশ্লেষণ, ইম্প্রোভাইজেশন বা তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলেন। যার ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে লাকী ইনামের একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। এবং কাঙ্ক্ষিত চরিত্র নির্বাচনেও সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– 'অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে কাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া আদায় করা সম্ভব হয়।'[১৪৬]

মহড়ায় তত্ত্ব-সূত্র বা মেথড প্রয়োগে লাকী ইনাম খুবই স্বাধীনচেতা নির্দেশক। তিনি আকস্মিকভাবে নাট্য-নির্দেশনায় আসেন নি। থিয়েটারে তিনি অনেক সময় দিয়েছেন। তিনি শেখার চেষ্টা করেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন। আতাউর রহমান, আলী যাকের বা অন্য কোনো অতিথি নির্দেশকের নির্দেশনা মেথড বোঝার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি দীর্ঘ সময় এঁনাদের সাথে থিয়েটারে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রুপ করার পর থেকে নির্দেশনা দেয়া শুরু করেন। লাকী ইনাম বলেন– 'আমার শুরুর দিকের নির্দেশনা প্রক্রিয়ার সাথে বর্তমান সময়ে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অনেক বৈপরীত্য আছে। পরিবর্তন যে কোনো নির্দেশকের বেলায় আসাটা স্বাভাবিক। আমারও এসেছে।'[১৪৭] লাকী ইনাম তাঁর নির্দেশনা মেথড প্রয়োগে ব্রেখট-এর এপিক ও এ্যালিয়েনেশন তত্ত্বটাকে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। তিনি প্রয়োজনবোধে স্তানিস্লাভস্কির মেথডও ব্যবহার

---

১৪৫. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬।
১৪৬. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
১৪৭. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

করেন। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– 'আমি ব্রেখট-এর তত্ত্ব-সূত্র বা মেথড বেশি পছন্দ করি এবং সেটা মেনে চলি। আমার নির্দেশিত নাটকের কোথাও না কোথাও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। স্তানিস্লাভস্কির মেথডও প্রয়োগ করি। আমি আমার *গৃহবাসি* নাটকে স্তানিস্লাভস্কির-এর মেথড প্রয়োগ করেছি। আধুনিক থিয়েটারে মেথড বা তত্ত্ব-সূত্র ব্যবহার করতেই হয়।'[১৪৮] তবে উল্লেখ্য লাকী ইনামের নির্দেশিত নাটকগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' ভালো করে জেনে নিয়ে নিজের মতো ব্যবহার করেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি লাকী ইনাম ইংল্যান্ড চলে যান। সেখানে তাঁর সুযোগ হয়েছিল ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের মহড়া দেখার। তিনি বলেন– 'আমি তাদের মহড়া দেখতাম। নির্দেশকের মেথড ও নির্দেশনা কৌশল লক্ষ্য করতাম। প্রায় সারাদিন আমি কাজগুলো দেখতাম। আমি বলবো, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের কিছু কাজ আমাকে উৎসাহিত করেছে। দেশে ফিরে আসার পর যখন থিয়েটার শুরু করি তখন আমি লক্ষ্য করলাম আমার কাজে অবচেন ভাবে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের কাজের প্রভাব পড়ছে।'[১৪৯] লাকী ইনাম মনে করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি তৈরিতে এই ভ্রমণ তাকে কাজে দিয়েছে। তাছাড়া নির্দেশনার বিভিন্ন গ্রন্থও তাকে সহযোগিতা করেছে। লাকী ইনাম সরাসরি কোনো তত্ত্ব-সূত্র বা মেথড অনুসরণ করেন না বলে অবহিত করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে খুব সহজেই নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক লাকী ইনামের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে তিনি যেভাবে কাজটাকে দেখছেন সেটা অবশ্য তাঁর কাজের এক ধরনের 'সহজাত' প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই কর্ম-প্রক্রিয়াকে নির্দেশকের 'স্বতন্ত্র' পদ্ধতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' প্রয়োগ করেন কী না জানতে চাইলে তাঁর ব্যাখ্যায় স্ব-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি দাবি করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো মেথড অনুসরণ করেন না। বরং তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর নির্দেশনা কৌশলের তত্ত্বমূলে রয়েছে তাঁর 'সহজাত' তাত্ত্বিকদৃষ্টিভঙ্গি। তথাপিও তাঁর নির্দেশিত নাটক এবং নাট্য-বিষয়ক একাধিক আলোচনাসূত্রে ব্রেখট, স্তানিস্লাভস্কিসহ একাধিক তাত্ত্বিকের অভিমত ব্যবহার করতে দেখা যায়। তিনি বলেন- 'আমি ব্রেখট-এর তত্ত্ব-সূত্র বা মেথড বেশি পছন্দ করি এবং সেটা মেনে চলি। আমার নির্দেশিত নাটকের কোথাও না কোথাও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। স্তানিস্লাভস্কির মেথডও প্রয়োগ করি। আমি আমার *গৃহবাসি* নাটকে স্তানিস্লাভস্কির-এর মেথড প্রয়োগ করেছি।'[১৫০] তিনি মনে করেন শিল্পের কর্ম-প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত কিছু আবিষ্কারের পেছনে যে

---

১৪৮. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।

১৪৯. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

১৫০. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

জিনিসটির অত্যধিক প্রয়োজন তা হলো নিরলস পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা বোধ । এ দু'য়ের সম্মিলিত প্রয়াশে অবশ্যই সৃষ্টিশীল কিছু উপহার দেওয়া সম্ভব।

লাকী ইনাম থিয়েটারের জন্য শিক্ষণ-প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি এক্ষেত্রে দূর্বলতার কথা তুলে ধরে বলেন– 'আমরা যারা থিয়েটার করতে এসেছিলাম তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে দেখে, শুনে ও পড়ে শিখেছি। কিন্তু বর্তমানে একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীও শুদ্ধ করে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে না। তারা সহজ ভঙ্গিতে মঞ্চে দাঁড়াতে পারে না। চোখে-চোখে তাকিয়ে সংলাপ বলতে পারে না। সংলাপ বলার সময় কথা জড়িয়ে যায়।'[১৫১] তাই তিনি শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। থিয়েটার করতে হলে অবশ্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা একজন নির্দেশকের চিন্তাশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে ও তাঁকে ক্রমস সৃজনশীল করে তুলে। এই প্রয়োজনীয়তা থেকে ২০০৫ সালে লাকী ইনাম প্রতিষ্ঠা করেন 'নাগরিক নাট্যাঙ্গন ইন্সটিটিউট অব ড্রামা' । নতুন প্রজন্মের মধ্যে নাট্যবোধ সঞ্চারে এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একজন নির্দেশক এবং প্রশিক্ষক হিসেবে লাকী ইনাম এক্ষেত্রে পালন করে চলেছে ঈর্ষণীয় ভূমিকা।

নির্দেশক হিসেবে লাকী ইনাম প্রযোজনার ডিজাইনিং প্রক্রিয়াটা পাণ্ডুলিপি পাঠ থেকে শুরু করেন। এই সময়ে লাকী ইনাম বেছে নেন– মঞ্চ, আলোক, পোশাক, সংগীত ও প্রপ্স্ ডিজাইনারদের। তখন থেকেই ডিজাইনাররা তার নিজ-নিজ পরিকল্পনা শুরু করেন। নাটকটি ডিজাইনের কোন স্টাইলে হবে সেটা নির্দেশক প্রাথমিকভাবে ডিজাইনারদের সাথে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। ডিজাইনারগণও তাদের দায়িত্ব পালনে প্রতি মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। ধারাবাহিকভাবে ডিজাইনারা নির্দেশককে খসড়া পরিকল্পনা দেখাতে থাকেন। লাকী ইনাম বলেন– 'নাটকে সংগীত পরিকল্পক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ তাকে সবসময় মহড়ায় আসতে হয়। মহড়া দেখে অনুধাবন করতে পারে কোথায় কোনো প্রকার সংগীত ব্যাবহার হবে বা নির্দেশক কোন সংগীত আশা করেন।'[১৫২] ডিজাইনাররা মহড়ার নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের পেপার ওয়ার্ক নির্দেশকের কাছে হস্তান্তর করে থাকেন। এভাবে শুরু করে দলের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে মঞ্চ ও পোশাক পরিকল্পনা নির্ধারণ করে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– 'বিবিধ গবেষণা করে পরিকল্পনাগুলো ফাইনাল করি। তবে অলোর ক্ষেত্রে আমরা দরিদ্র কারণ কারিগরি মহড়ায় না যাওয়া পর্যন্ত আলোর কাজটা আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।'[১৫৩] নির্দেশনার ক্ষেত্রে লাকী ইনাম মঞ্চের মডেল তৈরি করেন। পোশাকের ক্ষেত্রেও তাঁরা সস্তা কাপড় কিনে মডেল তৈরি করে থাকেন। তাছাড়া কাগজেও ড্রয়িং এবং স্কেচ করেন। এমন কি তাঁরা রঙ

---

[১৫১] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।
[১৫২] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
[১৫৩] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

নির্বাচনে কালার চার্ট করেন। ডিজাইনিং ফাইনাল হলে লাকী ইনাম অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামনে সবকিছু তুলে ধরেন। লাকী ইমান সাধারণত মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনাটা একজন ডিজাইনার দিয়ে করতে পছন্দ করেন। যদি ডিজাইনারের আগ্রহ থাকে। তিনি মনে করেন এই কাজটা একজন ডিজাইনার করলে নির্দেশকের আকাঙ্ক্ষ অনুযায়ী কাজটা সহজ হয় এবং দুটি পরিকল্পনার মধ্যে সমঝোতা থাকে। এক্ষেত্রে ডিজাইনার ও নির্দেশকের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশক ও ডিজাইনারদের ধৈর্যশীল থাকার পক্ষে লাকী ইনাম। দুজনে দুজানার কথা শুনে ডিজাইনের কাজটা শেষ করতে পারলে একটা সফল পরিকল্পনা করা সম্ভব।

লাকী ইনাম তাঁর নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে শুধু নির্দেশনা প্রক্রিয়াটি নিয়েই থাকেন না, একই সাথে তিনি মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা, প্রযোজনা-ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ, দর্শক সমাবেশকরণ, প্রচার ও ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। লাকী ইনাম বলেন– 'থিয়েটার তো এখন আর শখের বিষয় নয়। এখন থিয়েটার করতে হলে অনেক ব্যয় আছে।'[১৫৪] মহড়ার স্থান নির্ধারণ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বিষয়ে দায়িত্ব-প্রাপ্ত লোক আছে কিন্তু তার পরও তিনি মূল-মূল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। লাকী ইনাম বলেন– 'অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে অনেকেই চাকরি করেন। চাকরি থেকে বেড়িয়ে তাকে রাস্তায় যানজটে পড়তে হয়। পূর্বে আমরা যেটা করতাম তা হলো ঠিক সন্ধ্যা ৬ টায় মহড়া শুরু হলেই দড়জা বন্ধ করে দিতাম, আর কাউকে মহড়ায় ঢুকতে দিতাম না। কিন্তু একটা পর্যায় লক্ষ্য করলাম এভাবে তো থিয়েটার করা যাচ্ছে না। তাই পরবর্তীতে আমরা কিছুটা ছাড় দিতে শুরু করি। এখন অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে। তাদের শুক্র ও শনিবার পরীক্ষা থাকে। এখন সবকিছু মিলে মহড়ার সময়-সীমার ক্ষেত্রে অনেক ছাড় দিতে হচ্ছে।'[১৫৫] লাকী ইনাম দর্শকের প্রতিক্রিয়া এবং সমালোচনা গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকেন। তবে তিনি মনে করেন যাঁরা নাটকের সমালোচনা করবেন তাঁরা যেন অবশ্যই নাটকটা দেখেন। জেনে-বুঝে সমালোচনার পক্ষে তিনি মতামত দেন। তিনি মনে করেন নির্দেশককে উন্নাসিক হলে চলে না। সবার মতামত গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হয়। অনেক সময় মতামতের মধ্যে ভালো কিছুও বের হয়ে আসতে পারে।

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, লাকী ইনামের নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্রেখট ও স্তানিস্লাভস্কি-এর এ্যাকটিং মেথড বা তত্ত্বকে অভিনয়ের কার্যকর উপায় হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনা-কৌশল (পঞ্চ-সূত্র) প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। এক নজরে তাঁর নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়– পাণ্ডুলিপি নির্বাচন (দলগত সিদ্ধান্ত), পাণ্ডুলিপি পাঠ, ইম্প্রোভাইজেশন, ব্লকিং, কম্পোজিশন, চরিত্রায়ণ, মঞ্চ, পোশাক, আলোক, আবহ সংগীত ও প্রপ্স পরিকল্পনা

[১৫৪]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬।)
[১৫৫]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

এইরূপ ক্রম তিনি অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু এই নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর (চরিত্রের) যৌক্তিক উপস্থিতি নির্ণয়ে 'কৌশলগত পদ্ধতি' বা সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর অবস্থান এরকম যে, নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কোনো 'তত্ত্ব' বা 'মেথড' অনুসরণ করে নয় বরং মেথড সম্পর্কিত সহজাত চিন্তা ও পদ্ধতির 'অজান্তে' প্রয়োগকেই কার্যত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। তবে লাকী ইনাম থিয়েটারের জন্য শিক্ষণ-প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁর মতে, 'প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা একজন নির্দেশকের চিন্তাশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে ও তাঁকে ক্রমস সৃজনশীল করে তুলে।'[১৫৬] সত্তরের দশকের মাঝা-মাঝি লাকী ইনামের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের মহড়া দেখার সুযোগ ঘটেছিল। সেই মহড়ায় তিনি নির্দেশকের 'মেথড' ও 'কৌশল' বিষয়ক অনুশীলন লক্ষ্য করতেন। এই প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন, 'ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের কিছু কাজ আমাকে উৎসাহিত করেছে। দেশে ফিরে আসার পর যখন থিয়েটার শুরু করি তখন আমি লক্ষ্য করলাম আমার কাজে অবচেন ভাবে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার বিভাগের কাজের প্রভাব পড়ছে।'[১৫৭] সুতরাং এই উদ্ধৃতির মধ্যদিয়ে লাকী ইনামের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের সপক্ষে স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা বিষয়ে লাকী ইনামের মূল্যায়ণ হলো– 'আমি দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে নাট্যাঙ্গনে কাজ করছি। লক্ষ্য করছি সময়ের তুলনায় নির্দেশকের সংখ্যা বাড়ে নি। নতুন প্রয়োগ-কৌশল, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা ইত্যাদি দেখানোর মতো নির্দেশকের সংখ্যা খুবই হাতে গোণা। তবে হ্যাঁ বিগত পাঁচ বছর যাবত নাট্য-নির্দেশনার কাজে নতুনরা ভাল করছে। সময় পেলেই আমি তরুণদের নির্দেশিত নাটকগুলো দেখে থাকি। তাদের কাজ দেখে আমার মনে হয়েছে তারা আমাদের চেয়ে ভালো কাজ করছে।'[১৫৮] অতত্রব লাকী ইনামের এরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গি বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকর্মীদের সৃজনশীল নাট্য-নির্মাণে উৎসাহীত করবে।

এতক্ষণের আলাপনসূত্রে মেথড এ্যাকটিং এবং নির্দেশকের দায়িত্ব ও কর্ম-কৌশল বিষয়ে লাকী ইনামের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গেলেও 'নির্দেশনা কৌশল' বা পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর অবস্থান অনেকটাই অস্পষ্ট। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'পঞ্চ-সূত্র' প্রয়োগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে লাকী ইনাম বলেন– 'প্রত্যেক নাটকেই কিছু বিন্যাস (কম্পোজিশন) থাকে। নাটকভেদে কম্পোজিশনের তারতম্য হয়। আমি *প্রাগৈতিহাসিক* নাটকে 'বাগদী'–দের বিয়ের দৃশ্যে একটি কম্পোজিশন তৈরি করি। এটা প্রথমদিকের মহড়ার সময় ছিল না। পরবর্তীতে সংযোজন করেছি। ধাপে-ধাপে নাটক যখন তৈরি হয়ে যায় তখন

---

[১৫৬] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।

[১৫৭] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

[১৫৮] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

কম্পোজিশনগুলোকে হেলদি করি। *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ* নাটকেও আমি কোরিওগ্রাফী ও কম্পেজিশন ব্যবহার করেছি।'[১৫৯] দৃশ্যায়ন (পিকচারাইজেশন) ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি দৃশ্য ধরে-ধরে নির্দেশনায় কাজ করেন। দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে লাকী ইনাম অনেক পরিবর্তন ঘটান। লাকী ইনাম বলেন– 'একজন নির্দেশককে কল্পনায় দৃশ্যটাকে ছবির মতো দেখতে হয়। নির্দেশকের আলাদা দুটো চোখ থাকতে হবে। দর্শকের হয়ে দৃশ্যায়নটা দেখতে হয়।'[১৬০] লাকী ইনাম সমালোচনা করে বলেন বয়স্ক নির্দেশকরা চলন (মুভমেন্ট) ব্যবহারে সতর্ক থাকেন না। কিন্তু নিজেকে তিনি ব্যতিক্রম মনে করেন। তাঁর মতে– 'মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চলনের ওপরে থাকতে হয়। আমি যদি স্থবিরতা দিয়ে সংলাপ বলি তাহলে দর্শকও স্থবির হয়ে যাবে। দর্শককে সব সময় এমন একটা অবস্থায় রাখতে হবে যাতে সে সবসময় তৈরি। ব্যতিক্রম ছাড়া আমি আমার নির্দেশিত নাটকে চলনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে এক্ষেত্রে নির্দেশকের পরিমিতিবোধ থাকতে হয়।'[১৬১] লাকী ইনাম চলনের সাথে ছন্দ (রিদম) কে যুক্ত করেন। লাকী ইনাম বলেন– 'যে পদ্ধতিই হোক নির্দেশকে নাটকে যথাযথ ছন্দ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রের ছন্দ বুঝে নির্দেশক নাটকে লয়ের তারতম্য তৈরি করলে নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমি সংগীতের মানুষ। তাই এই ছন্দ ব্যবহারের ছাড় দেই না।'[১৬২] নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইনিক ড্রামাটাইজেশন) সম্পর্কে লাকী ইনাম বলেন– 'এই কৌশলটা আমি নাটকে ব্যবহার করি। নাটকে এমন মুহূর্ত আসে যখন কোনো সংলাপ থাকে না। যেখানে একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা সংযোগ স্থাপন করেন। এটা কখনো-কখনো নাটকে ডিমান্ড করে। যেমন– সবাই স্তব্ধ কিন্তু তার মধ্যে একজন স্থান পরিবর্তন করল কিছু অঙ্গ-ভঙ্গি করে। এই নিরবতার মধ্যে নির্বাক অভিনয় অনেক বিশেষ অর্থ তৈরি করে।'[১৬৩]

'পঞ্চ-সূত্র'-বিষয়ক উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, লাকী ইনামকে মেথড এ্যাকটিং বিষয়ে পাশ্চাত্যের ব্রেখট ও স্তানিস্লাভস্কি-এর ওপর যতোটা গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়, নির্দেশনা কৌশল হিসেবে পঞ্চ-সূত্রের প্রায়োগিক বিষয়ে ততোটা নয়। 'দৃশ্যায়ন' (পিকচারাইজেশন) সম্পর্কিত তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্য হলো– 'একজন নির্দেশককে কল্পনায় দৃশ্যটাকে ছবির মতো দেখতে হয়। নির্দেশকের আলাদা দুটো চোখ থাকতে হবে। দর্শকের হয়ে দৃশ্যায়নটা দেখতে হয়।'[১৬৪] এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের 'দৃশ্যায়ন' সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, দৃশ্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মঞ্চে চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক

---

১৫৯. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬।
১৬০. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
১৬১. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
১৬২. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
১৬৩. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)
১৬৪. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য।)

নির্দিষ্টকরণ। সংল্লাপ নয়, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফূট করা। সেহেতু বলা হয়– ‘Picturization is the visual interpretation of each moment in the play’। এক কথায় দৃশ্যায়ন বা পিকচারাইজেশন হচ্ছে নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রগুলোকে মঞ্চে এমন ভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে চরিত্রগুলোর পরস্পরের প্রতি যে আবেগময় সম্পর্ক ও মনোভঙ্গি এবং দৃশ্যের যে নাটকীয় পরিস্থিতি রয়েছে তা যেন কোনো সংলাপ বা ক্রিয়া ছাড়াই দর্শকের বোধগম্য হয়। এছাড়া চলন (মুভমেন্ট) বিষয়ে লাকী ইনাম বলেন– ‘মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চলনের ওপরে থাকতে হয়। আমি যদি স্থবিরতা দিয়ে সংলাপ বলি তাহলে দর্শকও স্থবির হয়ে যাবে। দর্শককে সব সময় এমন একটা অবস্থায় রাখতে হবে যাতে সে সবসময় তৈরি। ব্যতিক্রম ছাড়া আমি আমার নির্দেশিত নাটকে চলনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে এক্ষেত্রে নির্দেশকের পরিমিতিবোধ থাকতে হয়’। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ের ‘চলন’ সম্পর্কিত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– ‘চলন প্রকাশ করে মঞ্চে ক্রিয়ারত কোনো চরিত্র বা চরিত্রসমূহের বিশেষ ভাবকে। কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চক্ষেত্রে হাঁটা-চলাই চলনের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরীরের সমস্ত রকম ভঙ্গিই চলনের অন্তর্ভুক্ত’। সুতরাং পঞ্চ-সূত্র বিষয়ে লাকী ইনামের উচ্চারিত উক্তিগুলোর কৌশলগত যুক্তি দ্বারা নয় বরং একটি ধারণাগত উক্তি হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। কারণ এই উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে নাট্য-নির্দেশক হিসেবে লাকী ইনামের কোনো সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পায় না। তা সত্ত্বেও তৃতীয় অধ্যায়ে লাকী ইনাম নির্দেশিত– *বিদেহ* নাটকের প্রায়োগিক কৌশল বিশ্লেষণে পঞ্চ-সূত্রের কিছু উপাদানের কার্যকর উপস্থিতি এবং অর্থপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে।

নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে লাকী ইনাম প্রতিষ্ঠিত ‘পঞ্চসূত্র’কে গ্রহণ না করলেও পাশ্চাত্যের একাধিক নাট্যকার ও নির্দেশকের কর্ম-প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এমনকি মহড়াকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাবলীল উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মেথড এ্যাকটিং-এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়টির ওপরেও বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। নির্দেশনা প্রক্রিয়া বিষয়ে এই দীর্ঘ আলোচনার পাশাপাশি তাঁর নির্দেশিত নাটক পর্যবেক্ষণেও এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে– নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্যের নাট্য-চিন্তা বিশেষত স্তানিস্লাভস্কি’র পদ্ধতিগত অভিনয় এবং ব্রেখটক’এর নির্দেশনা কৌশলকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লাকী ইনাম বলেন– ‘কোনো বিশেষ তত্ত্ব-সূত্র বা মেথড অনুসরণ করেন না বরং সব সূত্রকে মাথায় রেখেই কাজ করি।’[১৬৫] সুতরাং তিনি যেভাবে কাজ করেন তাকে তিনি নিজস্ব সূত্রের মতো মনে করেন। চর্চার মধ্যদিয়ে লাকী ইনাম তাঁর নাট্য অভিজ্ঞতা এবং পরিধিকে বাড়াতে চান। নারী হিসেবেও কোনো রকম সীমাবদ্ধতায় তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান না। কূয়ার ব্যাঙ হয়ে থাকতে চান না। নির্দেশক লাকী

[১৬৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬।

ইনাম নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ মেথড আবিষ্কারে সক্ষম না হলেও নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দেশজ শিকড় ব্যবহারে সক্ষম হয়েছেন। তাই তো তিনি বলেন– 'আমি খুব ছোটবেলা থেকেই বাবার চাকরীর সূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি। ফলে আমি বিভিন্ন জেলার মানুষের সাথে মিশেছি। বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পবোধটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই দেশজ বোধটা আমার মধ্যে শেকড়ের মতো গেঁথে গেছে। এখন যে কাজই করি না কেন তার মধ্যে একটা দেশজ নাড়ীর টান অনুভব করি।'[১৬৬] পাশ্চাত্য ও দেশজ এই দুই পদ্ধতির সংশ্লেষের মধ্যদিয়েই লাকী ইনামের নির্দেশনা প্রক্রিয়ার একটি মিশ্ররূপ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। মূলত তিনি 'মিক্সড ফরমে' কাজ করে থাকেন, আর এর মূলে রয়েছে ব্যক্তি লাকী ইনামের পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য। তবে পাশ্চাত্য নাট্যকলা বিষয়ে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নির্দেশনার কৌশল সম্পর্কিত আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা'র 'পঞ্চ-সূত্র' বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এমনটা অন্তত তাঁর এই দীর্ঘ আলাপনে পরিলক্ষিত হয় না। তারপরও তিনি নাট্য-নির্দেশনায় যে নব পন্থা উন্মোচন করেছেন যেটি তাঁর একান্ত সৃষ্টি বলে আমরা ধরে নিতে পারি। সাহিত্যের নাটকে লাকী ইনাম তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নৈপূণ্য দেখিয়েছেন। সমাজ-সংসারের শত-সহস্র জীবনাংশ তিনি চরিত্র নির্মিতিতে প্রয়োগ করে চরিত্রটিকে যেমন বিশ্বাসযোগ্য, আকর্ষণীয় করেছেন তেমনি নাট্য চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত লক্ষণগুলোকে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি নাটক পাঠের অভ্যন্তরীণ উহ্য পাঠকে অনুধাবন করে চরিত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যের নাটক এত বেশি দর্শকনন্দিত ও বিদগ্ধজন প্রশংসিত। নারী হিসেবে লাকী ইনাম সকল অবগুণ্ঠন ভেদ করে নিজের নাট্যালোয়ে হয়েছেন উদ্ভাসিত। আবার আমাদের নাটকের যে প্রধান প্রণোদনা 'মুক্তিযুদ্ধ' সেটিকেও উপজীব্য করে নির্মাণ করেছেন নাটক। মুক্তিযুদ্ধ, এতে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান, সর্বোপরি ললাটলিখন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নাট্য-নির্মাণের শৈল্পিক যুদ্ধ-এ ত্রয়ী সঙ্গমে তৈরি হয় লাকী ইনামের নান্দনীক ভুবনের জঙ্গমতা। দীর্ঘ সময়ের নিরলস চেষ্টা, সাধনা, সততা আর প্রজ্ঞার মধ্যদিয়ে অনেক দুর্বোদ্ধ নাটকের প্রযোজনা আমরা লাকী ইনামের নির্দেশনায় পাই। তাৎপর্যপূর্ণ উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দেশনার ক্ষেত্রে লাকী ইনাম প্রতিষ্ঠিত কোনো একটি মেথড বা তত্ত্ব-সূত্র অনুসরণ করতে চান নি। তাই তো নির্দেশক হিসেবে তিনি সর্বদাই একাধিক নাট্য-চিন্তা বা তত্ত্বের সমন্বয়ে নির্দেশনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। উপর্যুক্ত আলাপন-সূত্র বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বলা যায় যে, নির্দেশক লাকী ইনাম 'নির্দেশনা'কে একক ব্যক্তির শিল্প-চিন্তাপ্রসূত সৃজনকর্ম হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত সৃজন প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। যে প্রক্রিয়ায় নির্দেশনার সফল বাস্তবায়নে অভিনেতা-অভিনেত্রী, ডিজাইনার এবং নির্দেশকের উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বিত অভিব্যক্তিকেই প্রধান বিবেচ্য বলে

[১৬৬] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৩-০৩-২০১৬।

মনে করেছেন। তবে মেথড এ্যাকটিং বিষয়টিকে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অত্যাবশ্যকীয় উপায় হিসেবে মেনে নিলেও নির্দেশনার ক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগে তিনি কোনো একক সূত্র বা তত্ত্বকে উপায় হিসেবে না দেখে বরং একটি সমন্বিত সৃজন-প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে আগ্রহী। 'নির্দেশনা' বিষয়ে নির্দেশক লাকী ইনামের প্রদত্ত এই সকল চিন্তা এবং ধারণাগত অভিব্যক্তির আলোকেই অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর নির্দেশিত *বিদেহ* নাটক বিশ্লেষণসূত্রে পুনঃনিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসরাফিল শাহীন

এ পর্যায়ে নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন-এর নির্দেশনা 'কৌশল' ও 'পদ্ধতি' নিয়ে আলোচনায় মত্ত হবো। যিনি দীর্ঘ সময় ধরে শুধু নাট্য-নির্দেশনার কজটিই করে এসেছেন নিমগ্নচিত্তে। ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনার মহড়ায় অনুশীলনের মধ্যেই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সম্ভাবনা ইত্যাদির সঞ্চিত রূপকে খুঁজেছেন। খুঁজে চলেছেন নাট্যশিল্পের চিরন্তন সত্যকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নাট্য-নির্দেশনায় পাশ্চাত্য নির্দেশনা তত্ত্বে মোহাবিষ্ট হয়ে যে কজন নির্দেশক নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন। ১৯৬৫ সালে পঞ্চগড়ের রসেয়ায় নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এই নির্দেশক। বাবা মোঃ ইব্রাহিম মিয়া ও মা জুলেখা বেগম। কীভাবে নাটকের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেন এই প্রশ্নের উত্তরে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> শৈশবে শিল্পের কোনো শাখাতেই আমার প্রশিক্ষণ বা চর্চা ছিল না। এমন কি পরিবারের মধ্যেও ছিল না। তবে পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পশ্চিম বাঙলায় এক ধরনের পরিবেশনা ছিল যার নাম ধামেল গান বা হুলি গান। এই গানের সুর, ছন্দ সকাল-বিকাল ও মধ্যরাতে শুনতাম যা আমার ভাল লাগতো। তাছাড়া শীত মৌসুমে আমাদের অঞ্চলে বিভিন্ন লোকজ মেলা হতো। সেখানে যাত্রা, সার্কাস, যাদু খেলা ইত্যাদি পরিবেশনা হতো। এই যাত্রা বা অন্যান্য লোকজ পরিবেশনাকে আমার মামারা পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং মামারা যাত্রায় অভিনয় করতো। সেখান থেকেই শিল্পের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। তবে সচেতনভাবে আমি এটা বলছি না যে, সেখান থেকেই শিল্পের প্রতি আমার ঝোঁক তৈরি হয়েছে। অবচেতনভাবে এই সব পরিবেশনার প্রভাব আমাকে আলোড়িত করতে পারে। এটা বলতে পারি ঐ সব পরিবেশনার আওয়াজ, ধ্বনি, সুর শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমি গ্রামের মেলায় ঘুরে যাদু দেখতাম, লটারীতে অংশগ্রহণ করতাম, সার্কাস দেখতাম এবং নানা ধরনের বাহারী খাবার খেতাম। বিশেষ করে কাঠের কুপ তৈরি করে সার্কাসের মধ্যে মটর সাইকেল নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতো, সেই পরিবেশনা আমি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতাম। সারারাতব্যাপী যাত্রা দেখতাম। এই সবকিছুই আমার কাছে বড় স্মৃতি হয়ে আছে। তবে এটা বলছি না যে, এগুলোই আমাকে নাটকের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আমি এগুলোকে বলছি বাল্যস্মৃতি।[১৬৭]

---

১৬৭. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

১৯৭৩ সালে ইসরাফিল শাহীন ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলে প্রতিনিয়ত ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে তিনি কবিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে অনেক পুরস্কার কুড়িয়েছেন। ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> স্কুলেই আমার প্রথম অভিনয়। আমি যখন সপ্তম/অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি তখন বার্ষিক নাটক হিসেবে *মানুষ গড়ার কারিগর* নাটকে অভিনয় করি। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক নিয়ে এই নাটকের প্লট গঠিত ছিল। স্কুলের বেঞ্চগুলোকে একত্র করে মঞ্চ তৈরি করেছিলাম। বাড়ি থেকে শাড়ি এনে তা দিয়ে উইসং এবং সাজসজ্জা করতাম। এছাড়া স্কুলের বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় যেমন খুশি তেমন সাজো নামে একটা বিশেষ ইভেন্ট থাকতো। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমি পুরস্কার জিতেছিলাম। এখানে কেউ মুক্তিযোদ্ধা, মুচিওয়ালা, বর-বধূ এবং বাদামওয়ালা ইত্যাদি ভূমিকায় অবতীর্ন হতো। স্কুলের এই পরিবেশনাগুলো আমাকে তাড়িত করেছে। স্কুলের পাশাপাশি ঠাকুরগাঁও পাবলিক লাইব্রেরিতে জাতীয় দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান হতো তা আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতাম। এই অনুষ্ঠানের নাচ, গান সহ অন্যান্য পরিবেশনা আমার ভালো লাগতো। আমি স্কুলে স্কাউটিং করেছি। স্কাউটে যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হতো সেখানেও অংশগ্রহণ করতাম।[১৬৮]

ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুল থেকে এসএসসি শেষে রাজশাহী কলেজে এইচএসসি-তে ভর্তি হন ইসরাফিল শাহীন। এই সময়ই তাঁর শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। তখন তিনি অনেক নাটক পড়েছেন। গল্প-উপন্যাস ও কবিতার প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। তিনি বলেন– 'বুঝে না বুঝে অনেক দার্শনিকের বই পড়েছি।'[১৬৯] রাজশাহী ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রতিনিয়ত যাতায়ত করতেন ইসরাফিল শাহীন। এই সময়ই তাঁর গান ও নাটকের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। তখন তিনি নিজস্ব একটা লাইব্রেরি তৈরি করেছিলেন। যার নাম দিয়েছিলেন 'নলেজ গার্ডেন'। বাংলা করলে মানে দাঁড়ায় জ্ঞানের বাগান। ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'এই সময় আমার জীবনে কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। সবকিছু এলোমেলোর মধ্যদিয়ে করার চেষ্টা করেছি। তবে এই সময়ে ধারাবাহিকতা না থাকায় আমার জীবনের একটা পরিবর্তন আসে সেটা হলো আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি না।'[১৭০]

কলেজ জীবন শেষ করে ইসরাফিল শাহীন ঢাকায় চলে আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোচিং শুরু করেন। এই কথা বলার কারণ হচ্ছে এই কোচিং চলাকালীন ইসরাফিল শাহীন ১৯৮২-৮৩ সালে ছাত্র প্রকল্পের

---

১৬৮. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

১৬৯. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

১৭০. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

হয়ে অটোরিক্সা চালাতেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে অটোরিক্সা দেয়া হতো যা ছাত্ররা সারাদিন চালিয়ে বিকেলে আবার জমা দিয়ে আসতো। তিনি ছয় মাস এই টেক্সি চালিয়েছেন। এই সময় তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। তিনি হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় এক বন্ধুর মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কণ্ঠশীলনের সাথে পরিচিত হন। এবং এর প্রশিক্ষক ড. বিপ্লব বালার সাথেও পরিচয় ঘটে। তখন তিনি টি এস সি কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো দেখা শুরু করেন এবং ড. বিপ্লব বালার কবিতা ও ছড়ার সাথে যুক্ত হতে শুরু করেন। এই সময় ইসরাফিল শাহীন নিজ উদ্যোগে টি এস সি-তে ব্যক্তিগতভাবে উচ্চারণচর্চা শুরু করলেন। ছাত্র প্রকল্পের হয়ে অটোরিক্সা চালিয়ে যে উপার্জন হয়েছিল তা দিয়ে বন্ধুরা মিলে ইন্ডিয়া বেড়াতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন ইসরাফিল শাহীন। ইন্ডিয়া বেড়াতে যাবার পথে বর্ডারে নাট্যজন মামুনুর রশীদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে ইসরাফিল শাহীনের। মামুনুর রশীদের সাথে অনেক কথার মাঝে ইসরাফিল শাহীন তাঁর নাট্যদলে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পরে ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি মামুনুর রশীদের আরণ্যক নাট্যদলে যুক্ত হলেন। এখানে ইসরাফিল শাহীন মামুনুর রশীদের নাট্য-নির্দেশনা পদ্ধতি, কৌশল, দর্শন এবং তাঁর চিন্তার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলেন। প্রথম দিকে তিনি দলের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন এবং কাজ দেখার সাথে-সাথে কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় শুরু করলেন। মিলানায়তন ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে নাটকের সেট আনা-নেয়ার দায়িত্বে যুক্ত হন। ইসরাফিল শাহীন আরণ্যক ও শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আলেকজান্ডার স্টিলমার্ক, বার্টল্ট ব্রেখটের *একসেপশন এন্ড দ্য রোল* এই টেক্সটিকে ভিত্তি করে ব্রেখটিয়ান নাট্যরীতি সম্পর্কে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। সেখানে ব্রেখটিয়ান স্ক্রিপ্ট, রাজনীতি, প্রয়োগ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বিশেষ করে দর্শকের সামনে নাটক উপস্থাপনার জন্য যে সূক্ষ্মতা, যে খুঁতহীনতা দরকার এই রকম বিষয়ে তিনি চার্জড হয়েছিলেন। আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংলিশ নির্দেশক দেবরা ওয়ার্ণার শেকসপিয়রের *টেম্পেস্ট* নাটকটিকে ভিত্তি করে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। সেখানেও নাটক অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং অভিনয় ভাবনা প্রয়োগের দিক থেকে নানান নতুন স্বাদ পান ইসরাফিল শাহীন। এই কর্মশালাটি অভিজ্ঞতায় একটি অন্য মাত্রা যোগ করে ইসরাফিল শাহীনের। আলেকজান্ডার স্টিলমার্ক-এর কর্মশালা সম্পর্কে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'এই কর্মশালায় আলেকজান্ডার স্টিলমার্ক যে প্রক্রিয়ায় 'নাটকটি বিশ্লেষণ' করেছেন, যেভাবে এর 'ক্রিয়া বিশ্লেষণ' করছেন তা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। মার্কসীয় সামাজিক জায়গা থেকে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জায়গা থেকে এই কর্মশালাটি আমাকে বেশ আলোড়িত করে এবং নাটক নিয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা লাভ করি।'[১৭১] এই

[১৭১]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

কর্মশালাটি নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনকে নাট্য-নির্দেশনা জগতে বিশ্লেষণাত্মক মনের খোরাক জুগিয়েছে বলে তাঁর ধারণা। পাশাপাশি আরণ্যকের কর্মশালা এবং চিন্তা দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। নাট্য-নির্দেশনা যে একটি প্রক্রিয়া, এর জন্য যে অনুসন্ধান লাগে, কাজে লেগে থাকা প্রয়োজন এই শিক্ষাগুলো তিনি আরণ্যক নাট্যদলের কাজ থেকে পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'এই সময় নাটক ছাড়া আমার কোনো চিন্তা ছিল না। শুধু চিন্তা ছিল নাটক নিয়ে কাজ করার। আমি কাজে পরিশ্রমটাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আমি মনে-মনে ভাবতাম নাট্য-নির্দেশনার জন্য ধৈর্যের বিকল্প পথ নেই। লেগে থেকে আগ্রহ নিয়ে কাজ করে গেলে সাফল্য একদিন আসবেই।'[১৭২]

ইসরাফিল শাহীন আরণ্যক নাট্যদলের একটি বিশেষ ফর্মে কাজ করেছেন। সেটা হলো মুক্ত নাটক। কেন বলছে মুক্তনাটক? কারণ এই নাটক কোনো বদ্ধ গল্প ও পূর্ব প্রস্তুতি থেকে হতো না। এর কোনো পাণ্ডুলিপি থাকত না। একটি লোকালিটিতে গিয়ে টার্গেট গ্রুপের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো খুঁজে-জেনে সেখান থেকেই তৈরি করে নেওয়া হতো নাটকের পাণ্ডুলিপি। আর সেই নাটক গ্রামের মানুষেরাই অভিনয় করতো। মুক্তনাটক প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> মুক্তনাটকের কোনো কর্মীকে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনয়ের বিচিত্র বিদেশী 'তত্ত্ব' কিংবা এরিস্টোটলীয় কাহিনি কাঠামো কিছুই পড়ানো হতো না। তো সেই মুক্তনাটকে এমন সব কৃষক, শ্রমিক অভিনেতাও দেখেছি যারা আবেগ, উদ্দীপনা, মনঃসংযোগ, শক্তি, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার এমন প্রকাশ, অভিনয়ের এমন স্ফুলিঙ্গ তৈরি করত-যা তারা কোনো 'অভিনয় তত্ত্ব' পড়ে শেখে নি। এ তাহলে অভিনয়ের কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা, কীভাবে তৈরি হয়ে যেত এই শিল্প? তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি আপনারা কি গ্রটস্কির থিয়েটার, স্কোরিং, হোলিঅ্যাক্টর কিংবা স্তানিস্লাভস্কির মেথড অব অ্যাক্টিং, ব্রেখটের ড্রামাটিক ও এপিক থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্যকরণ, এলিয়েনেশন অথবা মেয়ারহোল্ডের বায়োমেকানিকস, কন্ট্রাকটিভিজম, ফ্লেক্সোলজি অথবা যদি প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারের প্রেক্ষিতে ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রভিত্তিক ভাব, রস, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিকাভিনয়ের নানা তত্ত্বকথা পড়ে এসে কি অভিনয়ের এই সৌন্দর্য তৈরি করেছেন? তাঁরা কী উত্তর দেবেন। এই অভিনেতা-অভিনেত্রী তো সেই পাঠ, প্রশিক্ষণ ও পারদর্শিতা না থাকা সত্ত্বেও, এমনকি কোনোদিন অভিনয় না করেও এক ভালোলাগায় অভিনয় করতে পেরেছে। মুক্তনাটকের অভিনেতারা না জেনে, না শিখে কীভাবে একটি

[১৭২] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

চরিত্র নির্মাণ করল এবং দর্শকের ভেতরে দাগ কেটে দিলো। একে কী বলা যায়? অলৌকিক? এই সৃষ্টির প্রণোদনা কোথায় থাকে?'[১৭৩]

সেই মুক্তনাটকের সাথে ইসরাফিল শহীন ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। মামুনুর রশীদের মুক্তনাটকের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। আরণ্যকের হয়ে আব্দুল্লাহেল মাহমুদের *নানকার পালা* মঞ্চনাটকে অভিনয় করে ইসরাফিল শাহীন প্রশংসা কুঁড়িয়ে ছিলেন। এই নাটকটি তাঁকে একটা ভালো অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তাছাড়া আরণ্যকের *ইবলিশ* ও *সমতট* নাটকে তিনি অভিনয় করেন। *নীলা* পথনাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। এছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংলিশ নির্দেশক দেবরা ওয়ার্ণার শেকসপিয়রের *টেম্পেস্ট* নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেখানে ইসরাফিল শাহীন অভিনয় করে প্রশংসা কুঁড়িয়ে ছিলেন। ১৯৮২-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত যে দলগুলো নাটক নিয়ে ঢাকা সফর করেছে তাঁদের কাজ দেখেছেন ইসরাফিল শাহীন। তাঁদের সাথে কথা বলেছেন। বোঝার চেষ্টা করেছেন তারা কোন প্রক্রিয়ায় 'নাট্য-নির্দেশনা' দিয়ে থাকেন। এক অনুসন্ধিৎসু মন ছিল ইসরাফিল শাহীনের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক (১৯৮৭) শেষে ১৯৮৮ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামাতে (এনএসডি) নাট্যকলা বিষয়ে পড়তে যান ইসরাফিল শাহীন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাট্যশিক্ষা শুরু হলো তাঁর। এনএসডি-তে টোটাল থিয়েটার নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। সেখানে তাঁর পাঠক্রম ছিল 'নির্দেশনা' বিষয়ে তথাপি অভিনয়, নির্দেশনা, ডিজাইনিং, সংগীত, বাচিক, মুভমেন্ট, যোগব্যায়াম, মুখোশসহ টোটাল থিয়েটারের সব বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা শুরু হয় তাঁর। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'নাট্যশিক্ষার এই তীর্থক্ষেত্রটি দিল্লির মান্ডি হাউজে অবস্থিত। মান্ডি হাউজের চারদিকেই দিল্লির সমস্ত কালচারাল সেক্টর। সেখানে আমরা অভিনয়, নির্দেশনা ও পরিকল্পনার প্রায়োগিক তাত্ত্বিক পড়াশোনা করি। সেটা আমি উপভোগও করেছি। সকাল ৮.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০টা। চা-বিরতি পর আবার শুরু হতো মহড়া চলত রাত ১০.০০ পর্যন্ত। সেখানে ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের নাট্য শিক্ষকদের সাহচর্যে নাটক পড়েছি। অভিনয়ের কাজটাকে বুঝতে চেয়েছি। সেই সময়টাতে হোস্টেলের আড্ডায়, লাঞ্চে, ডিনারে, ফিল্ম দেখতে-দেখতে অথাৎ সার্বক্ষণিক একটা পারস্পরিক অ্যাকশন-রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে কাজে থেকেছি। তা তো অবশ্য আমাদের শেখা বা ম্যাচিউরিটির পথেই নিয়ে গেছে।'[১৭৪] ইসরাফিল শাহীন-এর সাথে আলাপনে জেনেছি এনএসডি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য কোনো কারপণ্য নেই এই প্রতিষ্ঠানের। তাইতো

---

[১৭৩] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

[১৭৪] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

এনএসডি প্রতিনিয়ত কর্মশালার আয়োজন করে দেশি-বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা। সেই বিশেষজ্ঞদের কর্মশালাগুলোতে ইসরাফিল শাহীন অংশগ্রহণ করেছেন নিমগ্নচিত্তে। কর্মশালায় তিনি ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও জার্মানীর বিশেষজ্ঞের সাথে কাজ করেছেন। বাচিকাভিনয়ের ওপর সিসিলি বেরীর সাথে কর্মশালা করেছেন। কমেডিয়া ডেল আর্টের ওপর কর্মশালা করেছেন। এছাড়া ভারতের হাবীব তানভীর, কানহাইলাল, রতনথিয়াম, প্রসন্না এবং পানিকারের সাথে কাজ করেছেন। ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-এর আশে পাশে যে অডিটরিয়ামগুলো আছে সেখানে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হতো। এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পরিবেশনাও অনুষ্ঠিত হতো। যখনই সুযোগ পেতাম তখনই এই পরিবেশনাগুলো দেখতাম। পিনা বাউস-এর ব্যালে দেখেছি, চীনের বিভিন্ন দলের অপেরা দেখেছি, বিরজু মহারাজের নৃত্য দেখেছি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশজ পরিবেশনা দেখেছি এবং ক্লাসিকাল সংগীত শুনেছি। সব মিলিয়ে এনএসডি-তে একটা মহা কর্মযজ্ঞের মধ্যে ছিলাম।'[১৭৫]

১৯৯১ সালে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে নাট্যকলা (নির্দেশনা) বিষয়ে স্নাতকোত্তর শেষ করেন ইসরাফিল শাহীন। পরে এনএসডি-এর এক বছর ফেলোশিপ নিয়ে ভারতের কেরালা, কর্ণাটক, মনিপুর ইত্যাদি প্রদেশে স্থানীয় আধিবাসীদের রিচুয়াল নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। যা ছিল থিয়েটারের ফর্মে। এর পরে ইসরাফিল শাহীন কলকাতায় চলে আসেন এবং কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি (১৯৯৯) সম্পন্ন করেন। যখন কলকাতায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি করছিলেন তখন একই সঙ্গে ওখানে পাঠদান করেছেন। তাঁর পিএইচ.ডি গবেষণার অভিসন্দর্ভ ছিল বাংলাদেশের 'পথনাটক' নিয়ে। তাঁর পিএইচ.ডি-এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. বিষ্ণু বসু এবং মনোজ মিত্র। কলকাতায় অবস্থানকালে ইসরাফিল শাহীন পদাতিক নামে একটি হিন্দি নাট্যদলের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই নাট্যদলে তিনি একটি অভিনয় স্কুল খুলেছিলেন। এছাড়াও অনামিকা কলাসঙ্গম নামে আর একটি অভিনয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতার নাট্যচর্চা সম্পর্কে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'কলকাতায় বাদল সরকার, সফদার হাসমী এবং পাঞ্জাবের গুরুসরণ সিং-দের সাথে কাজ করেছি এবং ঘুরে বেড়িয়েছি। এখানে বিভিন্ন নাট্য দলের নাটক দেখেছি, পরিচিত হয়েছি। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ফর্ম-এর সাথে যুক্ত থেকেছি। বাদল সরকার দল নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেছেন তখন আমিও তাঁদের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে বের হয়ে সে যে কাজ করেছেন সেই কনসেপ্টগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। আমি বর্তমানে যে কাজ করেছি সেখানে বাদল সরকার আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন। এছাড়াও কলকাতার অনেক কর্মশালা

[১৭৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

করিয়েছি।’[১৭৬] উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে বলা যায় যে, একজন সফল অভিনেতা ও নাট্যকারের মতো একজন সৃজনশীল ও খ্যাতিমান নাট্য-নির্দেশক হওয়ার জন্য যে ধরনের অনুশীলন ও চর্চার প্রয়োজন রয়েছে সব গুণই রয়েছে ইসরাফিল শাহীনের মধ্যে। নিয়মিত পরিশ্রম, কাজে লেগে থাকা এবং অনুশীলন এই সব গুণই রয়েছে তাঁর কাজের মধ্যে। নাট্য বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইসরাফিল শাহীনের উল্লেখযোগ্য নির্দেশিত নাটকগুলো হলো– কলকাতা পদাতিক নাট্যদলের হিন্দি ভাষায় প্রযোজিত *টুয়েলফথ নাইট*, *পুতুল খেলা*, *রাজা ঈডিপাস*, *উরুভঙ্গম*, *রোমিও এন্ড জুলিয়েট*, *এ ডলস হাউজ*, *মৃচ্ছকটিক*, *টোবাটেক সিং*, *ম্যাকবেথ*, *লেডি ফ্রম দ্য সি*, *ওয়েটিং ফর গডো*, *থ্রি সিস্টার্স*, *সিদ্ধান্ত*, *দ্য বার্থডে পার্টি*, *দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু*, *দ্য মাউসট্রাফ*, *দ্য উড বি জেন্টেলম্যান*, *দ্য মারচেন্ট অব ভেনিস*, *সাঁঝবেলার বিলাপ* ইত্যাদি এছাড়া যাত্রা পালা *সাজাহান এবং সোহরাব রুস্তম।*

ইসরাফিল শাহীন-এর সাথে ‘নাট্য-নির্দেশনা’ বিষয়ে আলাপনকালে তিনি বলেন– ‘[নির্দেশক] কথাটি আমি সাধারণত বলি না। আমি আমার লেখাতে এই শব্দ বিষয়ে আপত্তি করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সমন্বয়কারী বা সহায়ক। নির্দেশক শব্দটায় একটা হায়ারার্কি বিষয় চলে আসে। শিল্পে হায়ারার্কি বিষয়টাকে আমি বিশ্বাস করি না।’[১৭৭] ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনা ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন– ‘এই সৃজনশীল কাজে যাঁরা আমার সাথে যুক্ত হন তাঁরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন। কখনো-কখনো তাঁরা অনুশীলনের সময় আধ্যাত্মিক স্তরে চলে যান। সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে অবশ্যই বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। আত্মীয়তা তৈরি করতে হবে। অনাসাম্বল তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি নির্দেশ না করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর নির্দেশও কখনো-কখনো শুনে থাকি।’[১৭৮] ইসরাফিল শাহীন নিজেকে একজন ভালো সমন্বয়কারী হিসেবে দাবি করেন। সবার সাথে মিলে-মিশে কাজ করতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। কাজের ক্ষেত্রে তিনি নতুন-নতুন চিন্তা প্রয়োগ করতে পারদর্শী। তাঁর মহড়ায় গেলে লক্ষ্য করা যায়, সহজাতভাবে তিনি নতুন-নতুন ভাবনা যুক্ত করছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃজনশীল চিন্তার খোরাক যোগাতে তিনি সদা পারঙ্গম। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হলো– ‘তথাকথিত নাট্য-নির্দেশনা ক্রিয়ায় আমি বিশ্বাসী নই। আমি পাণ্ডুলিপি পাঠ করি। পাণ্ডুলিপিতে নাট্যকার যা উল্লেখ করেন নি সেই ক্রিয়াগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এই অদৃশ্য ক্রিয়াগুলোকে নিয়ে আমি অনেক ইম্প্রোভাইজেশন করে থাকি। নানা ধরনের অনুসন্ধান চালাই।

[১৭৬] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

[১৭৭] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

[১৭৮] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্রের চিন্তা-ভাবনা, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও স্বাত্ত্বিক প্রস্তুতির জায়গাগুলো নিয়ে বেশি কাজ করে থাকি।[১৭৯]

ইসরাফিল শাহীন মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উৎসাহী করতে পারেন। এটা তাঁর কাজের একটা বড় গুণ। তিনি সৃজনশীল চিন্তা দিয়ে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন। তিনি মহড়ায় অনুশীলনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতির জন্য পরিশ্রম, ধৈর্য, চর্চা এবং অনুশীলনে তিনি বিশ্বাস করেন। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুশীলনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। প্রস্তুতির জন্য ধৈর্য, চর্চা ও অনুশীলনে আমি বিশ্বাস করি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তত্ত্ব-সূত্র অথবা আমার নিজস্ব তত্ত্ব ও অবজারভেশন আছে সেগুলো আমি প্রতিনিয়ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে আলোচনা করে থাকি। আমার নাট্য-নির্দেশনার মূল বিষয় হলো অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতির বিষয়। চরিত্রায়ন করতে গিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী চরিত্রের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করে সেই বিষয়কে আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে, পালাক্রমে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো নির্মাণ করে থাকি। প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে শত রকম শর্ত অতিক্রম করে আমি মহড়ায় কাজ করতে চাই। চরিত্রের মনোস্তত্ত্ব, মনদৈহিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে কাজ করতে চাই। এই সব শর্তগুলো বুঝে অভিনেতা-অভিনেত্রী নিজের মধ্যে বিশ্বাস এবং আস্থা এনে ধীরে-ধীরে যখন রূপান্তরিত হয় তখন ভালো লাগে। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে যেভাবে যুক্ত হই তা হলো মা-এর সন্তান উৎপাদনের মতো। মা যেভাবে আমাকে তাঁর পেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাসের পর মাস সময় দিয়ে ধীরে-ধীরে বড় করে তুলেছে এবং এক সময় জন্ম দিয়েছে। সেভাবে একটা সন্তান উৎপাদনের মতো করে নাটকের চরিত্রগুলোকে তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে যুক্ত হই। মা যদি সন্তান উৎপাদনে তাড়াহুড়া করে, ঝুঁকি নেয় অথবা আন্তরিক না হয়, প্রেম না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, ধৈর্য না থাকে তাহলে সন্তানের প্রতি যে চাপ তৈরি হয়। সেভাবেই অভিনেতা-অভিনেত্রী তার চরিত্রকে নিয়ে সময় দিয়ে ধীরে-ধীরে গড়ে তুলবে। আমি সময় নিয়ে কাজ করতে বিশ্বাসী। আমি দর্শকের সামনে নাটক নেয়ার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতির সময়টাকে বেশি উপভোগ করি। আমরা তো অনেক নাটক করি বা অন্যরা নাটক করেন, তার পরেও অনেকের চিন্তা-চেতানা বা দর্শনের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর এই চরিত্র নির্মাণ থেকে আমি কি শিক্ষা গ্রহণ করলাম, দর্শককে জ্ঞান দেবার পূর্বে। আমি জ্ঞান আহরণ করছি কী না

[১৭৯] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজ থেকে নতুন উদ্যোগ আসছে কি না বা নতুন চিন্তা-চেতনা তৈরি হয়েছে কি না সেটা জরুরি। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তার জীবনের জন্য নাটক থেকে শিক্ষা নিতে হবে। নিজে শিক্ষা নিয়ে অন্যকে শিক্ষা দিতে হবে।[১৮০]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইসরাফিল শাহীনের ব্যক্তিগত ধারণার প্রতিফলন ঘটে। মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতি ও অনুশীলনকে গুরুত দিয়ে নতুন উদ্যোগ বা নতুন চিন্তা-চেতনার মধ্যদিয়ে জ্ঞান আহরণে তিনি বিশ্বাসী। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে যুক্ত হন মা-এর সন্তান উৎপাদনের মতো করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'মা যেভাবে আমাকে তাঁর পেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাসের পর মাস সময় দিয়ে ধীরে-ধীরে বড় করে তুলেছে এবং এক সময় জন্ম দিয়েছে। সেভাবে একটা সন্তান উৎপাদনের মতো করে নাটকের চরিত্রগুলোকে তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে যুক্ত হই'। তার মানে ইসরাফিল শাহীন ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে, পালাক্রমে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে যুক্ত হন। সময় নিয়ে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, মনোদৈহিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কাজ করে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় কাজ করে তিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের তত্ত্ব-সূত্র ও তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব এবং অবজারভেশন কাজে লাগিয়ে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'আমি জেনে বুঝে নাটক করতে এসেছি। আমি শিল্প নিয়ে থাকতে চাই। তাই আমি মনোযোগটাকে অন্য কোথাও না নিয়ে শিল্পের জন্য বই পড়তে চাই, আলোচনা করতে চাই, আড্ডা দিতে চাই এবং ঘুরে বেড়াতে চাই।'[১৮১] ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনা কৌশল লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঘুরে বেড়ানো তাঁর কাজের একটা বড় দিক। তিনি ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে মিশতে চান। দেখতে চান বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের। তাদের সাথে বসতে চান, কথা বলতে চান, শুনতে চান তাদের অজানা কথা। তিনি মনে করেন এভাবেই তাঁর শিল্পভাবনা ও দর্শন গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

শিল্পের প্রতি দায়িত্ব থাকতে হবে, কিছু করার তাগিদ অনুভব করতে হবে। এই গুণগুলো না থাকলে নাটকের দর্শন তৈরি হবে কী করে। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবেই কিন্ত সেটা যেন একরৈখিক না হয়। আমাদের সমাজের অসংখ্য মানুষ সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে জেল খেটেছে, নির্যাতন ভোগ করেছে। তাই ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের, সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি-ভঙ্গি রেখে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে চাই। শিল্পের মধ্যদিয়ে সমাজের বৈষম্য দূর করতে চাই। শিল্পের দর্শন

---

১৮০. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

১৮১. প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

হিসেবে এটা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলো যেন সুষম অবস্থানে থাকে এবং সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে চাই। মৌলিক চাহিদাগুলো সকল মানুষ যেন সমানভাবে ভোগ করতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি সচেতন থাকতে চাই। তা না হলে নাটক আমি কেন করবো? নাটক তো সমাজের বাইরের কিছু নয়। এটা একটা সামাজিক ক্রিয়া। নাটকের মধ্যদিয়ে সমাজ, রাষ্ট্রের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করতে চাই। সমাজিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে নাটক করতে চাই, শিল্পচর্চা করতে চাই। শিল্প জীবনের বাইরের কিছু নয়। জীবনের সাথে জীবন আর নাটক সম্পর্কযুক্ত। তবে অবশ্যই জীবনটা নাটক নয় । আবার নাটকও জীবন নয়। এই দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটাকে একজন শিল্প-স্রষ্ঠা হিসেবে, একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে বুঝতে হবে যে কী করে জীবনের কার্য-কারণ ঘটে। জীবনের নানান খুঁটিনাটি, সম্পর্ক, ঘটনা, অঘটন ইত্যাদি যদি না খুঁজে দেখি বা জীবনের অদৃশ্য ঘটনাগুলো না বুঝি তাহলে জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া ঘটবে কী করে। সৃজনশীল চোখ থাকতে হয় নির্দেশকের। শিল্প জীবনের অনুকরণ নয়। এখানে সিলেকশন এবং এরেজমেন্টের প্রয়োজন হয়। তাইতো শিল্প-স্রষ্ঠাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। কারণ জীবনের ঘঠনাগুলোকে শিল্পে নিয়ে আসার জন্য অনেক বেশি বিশ্লেষণাত্বক মন থাকতে হয়। রুচি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার হয়। যিনি সৃজনশীল শিল্পী বা নাট্য-নির্দেশক তিনি কিন্তু টের পান কোন বিষয়টি তাঁর শিল্পের জন্য জরুরি। তাই নির্দেশকের পর্যবেক্ষণ, অনুবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণাত্বক মন থাকতে হয়। তাহলেই জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া ঘটবে। শিল্পে উদ্দেশ্য থাকতে হয়। জীবন থেকে শিল্প বুননের উপাদান সংগ্রহ করে নাট্য-নির্শেককে সৃজনশীলতা দিয়ে, বোধ দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হয়। তখনই শিল্প জীবন থেকে রূপে, গন্ধে, স্বাদে আলাদা বৈশিষ্ট্য পাবে।[১৮২]

উপর্যুক্ত অভিমতের মধ্যদিয়ে নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইসরাফিল শাহীনের নিজস্ব দর্শন ও শিল্পভাবনা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শিল্পের জন্য তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি অনুসন্ধান করেন যার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বিশ্লেষণাত্বক মন আছে। মৌলিক চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রে যিনি সুষম অবস্থান এবং সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে পারেন। ইসরাফিল শাহীন জীবনের নানান খুঁটিনাটি, সম্পর্ক, ঘটনা, অঘটন ইত্যাদি বিষয় খুঁজে বের করে জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে চান। সেক্ষেত্রে তিনি সিলেকশন এবং এরেজমেন্টের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। অনেক বেশি পরিশ্রম, রুচি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ঘুরে বেড়ানো, পর্যবেক্ষণ, অনুবেক্ষণ, বিশ্লেষণাত্মক মন,

[১৮২] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

সৃজনশীল চোখ, ধৈর্য, চর্চা এবং অনুশীলনে তিনি বিশ্বাস করেন। এভাবেই তিনি জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে নাট্য-নির্দেশনায় অব্যহত রয়েছেন।

সামাজিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইসরাফিল শাহীন নির্দেশনার জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। তিনি শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুশীলনের জন্যই পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করেন না। এমন কি দর্শকের কথা চিন্তায় রেখেও নির্বাচন করেন না। তিনি পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে বলেন– 'অনেক ক্ষেত্রে নাট্য-নির্দেশক নিজেদের বাদ দিয়ে দর্শকের কথা চিন্তা করে পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, আমি মনে করি নাটকটি আমাকে কী শিক্ষা দিচ্ছে বা কী বোধ আমার মধ্যে জাগ্রত করছে। আমি নির্দেশক হিসেবে সেখান থেকে কী শিখছি। প্রথমে আমার জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকি।'[১৮৩] ইসরাফিল শাহীন নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে চান। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার জন্য, উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি যে শিক্ষা গ্রহণ করলেন সেটা আবার বাস্তবায়ন করতে চান। তিনি বলেন– 'নাট্য-নির্দেশক হিসেবে আমি নবী নই। আমি নির্ভুলও নই। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে হেদায়েত করতে পারবো না। আর যাঁরা নির্দেশক হিসেবে নিজেকে শিল্প-স্রষ্টা মনে করেন আমার মনে হয় তাঁরা ভুল করেন। কারণ নির্দেশককে অহংকারী হলে চলে না। কেউ যদি নিজেকে নির্ভুল মনে করেন সেখানে আমার দ্বিমত আছে। আমি নিজেকে শুধরানোর জন্য প্রথমে পাণ্ডুলিপি নির্ধারণ করি। এর পর দেখি নাটকটি যাঁরা দেখবেন তাঁদের এই পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু পাওয়ার, বোঝার আছে কি না। যাঁরা নাটকটি দেখবেন তাঁদের মনের মধ্যে কোনো ঝড়, তর্ক-বিতর্ক বা নতুন চিন্তার খোরাক তৈরি করতে পারে কি না। এসব কিছু ভেবে আমি পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকি।'[১৮৪] পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন পাণ্ডুলিপি বার-বার পাঠ করেন। মাঝে-মাঝে মহড়ায় বসে পাণ্ডুলিপি পাঠ শুনে থাকেন। তখন তিনি নাট্যকারের বর্ণিত ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। এমন কি তিনি যখন প্রত্যাহিক জীবনে চলাফেরা করেন তখনও তাঁর মধ্যে নাটকের প্লট, বিষয় ও চরিত্র নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি সার্বক্ষণিকভাবে নাটকের মধ্যে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> আমি বর্তমানে কাজ করছি জ্যঁ রাসিনের *ফেইড্রা* নাটকটি নিয়ে। নাটকটি মঞ্চায়ন করতে গিয়ে আমি শুধু নাটকের গল্পটা নিয়ে ভাবি। চলতে ফিরতে মনে-মনে বলি গল্পটা কী? আমি কিন্তু নাটকের পাণ্ডুলিপি পরিস্কারভাবে জানি। তারপরও বলি গল্পটা কী? শুরু হয় এরকম চিন্তা দিয়ে। পরবর্তীতে ভাবি নাট্যকার যে গঠন কাঠামো দিয়ে গল্প শুরু করেছেন আমি কি সেভাবেই দর্শকের সামনে নাটকটি

[১৮৩] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।
[১৮৪] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

মঞ্চস্থ করবো, না কি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করবো। এভাবে অনেক চিন্তা করি। ভাবি থিয়েটারের এই গুরুগম্ভীর নাটকটি দর্শকের সামনে কীভাবে উপস্থাপন করবো। তখন মনে-মনে নাটকের দৃশ্যগুলোকে দর্শকের সামনে পরিবেশন করি। এবং ভাবি দর্শক এই গল্প থেকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করবে। তখন নিজেকে দর্শক হিসেবে বসাই। নানান প্রেক্ষাপটে নিজেকে বসিয়ে ভবি নাটকটা দেখে দর্শক কীভাবে প্রতিক্রিয়া করছে। সেক্ষেত্রে অন্য একটি চিন্তা মাথায় ক্রিয়া করে। যেমন আমি ভাবি আমাদের দেশের হিন্দি বা বাংলা সিরিয়াল দেখা দর্শক ও চলচ্চিত্রের দর্শকের প্রত্যাশা পূরণের জন্য *ফেইড্রা* নাটকটি কীভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করবো। কোন প্রক্রিয়ায় পরিবেশন করলে সেই দর্শক নাটকটি দেখবে। এসব দিকে এখন লক্ষ্য রাখতে হয়। সমাজের মনস্তত্ত্ব বুঝে একজন নাট্য-নির্দেশককে নাটক দর্শকের সম্মুখে নিয়ে আসতে হয়। বর্তমানে যে ফেনোমেনাগুলো দর্শককে গ্রাস করেছে সেগুলো চিহ্নায়ন করে সৃজনশীল দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে নাটক উপস্থাপন করতে হয়। আমি বলি *ফেইড্রা* কেন মঞ্চস্থ করবো? এই যে কেন করবো। এখান থেকেই আমি নতুন-নতুন চিন্তার খোরাক পাই।[১৮৫]

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্র থেকে খুব সহজেই নাটক নির্দশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত তিনি নিজের জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পর নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন পাণ্ডুলিপি বার-বার পাঠ করেন। মাঝে-মাঝে মহড়ায় বসে পাণ্ডুলিপি পাঠ শুনেও থাকেন। এর ফলে তিনি যে শিক্ষাগ্রহণ করলেন সেটা আবার বাস্তবায়ন করতে চান। সেক্ষেত্রে ইসরাফিল শাহীন মাঝে-মাঝে পাণ্ডুলিপি হুবহু গ্রহণ করেন। আবার কখনো-কখনো পাণ্ডুলিপির সাথে ইন্টারটেক্স তৈরি করেন অথবা ইম্প্রোভাইজেশন করে মহড়া পরিচালিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি দর্শকের দিক বিবেচনা করে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তিনি নাটকের জন্য আবাসিক মহড়া পরিচানার কথা চিন্তা করেন। আবাসিক মহড়া পরিচালনা করতে পারলে সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কাজের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– ‘*ফেইড্রা* নাটকে ফেইড্রা চরিত্রটি যখন বিষপান করে, সেই দৃশ্যে অভিনয় করতে হলে অভিনেত্রীকে বিষ পান করা মানুষের সাথে কথা বলতে হবে। ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে। এর পরেই না অভিনেত্রী হয়তো কিছু একটা উপস্থাপন করতে পারবে।’[১৮৬] ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনাকে যজ্ঞ এবং যুদ্ধের সাথে তুলনা করে

---

[১৮৫] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।

[১৮৬] প্রাগুক্ত : তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

থাকেন। যুদ্ধে সৈন্যদের যেমন সকল কিছু নিয়ে তৈরি থাকতে হয় তেমনি অভিনেতা-অভিনেত্রীও সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে মহড়ায় এবং মহড়ার বাইরে প্রচুর আড্ডা দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'আমি ঘুরে বেড়াতে চাই। নাটকের বাইরের ঘটনা নিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে কথা বলতে চাই। মাঝে-মাঝে মহড়া স্পেস পরিবর্তন করতে চাই। ঢাকার বাইরে গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে মহড়া করতে চাই। তাহলে নতুনত্ব আসে। এতে অভিনেতা-অভিনেত্রী মহড়ায় মনোযোগী হয়। নতুন স্পেস নির্দেশক হিসেবে আমাকে অনুপ্রাণিত করে।'[১৮৭] ইসরাফিল শাহীন তাঁর নাট্য-নির্দেশনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চান। সে জন্য তিনি নাটককে মহিলা সমিতি, শিল্পকলা একাডেমি বা নাটমণ্ডল মিলানায়তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান না। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা-সমিতি, গ্রাম-গঞ্জে নাটক পরিবেশন করতে চান। তিনি বর্তমান সময়ের জঙ্গী তৎপরতা নিয়ে নাটক করতে চান। তিনি সমাজের অবক্ষয়, বাল্যবিবাহ, যুবকদের হতাশা, দুর্নীতি ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে দর্শকের মুখোমুখি হতে চান। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, কোর্ট-কাচারি ইত্যাদি বিষয় নিয়েও নাটক করতে আগ্রহী। ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'আমাদের দেশে দেখা যায় নির্দেশক নাটক পাঠ করার সময় পান না। অভিনেতা-অভনেত্রীর চেয়েও নির্দেশককে নাটক পাঠ করা, চরিত্র, কাঠামো, সংলাপ, প্রবেশ-প্রস্থান, দর্শন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বেশি আগ্রহ থাকা উচিৎ। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করা যায় না। এটা আমাদের জন্য দূর্ভাগ্যের। আমি মহড়ায় অভিনেতা-অভনেত্রী দিয়ে নাটকটি রেকর্ড করে বাসায় অন্য কাজের সময় শুনে থাকি। এতে করে আমার অনেক ভিজিউয়াল তৈরি হয়, ইমেজ পাই এবং বিচিত্র অনুভূতি হয়। ফলে আমার নতুন চিন্তা আসে এবং তা নোট করে রাখি। যখন মহড়ায় আসি তখন সেগুলোকে অনুশীলন করার চেষ্টা করি।'[১৮৮]

নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইসরাফিল শাহীনের বেশিরভাগ কাজই পাণ্ডুলিপি নির্ভর। তিনি পাণ্ডুলিপির প্লট সংলাপ, দৃশ্য ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে থাকেন। যেহেতু তাঁর বেশিরভাগ কাজই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাই তিনি পাণ্ডুলিপির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাবটেক্সট নিয়েই বেশি সময় দিয়ে থাকেন। পাণ্ডুলিপির অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্ট করেন। পাণ্ডুলিপির ভেতরে যে স্রোত আছে সেটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীর কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণাত্মক মন তৈরির জন্য সদা অনুশীলনে রত থাকেন ইসরাফিল শাহীন। তিনি বলেন– 'অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুশীলনের জন্যই পণ্ডুলিপির ওপর জোর দিয়ে কাজ করে থাকি। আমি নাট্য-নির্দেশনার জন্য যে নাটকগুলো বেছে নিয়েছি সেগুলো বিখ্যাত নাট্যকারদের নাটক। সেই নাট্যকাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাটক রচনা করেছেন। তাই প্রযোজনার

[১৮৭] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধ্যান কালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের নেয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৯-০৭-২০১৬।
[১৮৮] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধ্যান কালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের নেয়া বক্তব্য।)

সাথে যুক্ত পুরো দলটাকে আমি চেষ্টা করি পাণ্ডুলিপির সাথে পরিচয় ঘটাতে।'[১৮৯] খ্যাতিমান এই নির্দেশক তাঁর কাজে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে যুক্ত হয়ে পাণ্ডুলিপি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনার মধ্যদিয়ে নতুনত্ব খোঁজার চেষ্টা করেন। সংলাপের ভেতরে অদৃশ্য যে অর্থ লুকিয়ে থাকে সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেন। আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। যে কারণে তিনি পাণ্ডুলিপির স্তরে-স্তরে গিয়ে এর সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করার চেষ্টা চালান। তিনি পাণ্ডুলিপির সাথে 'কল্পনাশক্তি' যোগ করে পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালান। পাণ্ডুলিপির গভীরতা খোঁজার চেষ্টা করেন এই নির্দেশক। তিনি বলেন– 'প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বাইরে সবার সাথেই আমি এই প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকি। লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া (ইম্প্রোভাইজেশন) উভয় প্রক্রিয়াই আমি নাট্য-নির্দেশনা পরিচালিত করে থাকি। তবে ইম্প্রোভাইজেশন নির্ভর কাজ করেছি হাতে গোনা কয়েকটি, যেমন– *রোদ ও কুয়াশার গল্প*। তবে আমার ইচ্ছা আছে সম্পূর্ণ ইম্প্রোভাইজেশন নির্ভর কাজ করার জন্য।'[১৯০]

ইসরাফিল শাহীনের *ফেইড্রা* নাটকের মহড়া-প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য করেছি তিনি নাটকের একটি ক্রিয়া ধরে দিনের পর দিন ইম্প্রোভাইজেশন করিয়েছেন। যেমন, *ফেইড্রা* নাটকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় রাজা থিসিয়াস নিরুদ্দেশ। সে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু হঠাৎ যখন সে ফিরে আসে তখনকার ক্রিয়া পাণ্ডুলিপিতে দেয়া আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে যা নেই তা হলো– থিসিয়াস ফিরে আসার পর রাজ্যের জনগণের মধ্যে, পরিবার-পরিজন ও অমাত্যদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘঠছে সেইসব ক্রিয়া। তখন ইসরাফিল শহীন এই মুহূর্তটিকে কী করে স্টাবলিস্ট করা যায় সেটা নিয়ে ইম্প্রোভাইজেশন শুরু করেন। ইম্প্রোভাইজেশন করে তিনি দেখেন নাট্যকারের পাণ্ডুলিপির সাথে কোনো প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করা যায় কী না। প্রাসঙ্গিক না হলেও কেন সেটা অপ্রাসঙ্গিক তার একটা ব্যাখ্যা তিনি তৈরি করেন। এই প্রক্রিয়ায় ইম্প্রোভাইজেশন করে মহড়ায় তিনি ডিভাইস তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> সাধারণত আমরা পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকেই নির্দেশনা দেই কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যদি কাজ করি তাহলে নাট্যকারের পাণ্ডুলিপির মধ্যেও যে অনেক গভীরতা আছে তা অভিনেতা-অভিনেত্রীর কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে ইম্প্রোভাইজেশনের মধ্য থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব। একটা নাটকে নাট্যকার তো ঘটনার সব কিছু বর্ণনা দিতে পারেন না। *ফেইড্রা* নাটকেই তো দৃশ্যের কোনো বর্ণনা নেই, যে নাটকটি কোথায় হবে। তাই আমার ধারণা নাট্যকার বুঝেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্য ইম্প্রোভাইজেশন করার সুযোগ তৈরি করে রেখেছেন। আমার কাছে মনে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রী

[১৮৯] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬।

[১৯০] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

ঠিক করবেন ফেইড্রা কোথায় হিপোলিটাসের সাথে কথা বলবেন বা তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিবেন। আমি *ফেইড্রা* নাটকে যে ফেইড্রা চরিত্রে রূপদান করবে তাকে বলি– তুমি যে, ফেইড্রা চরিত্রে অভিনয় করছো তো তুমি ফেইড্রার যে মানসিক অবস্থা তার কিছু ডেমনস্ট্রেশন দেখাও। যেটা দৃশ্যে নাট্যকার লিখে রেখেছেন সেখান থেকে নয় তার বাইরে থেকে। কিছু নমুনা দেখাও যা তোমার মনের ভেতরে ঘটছে তার প্রতিফলন বা অভিব্যক্তি ব্যক্ত করো যাতে আমরা বুঝতে পারবো যে তোমার ভিতরে এই নাটকের বিস্তার ঘটছে বা তুমি ক্রিয়াটি বিশ্বাস করছো। আবার হিপোলিটাসকে যখন তার সৎ মা প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে তখন আমি হিপোলিটাস চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতাকে বলি, এই প্রস্তাবটা শোনার পর দৃশ্যের শেষে তোমার ভিতরে কী অবস্থা তৈরি হচ্ছে তার কিছু নমুনা বা আচার-আচরণ আমাদের দেখাও। আমরা যাতে বুঝি ঐ কথা শোনার পর তোমার ভেতরে কী হচ্ছে বা কী প্রতিক্রিয়া ঘটছে। এতে করে অভিনেতা-অভিনেত্রী একটা চরিত্র নিয়ে নানা দিক থেকে ভাববার, অনুশীলন করার অথবা সেটাকে নিয়ে মনোদৈহিক ভাবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাইকেল চেখভের তত্ত্ব-সূত্র নিয়ে বেশি কাজ করছি।[১৯১]

উপর্যুক্ত অভিমতের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, ইসরাফিল শাহীনের মহড়ায় গবেষণা এবং মাঠ পর্যারের অভিজ্ঞতা ছাড়া অভিনয় অসম্ভব। তাঁর মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অবশ্যই মনোদৈহিকভাবে নাটকের 'ক্রিয়া' চর্চা ও অনুশীলনে ব্রত থাকতে হয়। তিনি অভিনয়ের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চ্যালেঞ্জ ও দায়িত্ব নিতে বলেন। তাঁর অনুশীলনে অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেক বেশি শারীরিক, মনোস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দক্ষ ও সৃজশীল হয়ে ওঠেন। সাধনা ও অধ্যাবসায়ের বিকল্প পথ তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় নেই।

ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে স্বনির্ভর করতে চান। তাইতো তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠের পরই ইম্প্রোভাইজেশনে মনোযোগী হন। পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং ইম্প্রোভাইজেশন করে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাজের প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করেন। নাট্যকারের চরিত্র সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে সেই বিষয়গুলো অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে লক্ষ করা যায় কি না সেটা পর্যবেক্ষণ করেন বাচিক ও শারীরাভিনয়ের মধ্যদিয়ে। মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীর ইপ্রোভাইজেশন দেখে অভিনয়ের জন্য চরিত্র নির্বাচন (কাস্টিং) করে থাকেন। মাঝে-মাঝে পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রী দেখেই কাস্টিং করে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'নাট্য সংগঠন যদি আমার পূর্বপরিচিত হয় সেক্ষেত্রে ইম্প্রোভাইজেশন এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকেই চরিত্র নির্বচান করে থাকি। আবার দেশে-বিদেশে অপরিচিত গ্রুপের ক্ষেত্রে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অডিশন নিয়ে চরিত্র নির্বাচন করে থাকি। অডিশনে যে বিষয়গুলো দেখে থাকি তা হলো– চরিত্রের চলন, বাচিকাভিনয়, চরিত্র

[১৯১]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬।

সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার ঝোঁক এবং আগ্রহ। থিয়েটার গেমস্ এবং সর্বশেষে ইম্প্রোভাইজেশন তো আছেই।'[১৯২] ইসরাফিল শাহীন অনেক ক্ষেত্রে কাস্টিং হয়ে যাওয়া অভিনেতা-অভিনেত্রী ব্যর্থ হলে পুনরায় কাস্টিং করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি একটি চরিত্রে ছয়/সাতজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কাস্টিং করে থাকেন। তিনি বলেন– 'আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে *এ ডলস হাউজ* নাটকটি মঞ্চায়ন করি তখন নোরা চরিত্রে ছয়/সাতজন অভিনেত্রীকে কাস্টিং করেছিলাম। কারণ সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিষয় ছিল। নোরা চরিত্রে অভিনয় করলে যদি সবাই উৎসাহী এবং অভিনয়টা শিখতে পারে সে জন্য প্রায় এক বৎসর সময় দিয়ে আমি সবাইকে নিয়ে নোরা চরিত্রের রূপদান করাই। তবে এটা আপেক্ষিক, যেখানে ট্রেনিং বা শিক্ষার প্রয়োজন সেখানে সবাইকে দিয়ে একটি চরিত্র রূপদান করানোরা ক্ষেত্রে মনোযোগী হই। যখন প্রোফেশনাল দলে কাজি করি শেখানে সিংঙ্গেল কাস্টিং করে থাকি।'[১৯৩] ইসরাফিল শাহীনের মহড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিন কখনই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পরিষ্কারভাবে কোনো দৃশ্যের ছবি সম্পর্কে বলে দেন না। তাঁর কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিনেতা-অভিনেত্রীই মূল কাজটা করে থাকেন। তিনি নির্দেশকের ওপর অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নির্ভর করাতে চান না। তিনি এমন কি কোন কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও প্রকাশ করেন না। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে হোমওয়ার্ক দিয়ে থাকি। যাতে করে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়। যেন নির্দেশকের ওপর নির্ভরশীল না হয়। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বলি, প্রথমে তুমি তোমার মতো করে চরিত্রের রূপদান কর। তা দেখার পর মহড়ায় বিভিন্ন গল্প বলি, আলোচনা করি, নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলি। আমার নিজস্ব কল্পনা দিয়ে প্রত্যেককে কিছু সংকেত ও ইমেজ বলি যাতে অভিতো-অভিনেত্রী স্বতঃস্ফূর্ত ও চার্জড হয়। এই চার্জড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নতুন কিছু ছবি উপস্থাপন করেন। আমি এতটুকুই অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্য সাহায্য করে থাকি। প্রাথমিক কাঠামোর জন্য ইমেজ বলি। অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আমি কখনোই চরিত্রের পুরো ছবি এঁকে দেই না। মহড়ায় একেক সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নতুন কথা বলে তার ভেতরের নতুন কর্ম খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু ঐ পথে হাঁটতে হবে অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই। আমি লক্ষ্য করেছি অনেক নাট্য-নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অভিনয় করে দেখিয়ে দেন এতে করে অভিনেতা-অভিনেত্রী অনুকরণ করা শুরু করে। কিন্তু আমি যখন চরিত্রের ডেমনস্ট্রেশন দেখাই তখনও কিন্তু চরিত্রটা না হয়ে কিছু ইমেজ বা কিছু

[১৯২] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬।
[১৯৩] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

> অভিব্যক্তি প্রকাশ করি। যাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী অনুকরণ করার কিছু না পায়। মূলত সে যেন একটা পথ দেখতে পায়, যে আমি কীভাবে অনুশীলন করবো।[১৯৪]

এই উক্তির মধ্যদিয়ে নির্দেশনা 'কৌশল' ও 'প্রক্রিয়া' বিষয়ে নির্দেশকের ব্যক্তিগত ধারণার প্রতিফলন ঘটে। যেখানে ইসরাফিল শাহীন মহড়ার শুরুতে– থিয়েটার গেমস্, শারীরিক-মানসিক ও বাচিক অনুশীলন মধ্যদিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে একটা সুন্দর মহড়া তৈরি করতে চান। তিনি মহড়ায়– পাণ্ডুলিপি পাঠ, বিশ্লেষণ, ইম্প্রোভাইজেশন বা তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেন। মহড়ায় ইসরাফিল শাহীন– গল্প বলা, আলোচনা করা, নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিনিময় করার পাশাপাশি অভিতো-অভিনেত্রীকে সংকেত ও ইমেজ বলে সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি কখনোই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চরিত্রের পুরো ছবি এঁকে দেন না। যা ইসরাফিল শাহীন-এর নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটা বড় স্বকীয়তা। তিনি মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তথাকথিত 'নাট্য-নির্দেশনা' না দিয়ে একটি পথের সন্ধান দেন মাত্র।

ইসরাফিল শাহীন তথাকথিত নিয়মে নাট্য-নির্দেশনা দিতে চান না। তিনি পাণ্ডুলিপির সাথে সমসাময়িক বিষয় যুক্ত করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, এলাকা বা দেশের বাইরে নাটক প্রদর্শন করতে চান। তিনি সমাজের মানুষের সাথে চিন্তায় যুক্ত হতে চান। নাটক এবং সংস্কৃতিকে তিনি আইন-আদালতের মতো করে কাজে লাগাতে চান। তিনি বলেন– 'নাটকের মাধ্যমে এমন শিক্ষা দিতে চাই যাতে মানুষকে কোর্ট-কাচারীতে যেতে না হয়। নাটক নিয়ে আমি বিকল্প কোর্ট হিসেবে কাজ করতে চাই। নাটক বিকল্প চিকিৎসালয় হিসেবে কাজ করবে। বিকল্প বিদ্যালয় হিসেবে কাজ করবে। নাটক সাধারণ মানুষের নানান সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমে সাহায্য করবে। আমরা পৃথিবীর বহু তাত্ত্বিক দেখেছি যাঁরা নাটককে সমাজ ও মানুষের জন্য কাজে লাগিয়েছেন। তাই আমি নাটক বাক্সবন্ধি করে রাখার পক্ষে নই। বাক্সবন্ধি করে রাখলে নাটক সম্পর্ক রচনা করবে কী করে।'[১৯৫] এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশিত *সিদ্ধান্ত* নাটকের নাট্য প্রক্রিয়া : শিল্পের রাজনৈতিক মাতৃভাষা লেখাটি স্মরণ করতে চাই, সেখানে তিনি বলেন :

> বার্টল্ট ব্রেখট নাট্যভাষা ও মার্কসিস্ট রাজনৈতিক যৌগিকতার পশ্চিমা দ্রষ্টা। ব্রেখট পাঠ্য বলেই কি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হবে। অভিনয় এমন এক সৃজনষজ্ঞ যা অতীতের হাড়-হাড্ডিকে বর্তমানের রক্তপ্রবাহে সঞ্জীবিত করে তোলে। ব্রেখটের টেক্সট আমাদের সাথে যে যোগাযোগ গড়ে তোলে তা

---

[১৯৪] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬।
[১৯৫] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৩-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

বস্তুগত কর্পোরেট সভ্যতার দ্বন্দ্বের সূত্রকেই শুধু উপজীব্য করে না বরং বাস্তবের এক সাম্যবাদী বিশ্লেষণকে স্নায়ুর ভেতর ছড়িয়ে দেয়, যা দর্শকের দুনিয়া পর্যন্ত দীপ্যমান। ফলে ব্রেখট স্বয়ং রাজনীতির এক রূপক এবং রাজনৈতিক চৈতন্য গঠনের জারকরসে আমাদের সিক্ত করে। পাললিক করে। বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে মতাদর্শিক রাজনীতির মারফতে সূচিত নাট্য ও রাজনীতির যৌথভূমিটি কী-তা আমাদের অনুসন্ধিৎসার গন্তব্য। মহড়ার কর্ষণক্ষেত্রটি প্রথমত আমাদের কাছে ক্ষুদ্রবর্গের রাজনৈতিক ডেমোগ্রাফি হিসেবে চিহ্নিত হয়। অভিনয়শিল্পী ও নির্দেশক/পরিচালিত–এই হায়ারার্কিক্যাল রাজনৈতিক সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করার, নেগেট করার হিম্মত যখন অর্জন করতে ব্রতী তখনি আমরা ক্রমে-ক্রমে ‘পরিচালক/নির্দেশক’ নামক এক কমান্ডো-অস্তিত্ব ছাপিয়ে নন-ডিরেকশনাল একটি সৃজন প্রসেসকে খুঁজতে শুরু করি। শিল্পী ও মানুষের ভেদ-রেখার যে এলিটিস্ট রাজনীতি আছে এর বিপরীতে, জনতার ডিসকোর্সে নাট্যভাষার যে চিহ্নায়ন–একে আমরা অবশেষে করি তালাশ। ব্রেখটীয় রাজনৈতিক নাট্যভাষার তালাশের লক্ষ্যে হেজিমনিহীন এক তরিকা হিসেবে প্রতীয়মান হয় যা, তা হলে নিরাভরণ যোগাযোগের লক্ষ্যে নিবিড় সংলাপ রচনার এক নির্বিকল্প স্থানিক, পরিসর, মৃত্যুতুল্য অনিবার্যতায় অডিটোরিয়ামকে যা নাকচ করে দেয়, এমন স্থান, যা হতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন চত্বর, অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ, শ্রমিক অধ্যুষিত সাভার ইপিজেড, ঢাকার সদরঘাট, চট্টগ্রাম বন্দর প্রভৃতি। এর ফলে নাট্যের মধ্যদিয়ে যোগাযোগের রাজনৈতিক কনসেপশনে আত্মীকৃত হয় স্থান ও জনতার এই যৌগিক চিন্তামৌল। আবার জনগণমুখী নাট্যিক যোগাযোগে সংগীতের অবারিত ও উদ্দাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক কিন্তু উপেক্ষণীয় ক্ষেত্র হলো তথাকথিত রাজনৈতিক সংগীতের চিৎকারধর্মী উল্লম্ফন। *সিদ্ধান্ত* বা *দ্য মেজারস টেকেন* প্রকৃত পক্ষে কয়েকজন বিপ্লবীর এমন এক সঙ্কটাপন্ন পরিণতিকে নির্দেশ করে যা এক তরুণ কমরেডের মৌহূর্তিক আবেগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্র্যাটেজিক বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হয়ে ওঠে অতি সাংঘর্ষিক। আর পার্টি থেকে বিচ্যুত কিন্তু জনতার প্রতি মহাজাগতিক মমত্ববোধ সত্ত্বেও এই তরুণ কমরেডকে মৃত্যুর পরিণতি গুণতে হয়। এই মৃত্যু হত্যা নয় আবার আত্মহত্যাও নয়, তাই কি? এই প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর জারি করেও আমরা জবান খুলে বলতে পারি, এ হলো রাজনৈতিক কৃত্য। এক অপরিমেয় বেদনার ভার বিষয়ক কথন যখন দর্শকের ক্রিটিক্যাল জাজমেন্ট প্রত্যাশা করে তখন আমরা, এই নাটকের রক্তাপ্লুত কুশীলবেরা–নিজেদের সৃজনবাসনাকে এক আত্মগত নির্মাণের ধারায় বইয়ে দিই। এ কথা তো কহিতব্য যে, নির্দেশকের অঙ্গুলি হেলনে আমরা ক্লীব ক্রীতদাস নই তথাপি স্মরণে আসে ফ্রেডরিখ হেগেল: মানুষের সত্তাগত প্রত্নরূপ সবশেষে দ্বিধাবিভক্ত – প্রভু আর দাস।

> তাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ভোগবাদ আমাদেরকে যদিও কনজিউমার হতে ডাকছে তবুও একবার গর্জে উঠি, গান গাই, গোঙাই, আর্তস্বরে ডেকে উঠি, মানুষের বুকের ভেতরে আমরা শিল্পী নয়, স্রষ্ঠা, শুধু মানুষের অবয়ব হয়ে উঠি।[১৯৬]

অতএব উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে, ইসরাফিল শাহীন তাঁর নাটককে শুধু অডিটোরিয়ামে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। তিনি কাজকে নিয়ে 'সীমানা' ছাড়তে চান। জনমানুষের সাথে যোগাযোগের এক মাধ্যম তৈরি করতে চান। সেতুবন্ধন গড়তে চান। তাই তো তাঁর কাছে দেশ-বিদেশ বলতে কিছু নেই। আমরা লক্ষ্য করি ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনায় বিদেশি নাটকের সংখ্যাই বেশি। তিনি নির্দেশনার জন্য যে নাটকগুলো বেছে নিয়েছেন সেগুলো বিখ্যাত নাট্যকারদের। যেখানে নাট্যকার বুঝে-শুনে নাটক রচনা করেছেন। সেখানে প্লট নির্বাচন থেকে শুরু করে সংলাপ, চরিত্র সবকিছুতেই মুন্সীয়ানা রয়েছে। তিনি বলেন– 'আমি এমন পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করবো যেখানে কোনো পরিবর্তনের চিন্তা আমাকে না করতে হয়। যেখানে আমি পদ্ধতিগত অভিনয়কে গুরুত্ব দিতে পারি।'[১৯৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশিত *থ্রি সিস্টার্স* নাটকের রূপায়ণ প্রক্রিয়া দেখলে তাঁর নাট্য-নির্দেশনার একটি 'পদ্ধতি' লক্ষ করা যায়। এই নাটকের রূপায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> স্নাতকোত্তর শ্রেণির পাশ্চাত্য নাট্য অভিনয় অনুশীলনী কোর্সের পরীক্ষার জন্য রুশ নাট্যকার আন্তন চেখভের *থ্রি সিস্টার্স* নাটকটিকেই নির্বাচন করা হয়। একে মঞ্চে আনার জন্য মাস্টার্সের শিক্ষার্থীই শুধু নয় বিভাগের অন্যান্য বর্ষের বেশ কিছু শিক্ষার্থীকেও কাস্ট করতে হয়েছে। সবাই মিলে নাটকটিকে আত্মস্থ করার জন্য যেতে হয়েছে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়। প্রথমেই পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রসঙ্গ। সবাই মিলে নাটকটি পড়তে শুরু করেছি। পড়তে-পড়তে আমরা অনুভব করলাম–একটি মহৎ নাটককে মঞ্চে উপস্থাপনের জন্য শুধু পড়া দিয়ে হবে না। একে পাঠ করতে হবে। আবার পাঠের মধ্যদিয়েই যেন পূর্ণতার অনুভব জাগে না। চেখভের *থ্রি সিস্টার্স* অধ্যয়নের মধ্যে আমরা সবাই ডুবে যেতে চাইলাম। কিন্তু একটা পর্যায়ে আমাদের মধ্যে ব্যর্থতার অনুভূতি তৈরি হলো। আমরা তো কেউই রুশ ভাষাটি জানি না। ইংরেজি অনুবাদকে আশ্রয় করেই আমরা এগিয়ে গেছি। আমাদের মনে হলো চেখভ একজন বড়ো শিল্পী, জীবনশিল্পী। চেখভের নাটক অধ্যয়নে লিপ্ত থেকে মনে হলো : আমরা বুঝি সবাই সমুদ্রের একদল ডুবুরি। ডুবে-ডুবে নুড়ি, পাথর, বালু, কাদা তুলে আনতেই আমাদের দম ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আমরা তো লক্ষ্যহীন, স্বপ্নহীন নই। ঝিনুকের মধ্য থেকে মুক্তো খুঁজে আনার জন্য

---

[১৯৬] থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, *সিদ্ধান্ত*, রচনা : বার্টল্ট ব্রেখট, নির্দেশনা : ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ১ ও ২ জুলাই ২০১১।
[১৯৭] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

আমরা প্রত্যয় তৈরি করি। জীবনের দুঃখের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের অর্থ খোঁজার মধ্যে চেখভ যেভাবে এই নাটকে মুক্তার মালা তৈরি করেছেন শব্দে, ভাষায়–আমরাও শরীরের শব্দে, ভাষায় সেভাবে জীবনকেই পুনরায় সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা তৈরি করতে চেয়েছি। তাই চেখভের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি চিত্রকল্প, প্রতিটি উপমার অর্থ খুঁজতে চেয়েছি। আমরা যেতে চেয়েছি অর্থ থেকে অর্থান্তরে। শব্দের অর্থ তো অভিধানে নয় জীবনেই থাকে। তাই অর্থ থেকে অর্থান্তর আবিষ্কারের জন্য চেখভের বোধকে স্পর্শ করতে-করতে আমরা রাশিয়া থেকে বাংলাদেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনেছি। আমরা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের দিকেই ফিরে এসেছি। আমাদের তো এই উপলব্ধি আছে, যে, নাট্যকারের সাহিত্যকর্মকে মঞ্চে আনতে পারার মধ্যেই নতুন শিল্পসৃষ্টি হয় না। অভিনেতৃর জন্য নাটকের পাণ্ডুলিপি একটা আভাসমাত্র, রোদের মধ্যে জেগে থাকা একটা ছায়ামাত্র। অভিনেতৃর অভিজ্ঞতা ও কল্পনা দিয়ে সেই আভাস, সেই ছায়াকে মূর্ত করে তুলতে হয়, রক্তমাংসময় করে তুলতে হয় মঞ্চে। আর আমাদের কাজটাতো মঞ্চেরই। মূল থেকে অনুবাদের কাজটা যেমন একটি পুনর্সৃজন তেমনি নাটককে মঞ্চে আনাও আরেকটি পুনর্সৃষ্টি। সাহিত্যের আরেকটি দিগন্ত, আরেকটি সম্ভাবনা তৈরি হয় তাই থিয়েটারে, মঞ্চে। তখন এটি হয়ে ওঠে এক পৃথক শিল্প। অভিনেতৃ, নির্দেশক, কলাকুশলী সবাই এই শিল্পের জনক-জননী।[১৯৮]

আমরা তো শিল্পই সৃষ্টি করতে চেয়েছি। এর জন্য নাটকের চরিত্র, ঘটনা, ক্রিয়া,বর্ণনা ও চিন্তাকে আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের পরিবারে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অনুসন্ধান করেছি। নিজেদেরকে চরিত্রে রূপায়ণের জন্য মডেল খুঁজেছি। খুঁজেছি চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, কল্পনা। অনেক সময়ই চরিত্রকে নির্মাণের জন্য এগুলোর ব্যবহার কষ্টসাধ্য মনে হয়। আমরা তখন আরেকটি প্রক্রিয়ায় গিয়েছি। সেটি হলো গল্প বলা। নির্দেশক-অভিনেতৃ সবাই মিলে চরিত্রের কোনো একটি দিকের সাথে সাযুজ্য আছে এমন অসংখ্য গল্প জড়ো করেছি। এগুলো আমাদের জীবনেরই গল্প। এই গল্প বলাটা এক ধরনের বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। এর থেকে অনেক উপাদান, অনেক মাত্রা নিয়ে নিজেদেরকে চরিত্রের উপযোগী করে তুলেছি, করে তুলেছি প্রস্তুত। কিন্তু প্রস্তুতির কতটা পথ আমরা পার হয়ে এসেছি? এর জবাব আমরা দর্শকের অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও খুঁজতে চাইব। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বহুমাত্রিক নাট্যতত্ত্ব পড়ি। এই তত্ত্ব পড়ার মধ্যেদিয়ে আমরা শিক্ষার একটা স্তরে মাত্র বাস করি। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যটাই হলো এক পূর্ণতার দিকে মানুষের বিকাশ ও প্রকাশ ঘটানো। নাট্যশিল্প শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যটাই বোধ তৈরি করা

[১৯৮]. থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, *থ্রি সিস্টার্স*, রচনা : আন্তন চেখভ, নির্দেশনা : ড. ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ৩-৯ এপ্রিল ২০০৫।

এবং সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশের শক্তি অর্জনে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলা। আর অভিনয়ের জন্য এ দু'টোই প্রধান। তাই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে হতে হয় জীবনবোধ সম্পন্ন। ভেতরে যখন কোনো এক বোধ কাজ করবে তখন অভিনেতৃ অর্জিত দক্ষতা দিয়ে তা প্রকাশ করবেই। আর এই জীবনবোধ তৈরি করার জন্য চাই জীবনতত্ত্বের অনুপুঙ্ক্ষ অধ্যয়ন। এই অধ্যয়নে থাকলে তখন আর ধার করা তত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হয় না। তাই এই মহড়ায় আমরা বুঝতে চেয়েছিলাম, আমাদের নিজেদের জীবনটাকে আমরা কতটা জানি। নিজের জীবন, অন্যের জীবন, জগৎ জীবন–এই সব নিয়ে আমাদের চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নকে আমরা চিহ্নিত করতে চেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এই নাটক নির্মাণের জন্য আমরা আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি। আমরা প্রশ্ন তৈরি করেছি ও উত্তর খুঁজতে চেয়েছি যে আমাদের জীবনের অন্দর, সদর আমাদের কতটা চেনা, জানা ও আয়ত্তের মধ্যে।[১৯৯]

আমরা তো সবাই-ই জানি যে, প্রচলিত থিয়েটার পোশাক, আলো, সংগীত, মঞ্চ ও রূপসজ্জা দিয়ে অভিনেতৃর অভিনয় দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রচেষ্টা সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমরা শুধু অভিনেতৃর অভিনয় শক্তিকেই মঞ্চে সঞ্চারিত করতে চেয়েছি। আমরা বারবার উপলব্ধি করেছি: নাট্যশিল্প মূলত অভিনয়শিল্প। অভিনয়ের এক সর্বপ্লাবী ভয়ঙ্কর শক্তি আছে যা থিয়েটারের সেট, লাইট, মিউজিক, কস্টিউম, প্রপস–এই আলঙ্কারিক উপাদানের অভাবকে পূর্ণ করে তোলে। তাই আমাদের মহড়া অভিনয়-উৎকর্ষের এক লক্ষ্যবিন্দুতেই আবর্তিত হয়েছে। আমাদের নাট্য প্রযোজনার পুরো পরিকল্পনাটিতেই এইসব অলঙ্কারমূলক উপাদানের অভাবকে পূর্ণ করে তোলে। আমাদের নাট্য প্রযোজনার পুরো পরিকল্পনাটিতেই এইসব অলঙ্কারমূলক উপাদান উপকরণ বাদ দিয়ে, অভিনয়ই প্রধান ও পরম করে তুলতে আমরা স্থিরচিত্ত ছিলাম। এমনকি স্বল্পসংখ্যক আসন রেখে পুরো মিলনায়তনকেই মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো নাটক জুড়ে একই আলোর ব্যবহার হয়েছে। আলোর চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মঞ্চে মায়া ও বিভ্রম তৈরি করে দর্শককে মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে রাখার লোভকে আমাদের ভেতরে বেড়ে উঠতে দিই নি। এই সব আমরা বাদ দিতে চেয়েছি। নাটকে ডিজাইনিংয়ের যা-ই এসেছে তা ন্যূনতমভাবেই। আমাদের মনে হয়েছে শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই অলঙ্কার। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ সময়ই অজস্র দুর্বলতার জন্য শরীরের চেয়ে অলঙ্কারই প্রধান হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমরা অলঙ্কারের মিথ্যা সৌন্দর্যে আবিষ্ট হতে চাই নি। আমরা শরীরকেই প্রধান করে তুলতে চেয়েছি। আমরা অনুভব করেছি, নাট্যশিল্পের মিথ্যা সৌন্দর্যে আবিষ্ট হতে চাই নি। আমরা অনুভব করেছি, নাট্যশিল্পের জন্য অভিনয়শিল্পিই প্রথম ও প্রধান উপাদান। আর

---

[১৯৯]. থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, *থ্রি সিস্টার্স*, রচনা : আন্তন চেখভ, নির্দেশনা : ড. ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ৩-৯ এপ্রিল ২০০৫।

> অভিনয়ের মধ্যেই অভিনেতৃতর যোগ্যতা বিম্বিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অভিনয়ের পথে হাঁটতে গিয়ে শিল্পীকে এক শেষহীন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে হয়। আমাদের অধ্যয়ন এখনো চলছে।[২০০]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনার একটি মডেল খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে তিনি অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি ও অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দিয়ে চরিত্র সম্পর্কিত গল্পবলাটা এক ধরনের বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছেন। যার মধ্যদিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনবোধ তৈরির পাশাপাশি দক্ষতা প্রকাশিত হয়। ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কোনো প্রকার তত্ত্বের উপর নির্ভর না করেই চরিত্র নির্মাণে পারদর্শী হয়ে ওঠে। মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়শক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে শরীরকেই প্রধান করে তুলতে চেয়েনেছ। নাট্য-নির্দেশনায় অভিনয়টাই ইসরাফিল শাহীনের কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অভিনয় বলতে চরিত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, চর্চা, অনুশীলন ও অর্জনকে বোঝাতে চান। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

> কেন আমি অভিনয়টাকে গুরুত্ব দেই তার তো একটা পটভূমি আছে। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের পরিবেশনায় অভিনয়টাই প্রধান অনুষঙ্গ। শরীর দিয়েই তারা নাট্যভাষ্য তৈরি করছে। আমি বিদেশী পরিবেশনা দেখেছি কিন্তু এটা বলছি না যে তারা দূর্বল। আমাদের দেশজ থিয়েটারে বাদ্য-যন্ত্র ও ছন্দের সাথে যে নৃত্য উপস্থাপিত হয় সেক্ষেত্রে একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী গান করছে, সংলাপ বলছে এবং নৃত্য পরিবেশন করছে। এখান থেকে আমি উপলব্ধি করেছি আমাদের প্রযোজনায় প্রযুক্তির কোনো ব্যবহার নেই। এমন কি প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনও নেই। অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীরের মধ্যেই যে বৈচিত্র আছে এগুলো দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। এসব দেখেই মনে হয়েছে অভিনয়টাই হলো মূল বা প্রধান অনুষদ। দেশজ নাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রী কোনো তত্ত্ব-সূত্র বলে না কিন্তু স্বভাবসুলভভাবেই তাদের দেহের মধ্যে তত্ত্ব-সূত্র বহমান। তাই তো লক্ষ্য করা যায় তারা ভাব ও রস অনুসরণ করেই পরিবেশনা মঞ্চায়ন করে থাকেন। তবে প্রযুক্তিতে আমার অনিহা নেই। প্রয়োজন হলে যাদের প্রযুক্তি আছে তার ব্যবহার করতেই পারে। তবে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সৃজনশীলতাকে নষ্ট না করে প্রযুক্তি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। আমাদের দেশের অভিনয়-শিল্পীদের চরিত্রের প্রতি যে মনোযোগ, যে ইমোশনালমেমরী, যে কল্পনাশক্তি তাতে সেট, লাইট ও পোশাকের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয় না।[২০১]

---

২০০. থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, *থ্রি সিস্টার্স*, রচনা : আন্তন চেখভ, নির্দেশনা : ড. ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ৩-৯ এপ্রিল ২০০৫।

২০১. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

এই উদ্ধৃতির মধ্যদিয়ে ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনা পদ্ধতিতে ‘অভিনয়’ই যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীরের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় নাট্যভাষ্য সৃষ্টি করতে চান। প্রযুক্তিতে তাঁর অনিহা নেই কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে নন তিনি। ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশিত *থ্রি সিস্টাস* নাটকের নাট্য-নির্দেশনা ‘পদ্ধতি’ সম্পর্কে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহমান মৈশান বলেন :

> এই প্রযোজনার অনেকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন নাট্যশিল্পের মৌলিক উপাদান অভিনয় প্রধান এই নাট্য প্রযোজনা। অভিনেতৃর অভিনয় শক্তির এক চূড়ান্ত প্রকাশরূপ খুঁজতে-খুঁজতে নির্দেশক শিক্ষার্থীসহ সবাই একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেন; অভিনেতৃ কীভাবে ব্যক্তিসত্তাকে চরিত্রে রূপায়িত করে-এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য চেখভের নাটক অধ্যয়ন করতে-করতে নির্দেশকসহ শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনের সদরে-অন্দরে বিচরণ করতে থাকেন। নাটকের গল্পটি উপস্থাপনযোগ্য করে তোলার জন্য প্রথমেই আত্মস্থ করার বিষয়টি সামনে আসে। চেখভের পাণ্ডুলিপির অর্থ থেকে অর্থান্তর আবিষ্কারের জন্য সবাই নাটকের গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নিজের জীবন, অন্যের জীবনের গল্পের বহুমুখী বিনিময় ঘটতে থাকে। এটি একটি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। অভিনয়-শিল্পীর বোধকে, প্রকাশ-ক্ষমতাকে এক অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চিন্তা ও অনুভূতির মিশেলে এই প্রক্রিয়া নির্দেশক ড. শাহীন তৈরি করেন। কেননা নাট্যশিল্পীদের নিজস্ব জীবনবোধ ও শিল্পবোধ না থাকলে শুধু অর্জিত দক্ষতা ও কৌশল দিয়ে নাটককে নাট্যশিল্পে রূপান্তর করা যায় না। তাছাড়া চেখভের নাটকের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, সময় সবই এই নাটকের অভিনয় শিল্পীদের অনেক দূরবর্তী। কিন্তু চেখভের মতো শক্তিশালী লেখকে মধ্যে আছে শিল্প সৃষ্টিতে সক্ষম দূরদৃষ্টির অর্ন্তদৃষ্টি। নির্দেশক নাট্যকারের লেখা মানবজীবনের সংকট ও সম্ভবনার এই ধ্রুপদী বয়ানকেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন মঞ্চে। *থ্রি সিস্টার্স* নাটকটি দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলেছেন যে, শ্রমিকের মুক্তি, সামন্ত সমাজের অভিজাত উচ্চশ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংকট ও আগামী প্রজন্মের সুখী জীবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার মাধ্যমে চেখবের এই নাটকে রুশ বিপ্লের পদধ্বনি তৈরি হয়েছে। এই মন্তব্য রাশিয়ান সমাজের কারো কাছে কিংবা ইতিহাস-আগ্রহী কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কিংবা কোনো কমিউনিস্ট বিপ্লবীর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও হতে পারে। কিন্তু নাট্যকলা বিভাগের এই নাটকটি মঞ্চায়নের তাৎপর্য একেবারেই দেশীয় প্রেক্ষাপটে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন এই নাটকে ভারশিনিন, নাতাশা, মাশা, ওলগা, ইরিনা, আন্দ্রেই, চিবুতেকিন, কুলিগিন, ব্যারণ ও আনফিসা ইত্যাদি চরিত্রের ব্যক্তিগত কষ্ট, পতন, পাপ, ক্লেদ, কালিমা, সুখ, সাধ ও স্বপ্ন বাংলাদেশের সমাজের

প্রেক্ষাপটের সত্য। এই নাট্য-প্রযোজনায় নাট্যকলা বিভাগের তরুণ শিক্ষার্থী শিল্পীরা একটি অর্থবহ চর্চার মাধ্যমে বিদেশী চরিত্রগুলো নৈর্ব্যক্তিক করে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে, নিজের সময়, সমাজ, স্বদেশে অবস্থান করে নিজেরদের জীবনেরই নাট্যভাষ্য সৃষ্টি করেছেন। এখানেই চেখবের নাটক ড. শাহীনের নির্দেশনায় নাট্যশিল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্প ও গল্পের ব্যাখ্যা বিম্বিত হয়েছে *থ্রি সিস্টার্স* প্রযোজনায়। দর্শকের সামনেও উম্মোচিত হয়েছে জীবনের বাঁক বদলের অভিজ্ঞতাগুলো। কিন্তু থিয়েটার শুধু গল্পবলার শিল্প নয়। গল্প হয় কথাসাহিত্যে। থিয়েটারে অভিনয়-শিল্পীরা দৃশ্য তৈরি করে। *থ্রি সিস্টার্স* প্রযোজনায় শেষ দৃশ্যে কোনো সংলাপ নেই। সংলাপহীন সরবতায় উপস্থিত দর্শক দৃশ্যের মধ্যে ডুবে থাকে। এখানে এভাবেই থিয়েটারের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। *থ্রি সিস্টার্স* প্রয়োজনাটিতে এ রকম অনেক মূহুর্ত আছে সংলাপহীন কিন্তু শারীরিক অভিব্যক্তি দিয়ে পূর্ণ । এসব মূহুর্ত দর্শক স্তব্ধ হয়ে মঞ্চের দিকে কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ে, জব্দ হয়ে, দগ্ধ হয়ে, মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, অনুভব করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলতে শুধু শব্দ আর ধ্বনি নয়। শব্দের সঙ্গে শারীরিক অভিব্যক্তি যুক্ত হয়েই ভাষা পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রযুক্তি ও সভ্যতার স্পর্শ কম লেগেছে এমন সব জনপদে জনমানুষ শব্দ বেশি উচ্চারণ করে না। শব্দের সংঙ্গে তাদের শরীরও ধ্বনি তৈরি করে। আমাদের গ্রামীণ জনপদের লৌকিক ভাষাও এভাবেই পরিপুষ্ট। আর থিয়েটারের ভাষাও মানুষের শরীর ও শব্দের যুগ্মতায় তৈরি হয়। আর এই ভাষার শৈল্পিক প্রয়োগ *থ্রি সিস্টার্স* নাট্য প্রযোজনায় ঘটেছে।[২০২]

শাহমান মৈশান-এর উপর্যুক্ত বর্ণনায় ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনাপদ্ধতি যথার্থভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে শাহমান মৈশান নাট্য-নির্দেশনায় ইসরাফিল শাহীনের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন। সুতরাং এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে নির্দেশকের নির্দেশনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি ধারণা লাভ করা যায়।

ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিজ চিন্তায় দাঁড় করাতে চান। তিনি মনে করেন স্বনির্ভর করাই তাঁর কাজের স্বার্থকতা। তাঁর মহড়ায় গেলে লক্ষ্য করা যায় তিনি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। নির্দেশক শাহীন তাঁর চিন্তায় ফিক্সড থাকেন না। প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে কাজ পরিচালনা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'নাট্য-নির্দেশক হিসেবে অহংকারী হলে চলে না। এমন কি স্বৈরতান্ত্রিকভাবে নাট্য-নির্দেশনা হয় না। আমি পরিবর্তনশীল। আমি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে কাজ করে থাকি। আমার প্রক্রিয়া কোনো পুকুর না, এটা নদী। এখানে স্রোত আছে।

২০২. শাহমান মৈশান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রযোজনা থ্রি সিস্টার্স : বাক ও বিদীর্ণতা, *ভোরের কাগজ*, ঢাকা ২২ এপ্রিল ২০০৫।

অন্যভাবে বললে আকাশের মতো। আকাশে যেখানে আলোর পরিবর্তন হয়, রঙ-এর পরিবর্তন ঘটে, মেঘ আসে মেঘ চলে যায়। মূলত আমি মহড়ায় প্রতিনিয়ত ইম্প্রোভাইজেশন করে থাকি।'[২০৩]

এই উদ্ধৃতি মধ্যদিয়ে ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনায় 'নিজস্ব' দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোনো চিন্তায় ফিক্সড না থেকে প্রতিনিয়ত চিন্তার পরিবর্তন করে কাজ পরিচালনা করে থাকেন। যেখানে ড. শাহীন 'অংশগ্রহণমূলক' পদ্ধতিতে কাজ করার পাশাপাশি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। তিনি মহড়ায় অনেক বেশি ইম্প্রোভাইজেশন করে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে স্বনির্ভর করতে চান। মূলত অংশগ্রহণ পদ্ধতিতেই তিনি এই নাটক নির্মাণ করেন। এ প্রসঙ্গে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহমান মৈশান তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন :

> ইউরোপীয় ফ্রেমে ইবসেন-পাঠ প্রবণতার বিপরীতে নতুন পাঠভঙ্গি তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন নির্দেশিত *দি লেডি ফ্রম দি সি* নাটকে। ইসরাফিল শাহীন সুনির্দিষ্টভাবে এই নাটকের বাস্তবতার ফ্রেমকে ভেঙে একটা তরল ও বিমূর্ত জগত তৈরি করেন। যে বিমূর্ততার মধ্যে প্রতীকী উপস্থাপনার সূচনা হয়। থিয়েটারের স্বতন্ত্র স্পেস তৈরির ক্ষেত্রে একাডেমিকভাবে বিভিন্ন নিরীক্ষা ও নবজিজ্ঞাসার উদয় খুবই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। একাডেমিক প্রযোজনার মহড়াকক্ষকে নির্দেশক শাহীন বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের বোধ-বিনিময় ও শিল্পীসুলভ বৌদ্ধিক আচরণের একটি স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত করেন। অভিনেতাদলের বাইরেও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কার্যকর অংশগ্রণের মধ্যদিয়ে সমগ্র মহড়াকক্ষে একটি বহুমুখী সেমিনারের আবহ রচিত হয়। এই অংশগ্রহণমূলক নাট্যপ্রযোজনার পদ্ধতি নাট্যকলার একাডেমিক চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এই বিশেষ পদ্ধতিগত নাট্যপ্রযোজনা প্রস্তুতির মধ্যে দিয়েই নির্মিত হয়েছে নাট্যকলা বিভাগের ইবসেন প্রযোজনা *দি লেডি ফ্রেম দি সি*। এই নাটকের মধ্যে মানুষের জীবনে বাস্তবতার নির্যাস যে ইঙ্গিতময় বাস্তবতার সত্য রচনা করে তাকেই আমরা দৃশ্যায়নের মর্মসূত্র বলে মেনেছি। আমাদের দেশজ নাট্যশিল্পের ইতিহাস বিবেচনায় আমরা থিয়েটারকে অভিনয়ের সমৃদ্ধ উপাদানে রঞ্জিত শিল্পকলা বলেই বিবেচনা করতে আনন্দিত হই ও গৌরব অনুভব করি। *দি লেডি ফ্রেম দি সি* নাটকের মঞ্চায়নেও আমরা অভিনয়কেই নাট্যশিল্পের মৌল উপাদান বলে গ্রহণ করতে চেয়েছি। মঞ্চ, আলোক,

[২০৩] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

দ্রব্যসম্ভার, পরিচ্ছদ ও সংগীতের মতো থিয়েটারের আলঙ্কারিক উপাদনগুলোকে ভেবে নিতে চেয়েছি এই প্রযোজনার অনুষঙ্গ হিসেবে।[২০৪]

ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সংলাপ মুখস্ত করাকে অনুৎসাহী করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন– 'অভিনেতা-অভিনেত্রী যখন সংলাপ মুখস্ত করেন তখন তাঁরা পাণ্ডুলিপির কোনো কিছু না বুঝেই মুখস্ত করেন। সংলাপের প্রাসঙ্গীকতা শরীরের মধ্যে না ধারণ করে শুধু অনর্গল মুখস্ত করে যায়।'[২০৫] ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে প্রথমত সংলাপ ডেমনেস্ট্রেশন করতে বলেন। সংলাপ পাঠ করতে বলেন। কিন্তু মহড়ায় অনেককেই লক্ষ্য করা যায় সংলাপ মুখস্ত করে চরিত্রায়নে চলে যান। এবং আবেগ দিয়ে অভিনয় শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'নিজের বিবেক হয়ে প্রথমে কথাগুলো শোনা, যাতে নিজের চিন্তা ও বিশ্লেষণ নাট্যকারের নির্দিষ্ট চরিত্রটাকে ব্যাখ্যা করতে সহজ হয়। আমি যদি প্রথমেই চরিত্র হয়ে যাই তবে চরিত্রের যে ব্যাখ্যা আমি করবো সেই সুযোগটা কমে যায়। তাহলে ব্রেখটের তৃতীয় পক্ষের মতো সংলাপ পাঠ করবো। পরে নাট্যকারের চরিত্রটি কীভাবে আমি আমার মধ্যে রূপদান করবো সেই প্রসঙ্গটি আসে। মূলত চরিত্রাভিনয় করার মতো যোগ্যতা তৈরি করতে হয়। তাই আমি মহড়ায় ইম্প্রোভাইজেশন ও থিয়েটার গেমস করে থাকি। যাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী সাবলীল হয়। কারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর তো অন্য একটা চরিত্রের শর্তকে অর্জন করতে হবে। সেই অর্জন করার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীরের দক্ষতার প্রয়োজন। এর জন্য থিয়েটার গেমস গুরুত্বপূর্ণ।'[২০৬]

ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যবহার করে অনুশীলনে সচেষ্ট থাকেন। এমন কি তিনি ডাক্তার ও মনোডাক্তার নিয়ে এসে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর এবং শরীরের দক্ষতা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বাচিকাভিনয়ের জন্য শব্দ উৎপত্তি মূলের সাথে অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিচয় ঘটাতে চান। অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনোস্তত্ত্ব এবং চরিত্রের মনোস্তত্ত্ব বোঝার জন্য মনোবিশেষজ্ঞ নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'আমি বর্তমানে *ফেইড্রা* নাটকটি নিয়ে কাজ করছি। সেখানে ফেইড্রা চরিত্রটি বিষপান করে। এই বিষে যে প্রতিক্রিয়া মানব শরীরে ঘটে সেটা বুঝানোর জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসি। ডাক্তার মানবদেহে বিষের প্রতিক্রিয়া বনর্ণা করেন এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী শুনলেন, শুনে তাদের মধ্যে বিষ পান করার পর চরিত্রায়ন করতে নিশ্চই উপকারে আসবে। অভিনেতা-অভিনেত্রী শুধু

২০৪. শাহমান মৈশান, দি লেডি ফ্রেম দি সি পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা, *ভোরের কাগজ*, ঢাকা ১৯ মে ২০০৬।

২০৫. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

২০৬. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

পর্যবেক্ষণ দিয়ে কপি করলে হবে না। তাকে বিশেষজ্ঞ দ্বারা যুক্তি খুঁজে অভিনয় করতে হবে। *এ ডলস হাউজ* নাটকে নোরা চরিত্রটি যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে, পরিবারের সাথে থাকবে না। এ সময় নোরার কী পরিস্থিতি ঘটে সেটা বোঝার জন্য মনোবিজ্ঞানী নিয়ে আসি। যাঁরা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন।'[২০৭]

ইসরাফিল শাহীন একজন ভ্রমনপিপাসু মানুষ। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের থিয়েটার সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। তিনি বিভিন্ন দেশের থিয়েটার দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি বলেন– 'দেশ-বিদেশ বলতে আমি পৃথিবীকে বুঝে থাকি। আমি বিশ্বের বিভিন্ন থিয়েটার দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং আমার মধ্যে নতুন চিন্তার উম্মোচন হয়েছে। তার মানে এই বাইরের থিয়েটারের সাথে পরিচিত হলেও আমার স্বকীয়তা বা নিজস্বতা নষ্ট হয় নি। এগুলো দেখলে, পড়লে এবং শুনলে আমার স্বকীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। আমি তো কোনোকিছুর গোলাম না বা দাস নই। সহজেই বিক্রি হয়ে যাই না। সেটা কোনো রাজনৈকি দলের কাছে না, কোনো তত্ত্ব-সূত্রের কাছেও না। আমি যাচাই করি, প্রশ্ন করি, সন্দেহ প্রকাশ করি। আমি কোনো সূত্র অনুকরণ করতে চাই না। আমি অনুকরণ না করে অনুপ্রাণিত হই। অনুপ্রাণিত হলেও আমাকে গ্রাস করতে পারে না। অনুপ্রাণিত হয়ে কতগুলো নতুন পথ, নতুন ঢেউ এবং সৃজনশীলতা তৈরিতে সহযোগিতা করে।'[২০৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে খুব সহজেই নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন-এর কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তবে তিনি যেভাবে কাজটাকে দেখছেন সেটা অবশ্য তাঁর কাজের এক ধরনের 'নিজস্ব' প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই কর্ম-প্রক্রিয়াকে নির্দেশকের 'স্বতন্ত্র' পদ্ধতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি 'তত্ত্ব-সূত্র' বা 'মেথড' প্রয়োগ করেন কি না জানতে চাইলে তাঁর ব্যাখ্যায় স্ব-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি দাবি করেন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রচলিত অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো মেথড অনুসরণ করেন না। বরং তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁর নির্দেশনা কৌশলের তত্ত্বমূলে রয়েছে তাঁর 'নিজস্ব' তাত্ত্বিকদৃষ্টিভঙ্গি। তথাপিও তাঁর নির্দেশিত নাটক এবং নাট্য-বিষয়ক একাধিক আলোচনাসূত্রে ব্রেখট, স্তানিস্লাভস্কি, গ্রটস্কি, মেয়ারহোল্ড ও মাইকেল চেখভসহ একাধিক তাত্ত্বিকের অভিমত ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইসরাফিল শাহীনের সাথে আলাপনে জানা যায় তিনি অনুপ্রেরণার মধ্যদিয়েই তাঁর মধ্যে অনাবিষ্কৃত স্মৃতি, ইচ্ছা, অনুভূতি, আগ্রহ, ইঙ্গিত বা সংকেত সবকিছু উন্মোচন হতে পারে। অপরের কাছ থেকে শেখার ক্ষেত্রে দোষের কিছু নেই তবে সেটা যেন নকল না হয়। তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নিজস্ব প্রক্রিয়া বা প্রণালি তৈরিতে ব্রতী হয়েছেন। নিম্নে ইসরাফিল শাহীনের নিজস্ব প্রক্রিয়া তুলে ধরা হলো :

---

২০৭. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।
২০৮. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

পশ্চাত্য অভিনয়পদ্ধতি আমরা তোতা পাখির মতো পড়ে এসেছি। যখন পড়াচ্ছি, অনুশীলিত হচ্ছে কিন্তু কোনো চিরচেনা পরিচিত পদ্ধতি বা সূত্র কি আমাদের নেই? তাহলে হাজার বছরের আমাদের দেশে অভিনয়শিল্প কীভাবে হয়ে আসছে। স্তানিস্লাভস্কি, গ্রটস্কি, ব্রেখট, মেয়ারহোল্ড বা ভরত মুনির তত্ত্বের শক্তি, পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা, শাস্ত্রীয় কাঠামোবদ্ধতার শক্তি তো অস্বীকার করে, এভয়েড করে এই কথা বলছি না। বলছি শুধু আমরা যখন অভিনয় শেখাতে যাই বা শিখি তখন কি আমাদের জীবন থেকে, আমাদের ট্র্যাডিশনাল কালচারাল লাইফ থেকে কোনো মডেল বা ফর্মূলা অথবা এভাবে যদি নাই বলি– বলি কোনো উদ্দীপনা, কোনো স্বপ্ন ক্লাসরুমে বা গ্রুপ থিয়েটারের মহড়াকক্ষে শিক্ষার্থী শিল্পীদের সামনে তুলে ধরতে পারছি? যা খুবই চেনা, সহজ। আর নিজের এই প্রশ্ন তৈরির পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের একান্ত নিজস্ব এক অসাধারণ ইমোশন, স্মৃতি ও প্লুরাল লাইফের চারটি উদ্দীপক ঘটনাকে বিদেশের বিকল্প না হোক পাশাপশি অভিনয় মডেল হিসেবে ভাবতে চাই। এগুলোকে মডেল বলতে যদি আপত্তিই করি তাহলে অভিনয় অনুধাবনের জন্যে কমপক্ষে একটা কিউ, একটা সূচনা বলি। যেখান থেকে, যে চেনা সরলতা থেকে আমাদের অভিনয়ের শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা মোটিভেটেড হবে। অভিনয়টাকে একান্ত আপনার করে রিয়েলাইজ করবে। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি– যেমন খুশি তেমন সাজো এই মডেলটির কথা। স্কুলের বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতার একটি ইভেন্ট হিসেবে সবারই প্রিয় ১০০ মিটার বা ৫০০ মিটার দৌড় কিংবা হাইজাম্প, লংজাম্পের মতোই এটি একটি খেলার ইভেন্ট। স্কুলের মাঠ। স্কুলের ছাত্র শিক্ষক, সুধি, দর্শক সবাই যেমন খুশি তেমন সাজোকে একটু পরেই উপভোগের জন্য অপেক্ষা করছে। সবার মধ্যে কৌতুহল, কৌতূক ও মজা পাওয়াটা টের পাওয়া যায়। দেখা যায় সবার সামনেই কিংবা স্কুলের কমনরুমে প্রতিযোগীরা নিজেদের ড্রেসিং করছে, মেকাপ নিচ্ছে। এটা হচ্ছে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ থেকেই। প্রতিযোগী একটা প্রস্তুতির মধ্যে আছে। চারদিক থেকে আবার সমবয়সী, সহপাঠী কিংবা কৌতূহলী ছেলে-মেয়েরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এতে কিন্তু যারা সাজছে তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। ওরা একদমই বিচলিত নয়। দেখা যায় কেউ গায়ে কাদামাটি মেখে মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছে, কৃষক হচ্ছে, কেউ ভিক্ষুক হচ্ছে, কেউ বর-বধূ হচ্ছে। এই সেজে একটা কিছু হয়ে যাওয়া একেই তো আমরা অভিনয় বলি। আর সবাই তখন উপভোগ করছে। সজ্জিত কিশোরটি বা কিশোরিটি কিন্তু তখন আর নিজের মধ্যে বা আগের মানুষটি নেই। তার হাবভাব, মুদ্রা, চলাফেরা, কণ্ঠস্বর, কথা বলা, চাহনি, বয়স, মানসিকতা সব বদলিয়ে সে তার আকাঙ্ক্ষিত ক্যারেক্টারের ভেতরের ও বাইরের জগৎটি কিন্তু তৈরি করে ফেলে। এটা উপভোগও করছে সবাই যেন খেলার ছলে। এভাবে যেমন খুশি তেমন সেজে দর্শকদের সঙ্গেও

একটা সহজ, প্রীতিপূর্ণ আন্তরিক বিনিময় হচ্ছে। একেই তো আমরা কমিউনিয়ন বলি। তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনের উৎসবের ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই তো আমরা অভিনয়ের এই মডেলটি খুঁজি। কারণ এটি আমাদের এবং প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির বিষয়। তাহলে এই অভিনয় পদ্ধতিটা কোনো পদ্ধতিগত নয়। বুকিশ, কঠিন কিছুই নয়। আমাদের অভিনয় শেখার জন্য এটাই একটা দৃষ্টান্ত, একটা অভিজ্ঞতা। এর চরিত্র নির্মাণ, এর মধ্যে যে কল্পনাশক্তি, যে মন সবটা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা এগুলোই তো অভিনয় পদ্ধতির বিষয়। আর এগুলোতে আমাদের একান্ত ফ্যামিলিয়ার এক্সপেরিয়েন্স লুকিয়ে আছে। একে শুধু আবার ডেকে নিয়ে আসতে হবে রিহার্সেল রুমে। যেমন খুশি তেমন সাজের মধ্যে এনজয়িং, প্লেজায়েবল মোটিফটা থাকে, তাকে ধরতে হবে। অভিনয় হলো আনন্দের, উপভোগের– যে করে আর যে দেখে, দুজনেরই।[২০৯]

দ্বিতীয় মডেলটি হলো ছেলেবেলার মা, বাবা, ভাই, বোন বা পরিচিত, চেনা বিভিন্ন রোল প্লেয়িং। খুব ছোটবেলায় বাড়িতে যখন বাবা থাকে না, মাও বাইরে। বড়রা কেউ নেই। কোন ফাঁকে একটু ছুটিতে,শাসনের একটু সীমানা পেরিয়ে বাবার জুতো, বাবার কোটটা, জামাটা পরে বাবা হয়েছি। কিংবা মায়ের শাড়িটা, চুড়িটা পরে মায়ের রোল প্লে করছি। হয়তো বেঢপ লাগছে কিন্তু মজা তো পেয়েছি। প্রতিটি চরিত্রই শিশুরা এখানে তৈরি করে অনুভব দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে। কোনো স্পষ্টতা নেই কিন্তু। আমরা শৈশবে রোল প্লেয়িং করেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মজা পেয়ে, আনন্দে। আধুনিকতম অ্যাক্টিং ডিসিপ্লিনের মূল কথাটাই তো হলো অকপট রোল প্লেয়িং। এই চর্চা সামষ্টিক জীবনের সব শৈশবেই আছে। আমরা বুড়ো হতে থাকি আর যেন আমাদের সৃষ্টি করার শক্তি কমে যেতে থাকে । আমরা বলি ছেলেবেলার এই স্মৃতিটাকে, জীবনের এই অভিজ্ঞতাটাকেই মডেল হিসেবে নাও। এটাই তোমার দৃষ্টান্ত, তোমার অনুপ্রেরণা। দেখবে অভিনয়ের পথেই তুমি চলছ। কিন্তু কোনো কাদা লাগছে না, পায়ে কাঁটা বিঁধছে না, ধুলোয় মলিন হচ্ছ না। কিন্তু তোমার পথে হাঁটা এবং ক্রিয়েট করাটা কিন্তু বাড়ছে। এর জন্য শিশু হওয়ার শক্তিটুকু স্রেফ সঞ্চয় করতে হবে। শিশুরা যেমন মা-বাবার মতো আপন চরিত্র রূপায়ণ করে তেমনি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও গ্রুপভিত্তিক অভিনয়কলার চর্চায় চরিত্রটিকেও আপন করে নিয়ে রূপায়ণ করতে হয়। অভিনেতাকে আসলে সব মানুষেরই আপন মানুষ হওয়া লাগে।[২১০]

---

[২০৯]. ইসরাফিল শাহীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ, *অভিনয় তত্ত্ব*, পৃ. ২।
[২১০]. প্রাগুক্ত, পৃ.৩।

তৃতীয় মডেলটি হলো ছেলেবেলার রান্নাবাটি খেলা। শহরে গ্রামে সবখানে সবসময়ে সব শিশুই রান্না-বাটি খেলে আসছে। এখানে শিশুরা বাড়ির উঠোনের কোনো কোনা বা ঘরের মধ্যে কোথাও বা বাড়ির ছাদে বারান্দাটাকেই মঞ্চে পরিণত করে। এটা না জেনেই করে। এক জায়গায় ওরা খেলছে। মুহূর্তে জায়গাটিকে ওরা কল্পনা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলছে। এর মধ্যেদিয়ে ওরা স্পেসই তো তৈরি করছে। কাঁঠাল পাতার টাকা নিয়ে দোকানে যাচ্ছে কিনতে। দোকানও এখানেই। দোকানে ধুলো-বালি, কুড়ানো-বাঁকানো ফুল, পাতা লতা, জিনিসপত্র ইত্যাদিই থাকছে। কেউ কিনে নিয়ে যাচ্ছে, রাঁধছে কেউ। ওরা আবার এই রাঁধা-বাড়াটাকে একটা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। এটা আজ বিয়ে বাড়ি। হয় পুতুলেরই বিয়ে হবে। কিংবা ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই কেউ বর বেশ নেয়, কেউ বধূ সাজে। তো যখন রাঁধছে তখন কিন্তু সত্যিই মনে হয় রাঁধছে কিন্তু আসলে তো খেলছে। মেলা থেকে কেনা ছোট্ট মাটির পাত্রটিকেই ভেবে নেয় বিশাল ডেকচি। রান্না হচ্ছে। চুলোয় আগুন। যেন হঠাৎ সত্যিই আগুনের আঁচটি বেড়ে যায়। রাঁধুনী শিশুটি হাতটা সরিয়ে নেয় এক ঝাটকায়। হাতের কোথাও যেন আগুনের বা সরা তোলার পর খুব ভাপ বা আঁচ লেগেছে। ও মনে করছে ওর হাতের ওই জায়গাটা জ্বলছে। শিশুটি কিন্তু সত্যি সত্যি স্বতঃস্ফূর্তভাবে থুথু ছিটা দিল কিংবা কাউকে বলল মলম মেখে দিতে। এই গল্পের এই অভিজ্ঞতার প্রতিটি বিন্দুই তো আমাদের প্রত্যেকের চেনা। স্মৃতির ভাণ্ডারে আছে।[২১১]

একটা জায়গাতেই ওরা দুই দলে ভাগ হয়ে কনেপক্ষ বরপক্ষ সাজছে। কনের বাড়ির লোকেরা টেনশন করছে বর কেন এত দেরি করে আসছে। দূরের বরের গ্রামের দিকে হয়তো কেউ আঙুল উঁচিয়ে বলছে, ও-ই যে দেখা যাচ্ছে। বর আসছে, বর আসছে। সবার মধ্যেই খুশি, হুল্লোড়। অথচ বর তো ওদের সামনেই, কী অনায়াসেই না শিশুরা একটা স্পেস তৈরি করে ফেলল। এই হলো কল্পনা। আর পরে বড় হয়ে অভিনয় শিখতে এসে তত্ত্বের গ্যাঁড়াকলে পড়ে খেই হারিয়ে ফেলে। তো দেখা গেল বরপক্ষ এসে গেছে। কনেপক্ষ গেট ধরেছে টাকা না দিলে তো বাড়ির অন্দরে যেতে দেওয়া হবে না। তর্ক হচ্ছে, ঝগড়া হচ্ছে। কনেপক্ষ দাবি করছে কম হলেও ২৫ টাকা দিতে হবে। আর বরপক্ষ বলছে খুব বেশি হলে ৫০ টাকা দিতে পারব। এখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, আড়ষ্টতা তো নেই-ই। অথচ কী নিপুণ অভিনয় হয়ে চলছে। আর এটা এমন বয়সে হয়, যখন ৫০ না ২৫ টাকা বেশি সেটাই বোঝা হচ্ছে না। তবু এতে কি খেলা কিংবা অভিনয় আটকে থাকছে? আবার এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় দুই বেয়াই দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লেগে যায় ভীষণ, বিষম ঝগড়া– তুই কাল আমাকে

[২১১] ইসরাফিল শাহীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ, *অভিনয় তত্ত্ব*, পৃ. ৩-৪।

মেরেছিলি কেন। পাল্টা বলছে তুই আমার বলটা নিয়ে গিয়েছিল কেন। তখন আর তাদের খেলার কথা মনে নেই। অকস্মাৎ ওরা বাস্তবে ফিরে আসে। আবার অন্যরা ঝগড়া মিটিয়ে দিতে আসে। দায়িত্বশীল বড় মানুষ হয়ে শিশুদের মধ্যেই কেউ এসে বলে, আরে থামুন, থামুন, আপনারা না বেয়াই বেয়াই। তখন ওরা আবার বিযুক্ত অবস্থা থেকে খেলায় ফিরে আসে। এভাবে বরকনের বিয়ে হয়। খাওয়াদাওয়ার শেষ হয়। কনে বাড়ির লোকেরা কেঁদেকেটে পালকি বিদায় করে। হঠাৎ হইহই করে আবার খেলা ভেঙ্গে যায়। এই খেলা বিশ্ববিদ্যালয় হোক কিংবা অন্য কোনো পেশাদারি অভিনয়মূলক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দলের অভিনয় অনুশীলনেই এক দৃষ্টান্ত, মডেল। একজন পূর্ণবয়স্ক অভিনেতাকে শুধু একটা মন্ত্র পড়তে হবে যে, পারো আমাকে ভুলিয়ে দাও। কিংবা নিজেকে ভুলে যেতে হবে। ভুলে গিয়ে শৈশবের সেই কল্পনা, সেই ঘটনা, সেই চরিত্র নির্মাণ, সেই অভিজ্ঞতা, সেই অনুরণন, সেই স্মৃতি সর্বোপরি সেই আনন্দটাকে কুড়িয়ে আনতে হবে। আমরা বারবারই বলাছি অভিনয় কোনো পদ্ধতির কোনো কঠিন-কঠোর কিছু নয়। বিদেশের তত্ত্ব, মোটা ইংরেজি বই আর অধ্যাপকের পণ্ডিতি পাঠদান অভিনয়কে দুরূহ করে ফেলে। শিল্প কি দুরূহতার ওপর কখনো দাঁড়ায়? এজন্যই আমরা বারবার বলি, ফিরে তাকাও আগে যা পেরেছি। পরে তা পারছি না। এই তো। অভিনয় শেখাতে গিয়ে, অভিনয় অনুধাবন করাতে গিয়ে, এই শিল্পের মর্মে প্রবেশ করতে গিয়ে বলছি শুধু আগে যা পেরেছি এখনো তা পারছি।[২১২]

এমনকি শৈশবে আমাদের গল্প শোনা। জোছনা রাতে উঠোনে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনছে শিশুটি। তার ঘুম আসছে না। মা রাজকুমার, লালপরী, নীলপরী, ডালিম কুমার কিংবা তেপান্তরের মাঠের গল্প বলছে। সেই গল্প অবিশ্বাস্য, অলীক জগতের। কিন্তু শিশুটি মায়ের মুখভঙ্গি, বলন ও আদরটা অনুভব করে কিন্তু সব বিশ্বাস করছে। শিশুর ভালো লাগছে। ওর চোখ ঘুমের আবেশে বুঝে আসে। অভিনয় তো আমাদের ঘুমের মতোই তৃপ্তি দেয়, ক্লান্তিহরণ আনন্দ দেয়। সেই গল্পবলার ঢঙটি, পরিবেশটি, আন্তরিকতাখানি, শ্রোতা হিসেবে শিশুর বিশ্বাস, কল্পনাপ্রবণতা, স্বপ্নটা আর কোমলতাটাই প্রয়োজন, অভিনয়ের জন্য। এর জন্য মেথড লাগে না। অভিনয়ের জন্য জীবনটা লাগে। লাগে জীবনের এই সব। আমরা এই মডেলগুলো জীবন থেকে নেওয়া প্রাণবন্ত অভিনয় উপস্থাপনের জন্য যেমন বলছি, বলছি আরো একটি করণে। আমাদের এই ন্যাচারাল অভিনয় ঘটনা বা অনুষ্ঠানগুলো নিরাভরণ। এর সেট, লাইট, কস্টিউম, প্রপস হাজার কিংবা লাখ টাকার বাজেট নেই। এ হলো স্বপ্রবৃত্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কল্পনার ডানা, স্বপ্নের বিস্তার নিষ্কলুষ, পবিত্র একটা হৃদয় আর ভারহীন, চর্বিহীন

২১২. ইসরাফিল শাহীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ, *অভিনয় তত্ত্ব*, পৃ.৩-৪।

একটা মাথার বুদ্ধি প্রয়োগে এই থিয়েটার আমাদের জীবন কতো হাজার বছর ধরে পূর্ণ করে আসছে। অথচ গরিব দেশে টাকা-পয়সার অভাবে গর্জিয়াস নাটক করার কী তাড়নাই না আমরা অনুভবের হীনমন্যতায় আক্রান্ত হই। এটা হয় আসলে পশ্চিমের সঙ্গে কমপেয়ারের জায়গা থেকে। ওদের প্রযুক্তি আছে, পুঁজি আছে তাই ওরা গ্লামারাস থিয়েটার করে। কিন্ত আমরা শূন্য। এই শূন্যতাই আমাদেরকে পূর্ণতা দেয় শিল্পে, অভিনয়ে। এক নিরাভরণ, নিরলঙ্কার অভিনয়শিল্পের জন্য এসব অভিজ্ঞতাও এখন আমাদেও প্রাণের শক্তি। আমাদের জীবনের অপ্রাচুর্য আমাদের অভিনয়শিল্পে কোনো শূন্যতাই তৈরি করে না। এই শূন্যতা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কখনোই ছোট জীবনের বোধ তৈরি করে না। শূণ্যতা তাই এখানে পূর্ণতা ও শক্তি। কেননা শিল্পকে প্রযুক্তি ও প্রাচুর্য কখনোই শাসন করতে পারে না।[২১৩]

অতএব উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বকীয়তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পাশ্চাত্য তত্ত্ব-সূত্রের গোলকধাঁধায় না ফেলে নাট্য-নির্দেশনায় এক নতুন পদ্ধতি বা অনুশীলন অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। যে অনুশীলন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সাবলীল ও প্রাণবন্ত করবে। নিরীক্ষাসূত্রে ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনে কার্যকর হতে পারে এমন কিছু পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নির্ণয় করতে সম্ভব হয়েছেন। যা কুশীলবের দৈহিক, মনো-দেহিক, ভাব ও বিশ্বাসগত প্রস্তুতি এবং প্রয়োগের ঐতিহ্যিক ও পরম্পরাগত চর্চা থেকে উৎসারিত বা অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং শহরায়তনিক নাট্যধারায় প্রচলিত পাশ্চাত্য-অনুসৃত অনুশীলন প্রক্রিয়ার সমান্তরালে কার্যকর হতে পারে। সেই লক্ষ্যেই ইসরাফিল শাহীন মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে উদ্বুদ্ধ করে এক সৃজনশীলতার দিকে নিয়ে যান। এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতি বা অনুশীলনের লক্ষ্যই একটি চাপমুক্ত সৃজনশীল প্রতিবেশে ‘আন্তর জীবনের’ (inner life) বহুমুখী স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে ‘দৈহিক জীবনের’ (physical life) প্রকাশ সক্ষমতাকে সাবলীল করে তোলা।

মহড়ায় ইসরাফিল শাহীন নাটকের ডিজাইনিং পুরো নাট্য-নির্মাণের সাথে সাঙ্গীকৃত করে নেন। পাণ্ডুলিপিতে ডিজাইনিং সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা থাকে সেগুলোকে তিনি প্রথমে বের করার চেষ্টা করেন। তাঁর মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রী পাণ্ডুলিপির সাথে ১০/২০টা সাদা পৃষ্ঠা রাখে। যেখানে তারা মহড়ার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনা, ডিজাইনিং ইত্যাদি ইঙ্গিত লিখে রাখতে পারে। এই লেখার প্রক্রিয়াটা তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মহড়ায় এবং বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে বলেন। এভাবে মহড়ার– স্থান, পোশাক, সেট, লাইট, দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়গুলো নোট রাখতে বলেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী ডিজাইনিং-

[২১৩] ইসরাফিল শাহীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ, *অভিনয় তত্ত্ব*, পৃ. ৪।

এর সাথে যুক্ত হয়। এছাড়া তিনি মহড়ায় পাণ্ডুলিপি পড়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ডিজাইনিং বিষয়ে কল্পনা করতে বলেন এবং নোট রাখতে বলেন। ইতোমধ্যে ডিজাইনার নিযুক্ত হয়ে যায়। তখন ডিজাইনারের সাথে বসে অভিনেতা-অভিনেত্রীর চিন্তা এবং নির্দেশক হিসেবে তাঁর চিন্তা এবং ডিজাইনারের চিন্তার সংশ্লেষ ঘটান। এক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীও ডিজাইনারদের সাথে সরাসরি কথা বলে থাকে। ইসরাফিল শাহীনের অনেক নাটকে ডিজাইনার অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে পৃথকভাবে কথা বলে ডিজাইন সম্পর্কে চিন্তা সংগ্রহ করে থাকেন। এভাবে মহড়ায় ডিজাইনার একটা ধারণা লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শহীন বলেন– 'আমার কাজের ক্ষেত্রে ডিজাইনারদের অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো পাণ্ডুলিপি পাঠ থেকে শুরু করে সার্বক্ষণীক মহড়ায় রাখার চেষ্টা করি। তাতে মহড়ায় নাটক নিয়ে যে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছে সেই বিষয়গুলো ডিজাইনার উপলব্ধি করতে পারে এবং ব্যবহার উপযোগী ডিজাইন তৈরি করতে পারে।'[২১৪] সংগীতের ক্ষেত্রে ইসরাফিল শাহীন তাঁর চিন্তার প্রয়োগ ঘটান। তিনি সাধারণত নাটকে লাইভ সংগীত ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। সেই কারণে যাঁরা সংগীত নিয়ে কাজ করেন তাঁরাও সার্বক্ষণীক মহড়া প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী যেভাবে সার্বক্ষণীক মহড়ায় থাকে ডিজাইনাররাও সেভাবে মহড়ায় সার্বক্ষণীক থাকবে বলে তিনি আশা করেন। তাতে করে ডিজাইনাররা অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারে। নির্দেশক হিসেবে তাঁর মতামত প্রতিনিয়ত ডিজাইনারকে দিয়ে থাকেন। নাটক যেহেতু একটি সম্মিলিত প্রয়োগ সেহেতু তিনি নির্দেশক হিসেবে কোনো কিছু এককভাবে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন না। ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'ডিজাইনাররা ধীরে-ধীরে আলোচনার মাধ্যমে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে ডিজাইনের রূপ দিয়ে থাকে। অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রাত্যহীক জীবনে চরিত্র নির্মাণের জন্য যে চর্চা করেন সেই অনুশীলনের সাথে নির্দেশক ও ডিজাইনার যুক্ত থাকলে ডিজাইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা সম্ভব।'[২১৫] ইসরাফিল শাহীন মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ডিজাইনারদের সাথে সবসময় ভালো সম্পর্ক রাখতে বিশ্বাসী। কারণ শিল্পের সাথে যাঁরা যুক্ত তাদেরকে তিনি পৃথকভাবেই সম্মান করে থাকেন। মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং ডিজাইনারদের সাথে নির্দেশক হিসেবে ইসরাফিল শাহীন বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাবলীল সম্পর্ক রেখে থাকেন। চাপ প্রয়োগ না করে খোলামেলা সম্পর্ক রেখে কাজ করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি নাটকের কলাকুশীলবদের সাথে পরিবারের সদস্যদের মতো আচারণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> পরিবারের মধ্যে আমরা যেভাবে একে অপরের কথা শুনি, ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাই সেভাবেই মহড়ায় কাজ করতে চাই। কাজেই অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্পর্কে না জানলে এবং অভিনেতা-

[২১৪]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

[২১৫]. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

অভিনেত্রী আমার সম্পর্কে না জানলে মহড়ায় কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয় না। পরিবারের মতো সম্পর্ক বজায় থাকলে কাজের ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়তা হয়। এতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সেনসেটিভ এবং জটিল মনোস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয়। মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বুঝলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজটা আদায় করা সম্ভব। অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ডিজাইনারকে সম্মান করতে হবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাথে কথা বলা উচিৎ। শিল্পে যাঁরা কাজ করতে আসেন তাঁরা বিশেষ চেতনা নিয়ে কাজ করতে আসেন, যোগ্যতা নিয়ে কাজ করতে আসেন, বিশেষ আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে আসেন। তাঁরা অর্থনৈতিকভাবেও কিছু পাচ্ছেন না। তাই আমি মনে করি দলের সবাইকে বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধার জায়গা থেকে মূল্যায়ন করা উচিৎ। এতে অভিনেতা-অভিনেত্রী সর্বশক্তি দিয়ে অভিনয় ক্রিয়ায় যুক্ত হবেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ডিজাইনারের মননে, সংবেদনশীলতায় কখনো আঘাত করা যাবে না। সকল মানুষেরই সীমাবদ্ধতা থাকে, দূর্বলতা থাকে সেগুলোকে মেনে নিয়েই অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ডিজাইনারদের সাথে নির্দেশককে কাজ করতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে জয় করার জন্যই আমরা কাজ করবো বা করছি। মহড়ায় পারিবারিক পরিবেশ থাকলে নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে দাবি করতে পারেন।[২১৬]

এই উদ্ধৃতিসূত্রে বলা যায় ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনাকে একটি সম্মিলিত প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করছেন। তাঁর কাজে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ডিজাইনারদের শ্রদ্ধার জায়গা থেকে মূল্যায়ন করে থাকেন। তিনি পারিবারিক পরিবেশ রক্ষা করে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাবলীল সম্পর্ক রেখে মহড়া পরিচালনা করে থাকেন। ইসরাফিল শাহীন মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নানান ধরনের ট্রীট দিয়ে থাকেন। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি দলের সবাইকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং খাওয়া-দাওয়া করান। এভাবে তিনি একঘেয়েমী দূর করে মহড়া সাবলীল ও প্রাণবন্ত রেখে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

ইসরাফিল শাহীনের কাছে মহড়া প্রক্রিয়া হলো ২৪ ঘণ্টা বা সার্বক্ষণিক। তিনি নির্দিষ্ট সময় মহড়ায় বসে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বাড়ির কাজ দিয়ে ছেড়ে দেন। তিনি বলেন– 'আমরা মহড়ায় ৩/4 ঘণ্টা খুব কাজ করে চলে যাই। চলে গিয়ে চরিত্র নিয়ে আর ভাবনাচিন্তা করি না। অন্য পরিবেশের সাথে মিশে যাই। আবার পরের দিন এসে নতুন করে শুরু করি। এক্ষেত্রে আমি আশা করি অভিনেতা-অভিনেত্রী মহড়া থেকে ফিরে গিয়ে চরিত্র নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। চিন্তাভাবনা করবে সংলাপ নিয়ে, মনস্তত্ত্ব নিয়ে এবং বাচিকাভিনয় নিয়ে। এভাবে কাজ হলে মহড়া অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও কার্যকর হয়। তখন দর্শকের সামনে যে নাটক উপস্থাপন হবে সেটা নিশ্চয়ই চমৎকার স্বাদের হবে। যে অভিনেতা-অভিনেত্রী

[২১৬] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

প্রাত্যহীক জীবনে মহড়া করেন সে নিশ্চয়ই ভিন্ন কিছু উপহার দিতে পারে।'[২১৭] ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রস্তুতি নিয়ে বেশি কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহড়া শেষে কারিগরি প্রদর্শনী এবং রান-থ্রু প্রসঙ্গে তিনি বলেন– 'আমাদের নাটক নিয়ে তো দর্শকের সামনে যেতেই হয় তাই নির্দেশনায় কারিগরি প্রদর্শনী খুবই জরুরি। মূলত আমি সবকিছুর সাথে সমন্বয় করার জন্যই রান-থ্রু এবং কারিগরি প্রদর্শনী করে থাকি। অভিনয়ের সাথে সংগীত, আলোক, প্রবেশ-প্রস্থান, সেট ও দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সমন্বয় করে থাকি। মহড়ার এলোমেলো কাজগুলোকে জোড়া লাগাই যাতে গোটা বিষয়টা একটা স্বতন্ত্র বিষয় হয়। এখানেই মূলত সব কিছুর কিউ তৈরি করি। সতর্কতার সাথে সবাই মিলে মহড়ার বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একটা সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করি। কখনো-কখনো আমি ৪ বা ৫ দিন ধরে কারিগরি প্রদর্শনী করে থাকি।'[২১৮] ইসরাফিল শাহীন কারিগরি প্রর্দশনী ও রান-থ্রুতে নাট্যের মূর্হুতগুলোকে সমন্বয় করার জন্য বার-বার অনুশীলন করেন। সবকিছুর সাথে সবকিছুর টাইমিং ঠিক করেন। এখানে তিনি কুশীলবদের তাড়াহুড়া এবং দৌড়াদৌড়িকে অনুৎসাহীত করেন।

উপর্যুক্ত অভিমত-সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, ইসরাফিল শাহীন নির্দেশনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্তানিস্লাভস্কি, গ্রটস্কি, মেয়ারহোল্ড, মাইকেল চেখভ-এর এ্যাকটিং মেথড বা তত্ত্বকে অভিনয়ের কার্যকর উপায় হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনা-কৌশল (পঞ্চ-সূত্র) প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। এক নজরে তাঁর নির্দেশনা-প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়– পাণ্ডুলিপি নির্বাচন, পাণ্ডুলিপি পাঠ, পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ, ইম্প্রোভাইজেশন, ব্লকিং, কম্পোজিশন, চরিত্রায়ণ, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আলোক ও আবহসংগীত পরিকল্পনা এইরূপ একটি ক্রমানুসার অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু এই নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর (চরিত্রের) যৌক্তিক উপস্থিতি নির্ণয়ে 'কৌশলগত পদ্ধতি' বা সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই আলাপনসূত্রে নির্দেশনা-প্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর অবস্থান এরকম যে, নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কোনো 'তত্ত্ব' বা 'মেথড' অনুসরণ করে নয় বরং মেথড সম্পর্কিত 'নিজস্ব' চিন্তা ও পদ্ধতির প্রয়োগকেই কার্যত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। তবে মহড়ায় আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স করার পঞ্চ-সূত্রগুলোর কোনো সংশ্লেষ আপনার নাট্য-নিদের্শনার নাটক নির্মাণে ভূমিকা রাখে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে ইসরাফিল শাহীন বলেন :

[২১৭] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

[২১৮] প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

আমার প্রক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীই সব কিছু। অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি চরিত্রগুলো ভালো করে পাঠ করে 'চরিত্র নির্মাণ' করে, তাহলে আমার বিশ্বাস পঞ্চ-সূত্রের ধাপগুলো বা বিধিগুলো অভিনেতা-অভিনেত্রী মহড়ায় কাজের মধ্যেই তৈরি করে ফেলে। বিন্যাস (কম্পোজিশন), দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন), চলন (মুভমেন্ট), ছন্দ (রিদম) ও নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)–এই সূত্রগুলো আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর চাপাতে চাই না। অভিনেতা-অভিনেত্রী দক্ষতা অনুসারে এগুলো নির্ণয় করতে পারেন। মহড়ায় আমি পঞ্চ-সূত্রের এই বিধিগুলো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ভালো করে বুঝিয়ে থাকি। তারা যখন এটা বুঝতে পারে তখন মহড়ায় অনুশীলনের সময় ভেতর থেকে চাপহীনভাবে প্রকাশ করতে পারে। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে থিয়েটার গেমস্-এর মাধ্যমে এই পঞ্চ-সূত্র সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকি। আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বলি তোমরা আমাকে একটা বিন্যাস (কম্পোজিশন) তৈরি করে দেখাও যেখানে চলন আছে, নির্বাক অভিনয় আছে, দৃশ্যায়ন এবং সর্বোপরি ভালো ছন্দ আছে। এভাবে ধাপগুলো যদি মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রী শিখে যায় তাহলে তারা যে চরিত্রে অভিনয় করবে বা যে দৃশ্য তৈরি করবে তখন অবচেতনভাবেই পঞ্চ-সূত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হবে। প্রাত্যহিক জীবনের বিন্যাস তো মঞ্চে হুবহুভাবে আসে না, আসে শৈল্পিকভাবে। তাই মানবজীবনের সম্পর্কের অর্থগুলো বুঝলেই ভালো বিন্যাসের (কম্পোজিশন) বৈশিষ্ট্য চলে আসে। দৃশ্যায়নে (পিক্চারাইজেশন) সংলাপ থাকবে না। এখানে ছবিটা দেখেই বুঝা যাবে যে বর-বধূ নৌকায় বাড়ি যাচ্ছে। অথবা একজন ডাক্তার তার রোগীকে দেখছে। আমরা মহড়ায় সাধারণত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বেশি সংলাপ বলাই, এক্ষেত্রে সংলাপ কম বলিয়ে দৃশ্যায়নের (পিক্চারাইজেশন) মধ্যদিয়ে ঘটনা, চরিত্র এবং চরিত্রের সম্পর্ক প্রকাশ করা সম্ভব। তাতে করে নাটকে বৈচিত্র আসবে। সংলাপ যা বলতে পারতো তারচেয়েও দৃশ্যায়ন (পিক্চারইজেশন) অনেক কিছু বেশি প্রকাশ করতে পারে।[২১৯]

'পঞ্চ-সূত্র'-বিষয়ক উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসরাফিল শাহীনকে মেথড এ্যাকটিং বিষয়ে পাশ্চাত্যের স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেখট-এর ওপর যতোটা গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়, নির্দেশনা কৌশল হিসেবে পঞ্চ-সূত্রের প্রায়োগিক বিষয়ে ততোটা নয়। এতক্ষণের আলাপনসূত্রে মেথড এ্যাকটিং এবং নির্দেশকের দায়িত্ব ও কর্ম-কৌশল বিষয়ে ইসরাফিল শাহীনের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গেলেও 'নির্দেশনা-কৌশল' বা পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর অবস্থান অনেকটাই স্বাধীনচেতা। তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স করার 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহারের বিধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি বিষয়গুলো

[২১৯] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

জেনে-বুঝে নিজের মতো ব্যবহার করেন। তিনি মহড়াকক্ষে বিভিন্ন রকম থিয়েটার গেমস্, চর্চা এবং অনুশীলনের মধ্যদিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে 'পঞ্চ-সূত্রে'র পরিচয় ঘটিয়ে দেন, যাতে তারা নিজে-নিজেই সূত্রগুলো কাজে প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। বক্ষ্যমান গবেষণার চারজন নির্দেশকের মধ্যে ইসরাফিল শাহীন-এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নাট্যকলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাইতো তিনি 'পঞ্চ-সূত্র' জেনে-বুঝে তাঁর মতো করে ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বলেন– 'নির্দেশনার নানান অর্থ প্রকাশের জন্য এই পঞ্চ-সূত্র ব্যবহার করে থাকি। আমি নিজে এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এখন পঞ্চ-সূত্র নিজের মতো করে ব্যবহার করি।'[২২০] থিয়েটারের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন :

> ব্যক্তিকে জোর করে কোনো কিছু শেখানো যায় না। তবে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ নানা রকম হতে পারে, যেমন– প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রতিষ্ঠানের বাইরেও কিন্তু স্কুলিং থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে নাট্যকলা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা হচ্ছে। পদ্ধতিগত চর্চা হচ্ছে যেটা পূর্বে ছিল না। কিন্তু কেউ হয়তো প্রতিষ্ঠানের মতো কাজ করছে না। তিনি তার কাঠামো মেনে কাজ করছেন। এটা আপেক্ষিক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অনেক নির্দেশককে সহযোগিতা করে। আবার অনেককেই সহযোগিতা করে না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা প্রতিষ্ঠানের জন্য আক্ষেপ করে। কারণ সে মনে করে তার যে প্রতিভা আছে তার সাথে যদি প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা যুক্ত হতো তবে সে আরও উন্নতি করতে পারতো। জন্মগত যে সৃজনশীলতা তার আছে সেগুলোকে আরও বেগবান করতে পারতো। সে কারণে আমি কোথাও মৌলবাদী নই। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাট্যচর্চা হতে পারে আবার অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেও নাট্যচর্চা হতে পারে। আবার দুটো মিলেও হতে পারে। কিন্তু সেখানে কথা হচ্ছে শিক্ষাটা যেন সৃজনশীল হয়। কারও অনুকরণ যেন না হয়ে যায়। সার্টিফিকেট দিয়ে কখনও শিল্পী হওয়া সম্ভব না। সার্টিফিকেট দিয়ে বড়জোর একটা চাকরি পাওয়া যায়। একজন ট্রেইনর হওয়া সম্ভব কিন্তু শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পের জন্য প্রেমের প্রয়োজন হয়। শিল্পের প্রতি আসক্তি ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়।'[২২১]

ইসরাফিল শাহীন উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে থিয়েটারের ওপর শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করেন। তিনি শিক্ষণ-প্রশিক্ষণকে দুই ভাগে দেখে থাকেন, যেমন– প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নাট্যচর্চা হতে পারে আবার অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেও নাট্যচর্চা হতে পারে। আবার দুটো মিলেও হতে পারে। এই বিশ্বাসে

---

২২০. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

২২১. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

তিনি সচেষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি কোথাও মৌলবাদী নন। এছাড়া এই বক্তব্যসূত্রে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে একদিকে নির্দেশকের 'জ্ঞান/শিক্ষা' অপরদিকে অভিনেতার 'নিয়মানুবর্তিতা' এ দুয়ের সমন্বয়ে এমন এক নাট্য-ভাষ্য তৈরির কথা বলতে চেয়েছেন, যেখানে নাট্যক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ হয়ে উঠতে পারে সাবলীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি পৃথিবীতে যতো ধরনের জ্ঞান আহরণের জায়গা আছে সব জায়গা থেকেই নির্দেশককে শিখতে উৎসাহিত করেছেন তবে 'অনুকরণ' বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। অনুকরণ না করে বরং মৌলিক ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে কাজ করতে নির্দেশকে আহবান করেছেন। ইসরাফিল শাহীন-এর শিক্ষণ প্রণালীগত ডিসিপ্লিনের প্রয়োগ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর সর্বশেষ নির্দেশনা জ্যঁ রাসিনের *ফেইড্রা* অবলম্বনে *সাঁঝবেলার বিলাপ* প্রযোজনায়। সেখানে তিনি বলেন :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ থেকে যখন একটি প্রযোজনা হয় তখন সেটি আর স্রেফ একটি প্রযোজনারূপেই থাকে না। *সাঁঝবেলার বিলাপ* প্রযোজনাটি থিয়েটারের শিক্ষণপ্রণালীর ফলাফলরূপে নির্মিত। আমার মনে হয়, পেডাগজি বা শিক্ষণপ্রণালী কেবল কিছু নিয়মবদ্ধ নীতিমালা বা পদ্ধতিমাত্র নয়। শিক্ষাপদ্ধতি বলতে সাধারণত যা বোঝায়, শিল্পের শিক্ষণপ্রণালী তার চেয়েও বেশি কিছু। তাই থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মজিজ্ঞাসা করতে পারি যে, নব্য উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় পেডাগজি বা শিক্ষণপ্রণালী পরিভাষাটি কী অর্থ প্রকাশ করে? আমরা যখন বিভাগে একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে থিয়েটার নিয়ে কাজ করি, তখন পেডাগজি কেবলমাত্র একটি পদ্ধতির রূপরেখা নয়। এটি নিয়মবদ্ধতা বা পদ্ধতির বাইরে একটি অনিঃশেষ প্রক্রিয়াকেও চিহ্নিত করে। থিয়েটারে শিক্ষণপ্রণালীগত ডিসিপ্লিনের অর্থ হলো, শিক্ষার্থীদেরকে নতুন শিল্পভাষা সৃষ্টির জন্য সক্ষম করে তোলা, যাতে তারা নিত্যনতুন বাগ্‌বিধি আবিষ্কারের মাধ্যমে সৃজনশীল মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যশিক্ষা বা প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই সৃজনশীলতা নিশ্চিত করা একাডেমির এক প্রধান কর্তব্য বলে মনে হয়।[২২২]

মহড়ার পর দর্শকের সমীপে নাটকের প্রথম প্রদর্শনী হয়ে যাবার পরও ইসরাফিল শাহীন দর্শকের প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার জন্য সবার সাথে কথা বলে থাকেন। তিনি নাটক তৈরির পর বিভিন্ন শ্রেনির মানুষের কাছে নাটক মঞ্চায়ন করতে আগ্রহী। নাটক শুধু অডিটোরিয়ামে প্রদর্শনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না ইসরাফিল শাহীন। নাটকটির বিষয়বস্তু যে সব দর্শকের জন্য প্রযোজ্য অথবা যাঁরা ঐ বিষয়টির ওপর মতামত বা প্রতিক্রিয়া যানাবেন তাঁদের সামনে তিনি নাটক প্রদর্শনী করে থাকেন। এর উদাহরণ হিসাবে তিনি মাক্সিম গোর্কীর

[২২২] থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, *ফেইড্রা* অবলম্বনে *সাঁঝবেলার বিলাপ*, রচনা : জ্যঁ রাসিন , নির্দেশনা : ড. ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ১৫ অক্টোবর ২০১৬ ।

লোয়ার ডেপথ নাটকটি নীচুতলার মানুষদের সামনে প্রদর্শনী ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন — 'আমার এই কাজটি ছিল একটি ইঙ্গিত মাত্র। আমার ইচ্ছে ছিল নাটকটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নীচুতলার মানুষদের সামনে মঞ্চস্থ করার। যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিকভাবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যাঁরা বস্তিতে বসবাস করেন, শিল্পাঞ্চল এলাকা যেখানে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের মধ্যে, নিরক্ষর মানুষের মধ্যে এবং জন-মানুষের মধ্যে আমি নাটকটি মঞ্চায়ন করতে চাই এবং মানুষের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। তবে কোনো প্রদর্শনীই আমার কাছে শেষ প্রদর্শনী নয়। প্রদর্শনী করে নানান সম্প্রদায়ের মানুষের মতামত বা প্রতিক্রিয়া জেনে ফিরে এসে পুনরায় মহড়া করে আবার প্রদর্শনী করতে চাই। আমি মনে করি প্রদর্শনীর সময় একটি টিম থাকা উচিৎ যারা দর্শকের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করবে, লিখে রাখবে বা ভিডিও করবে। প্রতিক্রিয়া শুনে সংশোধন করে ৫০/১০০ টি প্রদর্শনী করার পর মূল মহড়া শুরু করতে চাই।'[২২৩]

আমাদের দেশে নানানজন নানান থিয়েটার করছে। শিল্পকলার নানান অর্থ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকে নির্দেশকই তাঁর কাজটা ভালো ও সুন্দরভাবে প্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। নাট্য-নির্দেশনার নতুন দিন উন্মোচিত হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে ইসরাফিল শাহীন বলেন– 'থিয়েটার নিয়ে সরকারকে স্থায়ী পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে হবে। পেশাভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা নিতে হবে সরকারকে। যেটা আমাদের কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে যে সংঘাত চলছে সেখান থেকে উত্তরণের জন্য সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রয়োজন, তা ঠিক আছে। কিন্তু কীভাবে এইসব ঐক্য তৈরি হবে তার কোনো দিন-নির্দেশনা নেই। তাই সরকারকে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের পূর্বসরীদের নাট্যচর্চায় অনেক ত্যাগ ছিল। কিন্তু সেই ত্যাগকে মূল্যায়ন করা হয় নি। এই মূল্যায়নের অভাবেই দেশে আজ দুরবস্থা। পূর্ব থেকেই সরকার যদি শিল্প-সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা শুরু করতো এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে দেশে এত অস্থিরতা থাকতো না। নাট্য-নির্দেশনার 'প্রক্রিয়া' একদিনে তৈরি হয় না সময়ের প্রয়োজন তাই নতুনরা আমাদের কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে সামনের দিকে নিয়ে নতুন নাট্যভাষ্য তৈরি করবে এটাই বিশ্বাস।'[২২৪]

নাট্য-নির্দেশকের নির্দেশনা 'পদ্ধতি' বা 'কৌশল' হলো তাঁর সৃজনশীল উদ্ভাবন এবং তা প্রয়োগের ধারাবাহিকতার মধ্যে ঐ রীতির কোনো সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিকে বুঝি। সমাজে বা রাষ্ট্রে যে মৌলিক

---

২২৩. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬।

২২৪. প্রাগুক্ত : তারিখ : ১৫-০৮-২০১৬ । (সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের দেওয়া বক্তব্য।)

সৃষ্টির স্বীকৃতি ও চলন বহুদিনের। সেটিই সময়ের ধারাবাহিকতায় এক সময়ে এসে তত্ত্ব কিংবা সূত্রে পরিণত হয়। সেই সত্যের ধারাবাহিকতায় নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন তাঁর নির্দেশনা কর্মের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য ও দেশজ নাট্যাঙ্গিকের বিভিন্ন ফরমকে অবলম্বন করে বিভিন্ন নাট্য-উপাদান প্রয়োগের মধ্যদিয়ে একটি নিদের্শনার ধারা সূচনা করেন। পাশ্চাত্যের তত্ত্বের সাথে দেশজ বিভিন্ন উপকরণকে নাট্য-প্রয়োগের মধ্যদিয়ে নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন মঞ্চে কেবলমাত্র কতগুলো দৃশ্যরূপই তৈরি করেন না বরং মঞ্চের সীমাকে দৃশ্যরূপ দ্বারা অবলুপ্ত করে দেন। ফলে একটি নির্দিষ্ট আয়োজনের মঞ্চে ঐ দৃশ্য অনিবার্যভাবে মঞ্চনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। নিদের্শক হিসেবে যে চলমানতা তিনি তৈরি করেন তার একটি নৈয়ায়িক ও শৈল্পিক ভিত্তি থাকে। কিন্তু একজন প্রকৃত নির্দেশক তাঁর কর্মের মৌলিকত্ব দ্বারাই সংজ্ঞা-সূত্র স্থাপন করেন। তিনি কখনো প্রচলিত অর্থে পূর্বকৃত ও সংবিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা আবিষ্ট বা পরিচালিত হন না। যেকোনো মৌলিক উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, প্রচলিত রীতি বা পদ্ধতি বিবর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে এলে সেই বিধিবদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে কোনো এক সৃষ্টিশীলের নবপন্থী আবিষ্কার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ইসরাফিল শাহীন নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ‘তত্ত্ব-সূত্র’ আবিষ্কারে সক্ষম না হলেও নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নাট্য-নির্দেশনার একটি নবপন্থা উন্মোচন করেছেন যেটি তাঁর একান্ত সৃষ্টি বলে আমরা জানি। নাট্য-নির্দেশনা বিষয়ে পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে থেকে তাঁর নাট্য-নির্দেশনা শৈলির বিষয়টি একেবারেই স্পষ্টতর আমাদের কাছে। দীর্ঘ সময়ের নিরলস চেষ্টা, সাধনা, সততা আর প্রজ্ঞার মধ্যদিয়ে অনেক দুর্বোদ্ধ নাটকের মঞ্চসফল প্রযোজনা আমরা ইসরাফিল শাহীনের নির্দেশনার পাই। তবে পাশ্চাত্য নাট্যকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নির্দেশনার কৌশল সম্পর্কিত আলেকজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা’র ‘পঞ্চ-সূত্র’ বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এমনটা অন্তত তাঁর এই দীর্ঘ আলাপনে পরিলক্ষিত হয় না।

ইসরাফিল শাহীন জানেন কী করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে চলতে হয়। তাঁর মেজাজের কাছে তাদের আত্মসমর্পন করতে হয় না, কিন্তু তিনি সবরকম ‘মেজাজ’–এরই কারণ তুলে ধরেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি খোশমেজাজে থাকে তাহলে ইসরাফিল শাহীন কিছুতেই তৃপ্ত হন না, তার কাছ থেকে সবটুকু আদায় করে নিতে চান। কিন্তু সেটা টের পাওয়া যায় না, আর অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিঃশেষিত করাও হয় না। ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনায় কাজ করেন প্রচণ্ডভাবে, কিন্তু সেটা চাপ মনে হয় না। মহড়ায় তাঁর রসিকতা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। সূক্ষ্ম ভঙ্গি আর মৌলিক উদ্দেশ্য-এ দেখে তাঁর খুশি অভিনেতা-অভিনেত্রীদেকে উত্তেজিত করে, তারা আরও বেশি দেখায় তাঁর প্রশংসা পাওয়ার জন্য। ইসরাফিল শাহীন মহড়ায় সব সময়ই জোরে বা উচ্চস্বরে কথা বলেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দর্শক আসন থেকে জোরে নির্দেশ দেন, যাতে সবাই শুনতে পায়। এটা তার খবরদারি বা কঠোর মনোভাবের বিরোধী নয়। ইসরাফিল

শাহীন তাঁর মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুশীলনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি মহড়ায় পদ্ধতিগত তত্ত্ব-সূত্রের সাথে অনেক বেশি নীরিক্ষাধর্মী কাজ করে থাকেন। তিনি নাট্য-নির্দেশনাকে মঞ্চ ও পেক্ষাগৃহের সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চান। নির্মাণ করতে চান নিজস্ব একটি নাট্যভাষা যা গড়ে উঠবে নাট্যকারের নির্মিত শব্দের বাইরে। এক্ষেত্রে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং উচ্চারিত ধ্বনির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি নানা দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক বৈচিত্রের সমন্বয়ে থিয়েটারকে বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন করে গড়ে তুলতে চান। ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর বুদ্ধি ও অনুভূতির সমন্বয়ে এক নাট্যভাষ্য বিনির্মাণে সদা সচেষ্ট।

ইসরাফিল শাহীন নাট্য-নির্দেশনায় যে নবপন্থা উন্মোচন করেছেন সেটি গবেষণায় অন্যান্য তিনজন নির্দেশকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তাঁর জীবন থেকে নেওয়া তিনটি ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন– ১. যেমন খুশি তেমন সাজো ২. ছেলেবেলার মা, বাবা, ভাই, বোন বা পরিচিত, চেনা বিভিন্ন রোল প্লেয়িং এবং ৩. ছেলেবেলার রান্নাবাটি খেলা। যা সত্যই ইসরাফিল শাহীনের নাট্য-নির্দেশনায় নতুনত্ব এবং ঈর্ষণীয়। তাঁর নাট্য-নির্দেশনার প্রথম দিকের কাজ দেখলে আমরা পাশ্চাত্য নির্ভরতা বেশি লক্ষ্য করি কিন্তু বর্তমানে তিনি অনেক বেশি বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষাধর্মী কাজে মনোযোগী হয়েছেন। যার উদারহণ আমরা ইসরাফিল শাহীনের সর্বশেষ প্রযোজনা জ্যঁ রাসিনের *ফেইড্রা* অবলম্বনে *সাঁঝবেলার বিলাপ* প্রযোজনাটিতে লক্ষ করি। এই প্রযোজনায় তিনি দেশজ নাট্যের কৌশলগুলোকে ব্যবহার করে এক নতুন নান্দনিক সৃজনশীলতার উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি স্বার্থকও হয়েছেন। তিনি নিয়মবদ্ধতা বা পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নাট্য-নির্দেশনার প্রক্রিয়াকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নতুন এক শিল্পভাবনা সৃষ্টির জন্য নিত্যনতুন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে নিরীক্ষা করে চলছেন।

নাট্য-নির্দেশনায় গবেষণা শব্দটি ইসরাফিল শাহীনের কাছে নতুন অর্থ তৈরি করে। তিনি গবেষণা শব্দটিকে পেশাগত জায়গা থেকে বিবেচনা করেন। একজন কাঠখোদাইকারী একটি নকশার ছাঁচ নিয়ে পুনঃখোদাই প্রতিনকশা বা বিচিত্র অনুকৃতি তৈরি করে তার পরম ও চূড়ান্ত নকশাটি খোদাই করেন। কাঠমিস্ত্রির কাজের এই প্রক্রিয়াটিকে গবেষণার একটি রূপক হিসেবে ইসরাফিল শাহীন গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে কাঠমিস্ত্রির কাজের প্রণালী তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীর উৎকর্ষের পথে পরিক্রমনের প্রণালীটা সাদৃশ্যপূর্ণ, তুলনাযোগ্য । জীবন ও জগতের এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ অঙ্গন ও অবস্থানে চোখ রেখে ইসরাফিল শাহীন থিয়েটারের চিন্তা ও চর্চার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকের সম্পর্ক নিয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণে মনোযোগ নিবন্ধ করেন। তাঁর কাছে অভিনয় আসলে ধন্যবাদহীন বা প্রশংসাবিমুখ এক অনন্ত প্রক্রিয়া। এখানে নিরন্তর বদলাতে-বদলাতে, বিবর্তিত হতে-হতে অভিনেতা-অভিনেত্রী চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় অভিনেতা-

অভিনেত্রীকে গতিশীল রাখতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসরাফিল শহীনের প্রক্রিয়া একটা 'বহমান অনুশীলন'। ইসরাফিল শাহীনের এই অনুশীলনের ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রী বস্তুগত সমৃদ্ধির বিপরীতে মানুষ হিসেবে ব্যক্তিসত্তার উৎকর্ষ অর্জনের মতো একমাত্র লক্ষ্য বা কাব্যতার দিকে ধাবমান থাকে। এতে অভিনেতা-অভিনেত্রী দেহে মনে সমগ্র অস্তিত্বে অনুভব করতে পারে এক নিঃশব্দ বিলীয়মান শান্তি। ইসরাফিল শাহীনের অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীরের সাহায্যে অভিব্যক্তি প্রকাশের সক্ষমতাই রপ্ত করতে চান। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর ও বাগাভিনয় চর্চায় অভিব্যক্তি প্রকাশের একমাত্র হাতিয়ার করতে চান। হাতের একটি বিশেষ ভঙ্গিমাতেই সবচেয়ে কঠিন *আহ্* উচ্চারণের দায় থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে রেহাই দিতে চান। তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শরীর সাঙ্গীতিক যন্ত্রের মতো যে কোনো মূর্ছনায় বেজে ওঠানোর জন্যে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি থিয়েটারের সমস্ত কলাকৌশলগুলোকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামনে নতজানু করাতে চান। কারণ তাঁর প্রক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীই প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইসরাফিল শাহীনের অভিনেতা-অভিনেত্রী কবির শব্দ বা ভাষা নির্মাণের মতোই ধ্বনি ও শরীরভঙ্গির মাধ্যমে নিজস্ব মনোবিশ্লেষণাত্মক ভাষা তৈরি করতে চায়। যেখানে প্রযোজনা উপহার দেওয়াই স্বার্থকতা নয় বরং মহড়ায় দীর্ঘ অনুশীলন প্রক্রিয়াই প্রধান গন্তব্য। তবে মেথড এ্যাকটিং বিষয়টিকে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অত্যাবশ্যকীয় উপায় হিসেবে মেনে নিলেও নির্দেশনার ক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগে তিনি কোনো একক সূত্র বা তত্ত্বকে উপায় হিসেবে না দেখে বরং একটি সমন্বিত সৃজন-প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখতে আগ্রহী। 'নির্দেশনা' বিষয়ে নির্দেশক ইসরাফিল শাহীনের প্রদত্ত এই সকল চিন্তা এবং ধারণাগত অভিব্যক্তির আলোকেই অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর নির্দেশিত *সিদ্ধান্ত* নাটক বিশ্লেষণসূত্রে পুনঃনিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নির্বাচিত চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম এবং ইসরাফিল শাহীন) পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল আলোচনা সাপেক্ষে অনুধাবন করতে পারি যে, এই মহাযজ্ঞটি তথা নাট্য-নির্দেশনার ব্যাপারটি একেবারেই সহজ কর্ম নয়। একটি জটিলতম বিষয়ের সমাধান খোঁজা। অর্থাৎ নির্দেশনার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সর্বাধিক সতর্কতার সাথে নির্দেশককে নানান ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এই নানান ধাপ সার্থকতার সাথে অতিক্রম করতে পারলেই আসে সৃজনশীল সাফল্য। পাণ্ডুলিপি থেকে মঞ্চায়ন পর্যন্ত একজন নাট্য-নির্দেশককে বিবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম শেষে যেতে হয় চূড়ান্ত প্রযোজনায়। এক্ষেত্রে যে নির্দেশক যতো সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারেন সে হন সার্থক নাট্য-নির্দেশক। যে যতো বেশি সূক্ষ্ম মেধার অধিকারী ও দক্ষ, সে ততো সহজে তাঁর সূত্র ও পরিকল্পনার প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি সুন্দর ও আশানুরূপ ফলাফল তৈরিতে ততোখানি সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করেন। সেক্ষেত্রে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসে যা নাট্য-নির্দেশকরা প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন। এই অধ্যায়ে যে চারজন নাট্য-

নির্দেশকের নির্দেশনা 'কৌশল' ও 'পদ্ধতি' আলোচনা হলো তাঁদের নির্দেশনার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাবটাই সর্বাধিক। যা সৃষ্টিশীল পন্থায় বিকশিত হয়ে আর্ন্তজাতিক নাট্যধারায় একটি অভিনব সংযোজন বলে মনে করা যায়। তাঁরা নাট্য-নির্দেশনায় সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যধারার অনুপ্রেরণাকে লোক-ঐতিহ্যের সহস্র বৎসরের ধারায় মিশে মঞ্চে তুলে এনেছে নব-নব সৃষ্টির সম্ভাবনা। যা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় নতুন একটি মাত্রা প্রণয়নে সম্ভাবনা রাখে। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় একজনও নির্দেশককে খুঁজে পাই নি, যিনি নিরলস প্রচেষ্টায় নাট্য-নির্দেশনার 'তত্ত্ব-সূত্র' আবিষ্কার করেছেন। 'তত্ত্ব-সূত্র' আবিষ্কার না হওয়ার পেছনে অবশ্য আমার গবেষণার চারজন নির্দেশক নানান বিষয়কে দায়ী করেছেন। যা অনেক ক্ষেত্রে যৌক্তিক আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দূর্বল যুক্তি মাত্র। তথাপি এর মধ্য থেকে কেউ-কেউ আবার নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ ঘটিয়ে একটি আধুনিক নির্দেশনার ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম এবং ইসরাফিল শাহীন হয়তো নতুন কোনো নাট্য-নির্দেশনার কৌশল আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব নাট্যরীতিতে নির্দেশনার কাজটি অব্যাহত রেখেছেন। এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে এক নতুন নাট্যভাষ্য তৈরি করে চলছেন। এই চারজন নির্দেশকের নির্দেশনা-পদ্ধতিকে লক্ষ্য করা যায় তাঁরা যেন এক অলৌকিক নাট্য-প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেককে ছাড়িয়ে যেতে চান। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় এই চার পরিচালক অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা

নাটক যেহেতু একটি শিল্প সেহেতু নাট্য-নির্দেশনাও একটি শৈল্পিক কাজ। সুতারাং এই কাজে নাট্য-নির্দেশকের শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। যে কোনো শিল্পকে প্রকাশ করার জন্য কিছু 'কৌশল' ব্যবহার করতে হয়। তেমনি নাটকের ক্ষেত্রে কৌশলটি হলো 'পঞ্চ-সূত্র'। যা পূর্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং এটাও পরিষ্কার যে এলোমেলোভাবে একটি নাটক নির্দেশনা দেওয়া যায় না। সুষ্ঠু নির্দেশনাকার্যটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম এবং সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সেই কার্যক্রম যথাযথভাবে রূপায়িত করার ফল। তারই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর খ্যাতিমান নাট্য-নির্দেশকদের নির্দেশনা-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা দুটি ভাগে বিভক্ত করে নির্দেশনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। যার প্রথম ভাগ হলো– প্রাক-মহড়া পর্ব এবং দ্বিতীয় ভাগ হলো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা মহড়া পর্ব। এই দ্বিতীয় ভাগেই নির্দেশক তাঁর প্রজ্ঞা ও শিক্ষার সমন্বয়ে কোনো 'কৌশল' ও 'পদ্ধতির' আশ্রয়পূর্বক অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিকল্পক, মঞ্চকর্মীদের সাহায্যে অবিষ্কার করেন মঞ্চ আলোকনের একটি নিজস্ব প্রক্রিয়া। সেই নিজস্ব প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য 'কৌশল' প্রয়োগ করতে হয়। বিশ্বব্যাপী নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহারের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নির্দেশক কী প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন সেটা পর্যবেক্ষণই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' শিরোনামের এই অভিসন্দর্ভকে দুটি ভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ হলো– নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র'। যেখানে পঞ্চ-সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগ হলো– বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল। যা পূর্বের অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে নির্দেশনা-কৌশলের 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের যে ছাপ, তা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে তা উক্ত গবেষণার চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নির্দেশকের চারটি প্রযোজনা সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার নিজস্ব পদ্ধতি, কৌশল, প্রক্রিয়া এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সুতরাং এই অধ্যায়ে যে চারজন পরিচালকের প্রযোজনা নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা হবে, তা নিম্নে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হলো :

নির্দেশক : আতাউর রহমান

নাটক : *বাংলার মাটি বাংলার জল*

নাট্যকার : সৈয়দ শামসুল হক

প্রযোজনা : পালাকার

বাংলার মাটি বাংলার জল নাটকের সময়কাল ধরা হয়েছে ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে সাধনা পর্যায় নামে পরিচিত। এই সাধনা ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং তাঁর সৃষ্টিউৎকর্ষের অন্যতম নিদর্শন। এই সময়টাতে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন, কাছ থেকে দেখেছেন বাংলার মানুষ, একান্ত হয়েছেন বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সঙ্গে, যার চমৎকার চিত্র রয়েছে সেই সময়ে রচিত তাঁর সমস্ত রচনাকর্মে, বিশেষত ছিন্নপত্রে। মূলত এই বাংলার জল-বায়ু-মাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলো, প্রভাবিত করেছিলো তাঁর রচনাকে। *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনাটির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই নাট্য কাহিনির আবর্তন। ফলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের নাট্যমঞ্চে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাতিজী ইন্দিরা দেবী চরিত্রটিও। সাথে-সাথে তৎকালীন বাংলাদেশ তথা শিলাইদহ পতিসর, শাহজাদপুরের বিচিত্র মানুষ এবং তাদের জীবনও উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাটক প্রসঙ্গে পালাকার কর্ণধার ও এই নাটকের সহ নির্দেশক আমিনুর রহমান মুকুল-এর ভাষ্য নিম্নরূপ :

> *বাংলার মাটি বাংলার জল* পালাকারের স্বভাবজাত বৈচিত্র ও নিরীক্ষার অংশ। এ নাটকের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধশত বৎসরে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। ঠিক তেমনি এ নাট্য আয়োজনে আমার দেশের রূপদর্শী মঞ্চ নাট্য-নির্দেশক আতাউর রহমানকে নির্দেশক হিসেবে পেয়েছি, তাঁর সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ লাভ করেছি। মঞ্চ নাট্য-নির্দেশক হিসেবে তিনি আমাদের দেশের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে আমাদের যে শিক্ষণ তা পালাকারের পথচলায় আজীবন প্রাণ সঞ্চার করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতোপূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাট্য প্রযোজনাকে অত্যন্ত সফলতার সাথে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এ নাটকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁর সাথে আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতা বণ্টনের এ শিল্প-প্রয়াস আপনাদের ভালো লাগবে, এ আশা রাখতেই পারি।[১]

১. পালাকার প্রযোজনা, *বাংলার মাটি বাংলার জল*, রচনা : সৈয়দ শামসুল হক, নির্দেশনা : আতাউর রহমান । রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে মঞ্চায়ন ২০১১।

উপর্যুক্ত উক্তির মধ্যদিয়ে পালাকার নাট্য সংগঠনের রবীন্দ্র ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি এই প্রযোজনার মধ্যদিয়ে সংগঠনটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে। নিরীক্ষাধর্মী এই প্রযোজনায় পালাকার নাট্য-নির্দেশক হিসেবে আতাউর রহমানকে নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। এবং আতাউর রহমানের রবীন্দ্র নাট্য-নির্দেশনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রযোজনাকে স্বার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনার গল্পসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

> বিলেত ফেরত রবীন্দ্রনাথ। পারিবারিক জমিদারি দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে আসতে হলো বাংলাদেশের শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে। এখানকার নায়েবের আয়োজন করা অভ্যর্থনার আতিশয্য সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে না, আর তাইতো রাজা সম্বোধন শুনে তিনি বলে ওঠেন, কে রাজা? আমি তো রাজা নই কিংবা উপস্থিত গ্রামবাসীকে বলেন, আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে থাকবো বলে। কলকাতা থেকে আসবার সময় রবীন্দ্রনাথ ভাতিজী ববকে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবী) কথা দিয়ে এসেছিলেন, বাংলাদেশে এসে যা কিছু দেখবেন তার সবই লিখে জানাবেন। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরে বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ নতুন করে আবিষ্কার করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, মানুষগুলোকেও আবিষ্কার করতে থাকেন নতুন রূপে। আর এসবের বর্ণনা চিঠি আকারে পৌঁছে যেতে থাকে ইন্দিরা দেবীর কাছে। কলকাতায় বসে কাকার চিঠির বর্ণনা পড়তে-পড়তে ইন্দিরার সামনে এসে উপস্থিত হয় বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতি। শিলাইদহে প্রধান কাজের লোক গফুরের দার্শনিক কথাবার্তা রবীন্দ্রনাথকে অবাক করে। শাহজাদপুরের সহজ সরল পণ্ডিতদের সুনীতি সঞ্চারিনী সভায় সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা তাঁকে আনন্দিত করে কিন্তু সভার বাড়াবাড়ি আহত করে। পতিসরের গরীব প্রজাদের ভলোবাসা তাঁকে করে সিক্ত। নদী বক্ষে বোটে ঘুরতে-ঘুরতে নদী তীরের নানান ঘটনা দেখতে-দেখতে তাঁর কলম থেকে সৃষ্টি হয় *জীবিত ও মৃত*, *সমাপ্তি* ও *ছুটির* মতন অসাধারণ সব ছোটগল্পের, আহমেদাবাদে থাকার সময় মনের মাঝে যে বীজ বপন করেছিলেন সেটা লেখার আকার ধারণ করে হয় *ক্ষুধিত পাষাণ*। প্রায় দিন যে পোস্ট মাস্টারের সাথে গল্পে আড্ডায় সময় কাটে, তাকে ভেবে সৃষ্টি হয় *পোস্টমাস্টার* গল্পের। এমনি করে রবীন্দ্রনাথের রচনার ঝুলি– গান, গল্প, কবিতা, নাটক সহ বিভিন্ন রচনায় সমৃদ্ধ হতে থাকে। পাশাপাশি ডাকাত রূপচাঁদ তাঁর বন্ধুত্বের পরশে ডাকাতি ছেড়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সাহসের সাথে সাহস মিলিয়ে মাঝি ফুলচাঁদ ঝড়-ঝঞ্ঝাপূর্ণ পদ্মার বুকে নাও ভাসিয়ে দেয়। গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো আপনজন মনে করে সরাসরি তাঁর কাছে এসে নালিশ জানায়, তাঁকে ভালোবেসে কখনো-কখনো শাসন করে, বকে। কখনো তাঁকে শুধু চোখ ভরে দেখবার জন্য আকূল হয়ে ওঠে। নায়েবের প্রশাসনিক ছকে বাঁধা

নিয়মকে তোয়াক্কা করে গরীব প্রজাদের জন্য কিছু করার উদ্যোগও গ্রহণ করেন তিনি। আর গগন হরকরার গানের সুর, গানের কথা রবীন্দ্রনাথকে আকূল করে তোলে। তাইতো গগনের– আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে, গানটির সুর ধারণ করে রচনা করলেন– আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।[২]

উপর্যুক্ত গল্পসংক্ষেপ অনুসারে *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনায় নির্দেশক আতাউর রহমান নির্দেশনা কৌশলের 'পঞ্চ-সূত্র'– বিন্যাস (কম্পোজিশন), দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন), চলন (মুভমেন্ট), ছন্দ (রিদম) ও নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) কীভাবে প্রয়োগ করেছেন তা নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা দেখা যেতে পারে। নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র হলো– বিন্যাস (কম্পোজিশন)। প্রধানত চারটি বিষয়ের মধ্যদিয়ে বিন্যাসের প্রকাশ ঘটে। নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার মতে– 'Composition is the rational arrangement of people in a stage group through the use of emphasis, stability, sequence, and balance, to achieve an instinctively satisfying clarity and beauty।'[৩]

চিত্র : রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ

[২] পালাকার প্রযোজনা, *বাংলার মাটি বাংলার জল*, রচনা : সৈয়দ শামসুল হক, নির্দেশনা : আতাউর রহমান । রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষে মঞ্চায়ন ২০১১।

[৩] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 109।

উপরের চিত্রে মঞ্চের কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চরিত্রাভিনয়ে' দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থান। অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে স্থানিক দূরত্ব, পরিসরসহ অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৃষ্টিকোণ ও কেন্দ্রে অবস্থানের কারণে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রাভিনেতা 'গুরুত্ব' পেয়েছেন। পাশাপাশি মঞ্চে উপস্থিত ছড়ানো ছিটানো দলগুলিকে 'মঞ্চস্থানের' সাহায্যে একটা ঐক্যবন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। মঞ্চে উপস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে কিছু 'সম্পর্ক' থাকেই। নির্দেশক এই দৃশ্য বিন্যাসের মধ্যদিয়ে *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বাংলার মানুষের সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন। একই সাথে নির্দেশক আতাউর রহমান দৃশ্যের 'ভারসাম্য' রক্ষা করেছেন। নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা ভারসাম্যকে দুই ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করেন। যেমন– '১. সুসমঞ্জস্য বা সেমেটরিক্যাল ২. অসমঞ্জস্য বা এসিমেটরিক্যাল।'[৪] উপরোক্ত চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই চিত্রে সুসমঞ্জস্য অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাস করা হয়েছে। এই দৃশ্যে অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মঞ্চের দুই পাশে রেখে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রে রূপদানকরী অভিনেতাকে কেন্দ্রে অবস্থান দিয়ে দৃশ্য-ভাবে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মঞ্চে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে করে এই দৃশ্যে নির্দেশক আতাউর রহমান সার্থকভাবে 'ভারসাম্য' স্থাপন করেছেন।

চলন (মুভমেন্ট) নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্রের অন্যতম একটি সূত্র। নাট্যে কখন কোন চলন ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে সংলাপ কিংবা পরিস্থিতির ওপর। *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাটকে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার প্রণীত চলনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

চিত্র : পোস্টমাস্টার ও রতন

৪. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 159।

নাটকে পোস্টমাস্টার চলে যাবে শুনে রতন অত্যন্ত কষ্ট পায়। রতন পোস্টমাস্টারকে অনুরোধ করে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার। কিন্তু পোষ্টমাস্টার এতে রাজী না হয়ে বরং তাকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিতে চাইলে রতন আবেগাক্রান্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সংবাদে কষ্ট শতগুনে রতনকে আঘাত করে টাকা প্রদানের আকাঙ্খা। এই যাতনা সহ্য করবার ক্ষমতা বালিকা রতনের নেই। তাই সে একাকী দুঃখ যাপনের অভিপ্রায়ে ছুটে বের হয়ে যায়। এই পালানোর দৃশ্যে রতনের আবেগের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মঞ্চের বাম দিক থেকে ডান দিকে চলনের ফলে এটি শক্তিশালী হয়েছে। নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– 'Repeated experimentation has shown that a figure or group passing from left stage to right stage gives the effect of stronger movement , as well as a greater amount and force of movement of the figure, than movement from right stage to left।'[৫]

সাধারণত আমরা যখন কিছু পড়ি বা ফটোগ্রাফ দেখি সেক্ষেত্রে আমরা বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে যাই। যখন আমরা মঞ্চে কোনো কিছু দেখি তখনও একই কাজ করি। যখন কোনো চরিত্র বা দল আমাদের চোখে যেভাবে ক্রিয়া করে সেভাবে হেঁটে যায় তখন চোখও চলমান মানুষগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। চরিত্রটি ততোক্ষণই আমাদের সাথে হাঁটতে থাকে যতক্ষণ না সে নেপথ্যে চলে যায়। অপরদিকে যেভাবে আমাদের চোখ অভ্যস্ত সেরকম না হয়ে চরিত্রটি উল্টো দিকে হাঁটলে চোখ স্বাভাবিকভাবেই একটু বাধাগ্রস্ত হয়। যখন এই দৃশ্যগত বাধার তৈরি হয় তখন আমরা বুঝতে পারি চোখের দেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ছন্দময় ডান থেকে বামে যাবার চেয়ে বাম থেকে ডানে যাওয়া শক্তিশালী চলন। সুতরাং নাটকের এই দৃশ্যে রতনের বাম দিক থেকে ডান দিকে চলনের ফলে দৃশ্যটি শক্তিশালী চলনে পরিণিত হয়েছে।

নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের অন্যতম একটি দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন)। নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দৃশ্যায়ন দ্বারা বোঝা যায়। দৌড়ে ছুটে যাবার পূর্বে রতন পোস্টমাস্টারের পা ধরে টাকা না দেবার অনুরোধ করে। রতন পোস্টমাস্টারের জন্য রান্না করে, গৃহস্থালির কর্ম সম্পাদন করে। পোস্টমাস্টারের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তার সাথে যেতে চায়। কিন্তু পোস্টমাস্টার তাকে টাকা ধরিয়ে দিলে রতন আঘাত পায়। বালিকা রতন ভালোবাসা থেকেই এসব করে। বিনিময়ে টাকা প্রাপ্তি তার সেই ভালোবাসাকে অবমূল্যায়িত করে।

---

[৫] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 194।

চিত্র : রতন ও পোস্টমাস্টার

উপর্যুক্ত দৃশ্য দ্বারা চরিত্রদ্বয়ের আবেগ-সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে, আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– ‘In life the relationship of one person to another and the body expression of the person himsa definite storytelling value।’[৬]

চিত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ

৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 174।

উপর্যুক্ত দৃশ্যায়নে (পিক্‌চারাইজেশন) দুজন ব্যক্তির দাঁড়ানোর ভঙ্গি চরিত্রদ্বয়ের 'সম্পর্ক' ব্যাখ্যা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের ভক্তি এখানে স্পষ্ট হয়েছে।

চিত্র : *বাংলার মাটি বাংলার জল*

উপর্যুক্ত আলোকচিত্রের মধ্যদিয়ে এটাই পরিষ্কার হয় যে, সার্থক দৃশ্যায়ন দ্বারা দৃশ্যের অর্থ, আবেগ নাটকের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকাশ করা যায়। উপোরক্ত চিত্রের দৃশ্যায়নের মধ্যে গল্পবলার দিকটাও প্রকাশ পেয়েছে। দৃশ্যায়নের সময় মনে রাখতে হয় যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও যেন শুধু চোখে দেখেই নাটকের দৃশ্যের অর্থ বুঝতে পারে, আবেগ অনুভব করতে পারে। নির্দেশক আতাউর রহমান *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনায় দৃশ্যায়নের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

নাটকে ছন্দের (রিদম) প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষণীয়। *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাট্যের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব বাংলায় আগমন দ্বারা এবং সমাপ্তি ঘটে সেখান থেকে প্রস্থানের প্রাক্কালে। চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ, আবহ, পরিস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োগ নাটকে লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসা পূর্ব বঙ্গের মানুষ যেমন নাটকের চরিত্র ছিল, সেইসাথে রবীন্দ্রনাথ রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রও এসে ধরা দেয় এই নাটকে। চরিত্রের ছন্দের ক্ষেত্রে বয়স, পেশা, অবস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র : বয়সের ভারে নুয়ে পড়া বৃদ্ধাকে সাহায্য করছেন রবীন্দ্রনাথ

আলেকজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– 'The number of beats and the variations in the placement of the accent are factors of pattern which affect the ultimate mood impression।'[৭]

নাটকে চরিত্রের শরীর ও মন সরাসরি দ্বান্দ্বিক নাট্যক্রিয়ার মধ্যদিয়ে চূড়ান্ত জটিলতার দিকে পৌঁছায়। এ ধরনের দ্বান্দ্বিক দৃশ্যগুলো গড়ে ওঠে ক্রমে-ক্রমে নাটকের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য। এ জন্য চলনের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং ছন্দ-লয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। লয়ের বহুবিধ বৈচিত্র্য চরিত্রের প্রকৃতি, চিন্তা, আচরণ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন আনে। *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনার দৃশ্যগুলো শুরুতে ছোটখাট চূড়ান্ত জটিলতাসম্পন্ন ক্রিয়ায় উত্থাপন, অপ্রত্যাশিত দ্বন্দ্ব, প্রচণ্ড জোরপূর্বক অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি চূড়ান্ত জটিলতা সৃষ্টি করে। তবে সমগ্র নাট্যের কাঠামোতে ছন্দের বৈচিত্র লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যিক কাঠামো প্রায় একই গতিতে এগিয়ে চলে। প্লটের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রৈখিক প্রবাহের পরিবর্তে এবং নাট্যিক উত্থান-পতন ব্যতিরেক নির্দেশকের রবীন্দ্র-ভক্তিই যেন প্রাধান্য পেয়েছে।

৭. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 237।

চিত্র : সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ী দোলনায় দোল খাচ্ছে

উপরের দৃশ্যে এক তরুণীকে দোলনায় দোল খেতে দেখা যাচ্ছে। তরুণী কোনো কথা না বললেও দোলনায় দোলা, উচ্ছ্বাস, হাস্যরত ভঙ্গি এক উচ্ছল তরুণীকে উপস্থাপন করে, যে মনের আনন্দে মুহূর্ত যাপন করছে। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের অন্যতম হিসেবে নির্বাক অভিনয়ের (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) কথা বলেছেন। দর্শক কেবল সংলাপ শুনতেই থিয়েটার দেখতে আসে না, নাট্যক্রিয়াও দেখতে চায়। নাট্যক্রিয়ায় বিজনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন :

> 'Business means going through the motions of actually opening and closing doors, wrapping bundles, dialing a telephone, writing a letter, using a handkerchief or a fan, and making other movements, gestures।'[৮]

৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 258।

সুতরাং *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় নাটকে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের পাঁচটি সূত্রের ব্যবহার হয়েছে। তবে নির্দেশক সচেতনভাবে ডিন ও কারা প্রণীত কৌশল অনুসরণ করেই নির্দেশনা কর্ম সম্পাদন করেছেন বিষয়টি এরকম নয়। অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক সূত্র পরিপন্থী প্রয়োগও দেখা গিয়েছে। নাটকে ছন্দের প্রয়োগে বৈচিত্র্য ছিল না। উচ্চতার দ্বারা চরিত্রের গুরুত্ব আরোপ করা হলেও ভুল চরিত্রকে উচ্চতার দ্বারা মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের গুরুত্ব হ্রাসের ন্যায় বিন্যাসও কখনো-কখনো দেখা গেছে। অবিন্যস্ত চলন দ্বারা রবীন্দ্র আবেগের আতিশয্যে নাট্যের রৈখিকতা বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

চিত্র : *বাংলার মাটি বাংলার জল*

আস্ত একটি নৌকা মঞ্চে দেখান হয়েছে অথচ নৌকা চলার সময় মাঝির পা মঞ্চে দেখা যাচ্ছিল। যদি চলাচলরত নৌকাই দেখানো হয় সেক্ষেত্রে এটি দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে। যা নিম্নের আলোকচিত্র দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে :

চিত্র : নৌকা

নিম্নোক্ত চিত্রে যে পালকি দেখানো হয়েছে তা ছিল গভীরতাহীন।

চিত্র : পালকি

বিন্যাসের ক্ষেত্রে কখনো 'রেখা'র দুর্বল প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। যা নিম্নের আলোকচিত্রে প্রকাশিত হয়েছে :

চিত্র : *বাংলার মাটি বাংলার জল*

উপরের চিত্রে তিনজন অভিনেতা একই রেখায় দাঁড়িয়ে আছেন। যা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত 'পঞ্চ-সূত্রে'র পরিপন্থি। নাটকে সংলাপ দ্বারা সবকিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন– 'এই যে শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসরের তোমরা'। নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিকভাবে সত্য পূর্ব বাংলার এই তিনটি অঞ্চলে থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী পরিচালনা করেন। সেখানে তাঁর কুঠিবাড়ি, কাছারিবাড়ি ছিল। কিন্তু পালকি থেকে নেমে নিশ্চয়ই তিন অঞ্চলের মানুষের সাথেই একসাথে কথা বলেন নি। নাটকে 'ক্রিয়া'র চেয়ে রবীন্দ্র ভাবের বহিঃপ্রকাশ অধিক মনে হয়েছে।

আতাউর রহমান-এর সাথে 'পঞ্চ-সূত্র' বিষয়ক আলাপনে এটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় যে, তিনি মেথড এ্যাকটিং বিষয়ে পাশ্চাত্যের স্তানিস্লাভস্কি ও ব্রেখট-এর ওপর যতোটা গুরুত্বারোপ করেন, নির্দেশনা কৌশল হিসেবে 'পঞ্চ-সূত্রে'র প্রায়োগিক বিষয়ে ততোটা গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায় না। সর্বোপরি বলা যায় আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত 'পঞ্চ-সূত্রে'র যা কিছু *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনায় প্রয়োগ হয়েছে তা নাটকে সহজাতভাবে এসেছে, নির্দেশক ডিন ও কারা অনুসরণ করে তা প্রয়োগ করেন নি।

নির্দেশক : মামুনুর রশীদ

নাটক : *টার্গেট প্লাটুন*
নাট্যকার : মামুনুর রশীদ
প্রযোজনা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

টার্গেট প্লাটুন নাটকে নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্র– বিন্যাস (কম্পোজিশন), দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন), চলন (মুভমেন্ট), ছন্দ (রিদম) ও নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) কীভাবে প্রয়োগ হয় তা নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা দেখা যেতে পারে। *টার্গেট প্লাটুন* নাটকটি নির্দেশনা প্রদান করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ। গীতল সুরে রচিত নাটকটির প্লট বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত ইতিহাসে সাধারণ মানুষের অবদান উপজীব্য করে আবর্তিত। নিম্নে এই নাটকের কাহিনিসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

> মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জীবনে এক মহাকাব্যিক ইতিহাস। এই ইতিহাসের সাথে মিশে আছে অসংখ্য আত্মত্যাগের স্মৃতি। এই কাব্যময় রক্তাক্ত স্মৃতির গীতিময় নাট্য প্রকাশ *টার্গেট প্লাটুন*। একজন বাবুর্চি-যে যুদ্ধকালীন সময়ে রান্না করেছে, প্রয়োজনে অস্ত্র ধরেছে, তার আত্মত্যাগের ইতিহাস হয়তো কোথাও লেখা নেই। বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরত একজন ইঞ্জিনিয়ার যে পাকিস্তানী ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে তার জীবন বলিদানের গল্প নিছক কল্পনা নয়। একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী অথবা একজন কুমোর অথবা একজন মূক-একজন বধির, একজন আদিবাসী যুবক জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। সেই জীবন উৎসর্গের গল্প হয়তো ইতিহাসে কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নি, তাই বলে তা কোনোভাবেই ইতিহাস বিচ্ছিন্ন কোনো গল্প নয়। এমনি হাজারো শ্রেনি, পেশা, গোত্র, ধর্মের মানুষ অকাতরে জীবন বলি দিয়েছে বলেই আমরা এই মানচিত্রের মালিকানা লাভ করেছি। যুদ্ধ মানে তো শুধু যুদ্ধ নয়। দেশে-দেশে সকল মুক্তির লড়াইয়ে শক্তি সঞ্চার করেছে, প্রেরণা জুগিয়েছে এমন অনেকে যাদের কথা মহাকাল মনে রাখে না। সেইসব অজানা গল্প আর অচেনা মানুষের আহুতির কাহিনি খুঁজে বের করার প্রয়াস *টার্গেট প্লাটুন*। বাদল, কুসুম, ফারুক, কালাপাহাড় নামগুলো হয়ত নাও মিলতে পারে সেইসব নাম না জানা বীরদের সঙ্গে কিন্তু তাঁদের আত্মোৎসর্গের গল্প সত্য বলেই মুক্তির সংগ্রামের বিজয়গাঁথা নিয়ে আজও আমরা গর্বিত।[১]

টার্গেট প্লাটুন নাটক সম্পর্কে নির্দেশক মামুনুর রশীদের প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য নিম্নরূপ :

---

১. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রযোজনা, *টার্গেট প্লাটুন*, রচনা ও নির্দেশনা : মামুনুর রশীদ ।

আমাদের লোকআঙ্গিকে গীতল ধারা রয়েছে বহুকালের। একদা আমাদের যাত্রাপালায় ও নাটকেও সংগীতের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। তারপর প্রসোনিয়াম মঞ্চে সংগীত কালক্রমে কমে আসে। তার স্থান দখল করে সংলাপ। আবার পালাবদল শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের নাটকে এখন গীতল নাট্য মূলধারায় জায়গা করে নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা একটু উচ্চাকাঙ্খী হয়ে একটা পুরো মিউজিক্যাল করার কাজে নেমেছি। ধারণাটা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে কাজ করার প্রচেষ্টা। এ একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। শুধু আমার জন্যে নয়– অভিনেতা-অভিনেত্রী, সংগীত পরিচালক, কোরিওগ্রাফার, পোশাক পরিকল্পক সবার। মঞ্চ ও আলোর পরিকল্পনাতেও অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশালত্বের প্রয়োজনে মঞ্চের সচরাচর স্থানকে বড় করে নিয়ে তার মধ্যে বিশেষ ধরনের আলোকসম্পাত এই আয়োজনকে বৈচিত্র্যময় করারও একটা প্রচেষ্টা। বিষয়বস্তু আমাদের আবেগঘন ইতিহাসের কিছু মুহূর্ত। মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলো। মুক্তিযুদ্ধের সেই রক্তাক্ত দিন, দেশপ্রেমের সেই অপূর্ব দৃশ্যাবলী যেগুলো এখনো আমাদের শিহরিত করে সেই মুহূর্তগুলোকেই এ নাটকে আনার প্রচেষ্টা।[১০]

নাট্য-বিশেষজ্ঞ আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের অন্যতম বিন্যাস (কম্পোজিশন)। নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের একটি বিষয়বস্তু আছে, একটি মেজাজ আছে। এক কথায় প্রত্যেক দৃশ্যেই একটি মূল ভাব আছে। একে বলা হয়– নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তি। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো এই নাট্য-মুহূর্তের ভাবমূর্তিটাকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণকে কোথায় দাঁড়াবে, বসবে বা ক্রিয়া করবে তা নির্ধারণই বিন্যাস। মূলত চারটি বিষয় দ্বারা বিন্যাস নির্মিত হয়, যেমন– গুরুত্ব আরোপ, দৃঢ়তা, আনুক্রমিক সম্পর্ক ও ভারসাম্য। নাটকের প্রতি দৃশ্যেই বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত অনুসারে একজন বা একের বেশি অভিনেতা-অভিনেত্রীর গুরুত্ব বেশি থাকে। এখানে সমস্যা হলো মানুষের ভিড়ের মাঝে বিশেষ কাউকে (বা কাউকে-কাউকে) দৃশ্যের ভাবগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ অনেকের মধ্যে একজনকে বা দু-একজনকে এমনভাবে দাঁড় করাতে বা বসাতে হবে যাতে সে বা তারাই দর্শকের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করে। অতত্রব *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের মধ্যে বিন্যাস (কম্পোজিশন) কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে তা নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা সম্ভব।

[১০]. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রযোজনা, *টার্গেট প্লাটুন*, রচনা ও নির্দেশনা : মামুনুর রশীদ ।

চিত্র : *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে বিন্যাস

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে টুলে বসে থাকা চরিত্র ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বিন্যাস নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রে অবস্থান, সম্মুখ শারীরিক ভঙ্গি, সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের নিবদ্ধ দৃষ্টি ও অন্যদের দাঁড়িয়ে থাকার পাশে তার চেয়ারে বসে থাকার বৈপরীত্য ফারুক ইঞ্জিনিয়ার চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। নাট্য-বিশেষজ্ঞ আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– ‘if a group of people is spread over the stage without much form, the actor in the centre area will take on emphasis।’[১১] উচ্চতা দ্বারা বৈপরীত্য সম্পর্কে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা লেখকদ্বয় বলেন– ‘The actor prone on the ground or sitting when the remainder of the group is standing will receive emphasis by sharp contrast।’[১২]

নাট্য-নির্দেশনার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দৃশ্যায়নের (পিক্‌চারাইজেশন) মূল উদ্দেশ্য মঞ্চে চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা। শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্য পরিস্ফুট করা। বিন্যাস দৃশ্যের ভাব মূর্ত করে অন্যদিকে দৃশ্যায়ন চরিত্রের চিন্তা, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশ করে। দৃশ্যায়নের কাজ হলো– অবস্থান, শরীর ভঙ্গি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে নাট্য কাহিনি প্রকাশে সহায়তা করা। দৃশ্যায়নের মধ্যে গল্পবলার দিকটাও রয়েছে। দৃশ্যায়নের সময় মনে রাখতে হয় যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও যেন শুধু চোখে দেখেই নাটকের দৃশ্যের

---

১১. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 112।

১২. Ibid, Page 114।

অর্থ বুঝতে পারে, আবেগ অনুভব করতে পারে। *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে দৃশ্যায়নের সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যা নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা সম্ভব।

চিত্র : *টার্গেট প্লাটুন*

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে হানাদার বাহিনীর সাথে সাধারণ বাঙালি। বাবুর্চি বাজার নিয়ে ফিরছিল, পথে হানাদার বাহিনীর মিঠ্ঠা ও আবদাল তার গতিরোধের পর জেরা করে। অস্ত্র হাতে দুই হানাদার ও বাজার হাতে ভূমিতে পতিত বাঙালির সম্পর্কের ভিন্নতা, দ্বান্দ্বিক অবস্থান, আপাত ক্ষমতার বিপরীতে অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ দৃশ্যায়ন দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের দৃশ্য গল্পের মূল ক্রিয়া ও অবস্থাকে ধারণ করে কাহিনিকে গতিশীলরূপে উপস্থাপন করে। মূল ক্রিয়ার প্রতি কেন্দ্রীভূত মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত দর্শককে নাটকের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। নাটকের মূল বিষয়বস্তু ও ভাবনার প্রকাশ ঘটে দৃশ্যায়নের মধ্যদিয়ে। দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে চরিত্রের দৈহিক প্রকাশ এবং পার্শ্ব চরিত্রের সাথে আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাত্যহিক জীবনে এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির সম্পর্ক এবং তার শারীরিক অভিব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট গল্প বলার তাৎপর্য। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদের তাদের থেকে দূরে রাখে যাদেরকে আমরা অপছন্দ, অবিশ্বাস এবং বিরোধিতা করি, বিপরীত দিকে তাদের কাছে নিয়ে যায় যাদেরকে আমরা বিশ্বাস করি, প্রশংসা করি, মেনে নেই ও ভালোবাসি। অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর নিকটই পরম আদরণীয় এদেশীয় দোসরদের সাথে তাদের সম্পর্ক নিম্নক্ত দৃশ্যায়নের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্র : হানাদার মিঠ্ঠা ও আবদাল এবং এদেশীয় দোসর আফজাল খান

উপরের চিত্রে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেই হানাদার বাহিনীর নিকটই পরম আদরণীয় এদেশীয় দোসর। সেও বাঙালি কিন্তু তাদের সহযোগী, ফলে দৃশ্যায়ন দ্বারা পরস্পরের সম্পর্কেও নৈকট্য স্পষ্ট হয়।

চিত্র : মেজর ও এদেশীয় দোসর আফজাল খান

উপর্যুক্ত দৃশ্যায়ন দ্বারা স্পষ্ট এদেশীয় দোসর আফজাল খান হানাদার বাহিনীকে তোষামোদ করছেন। তাতে অভিজ্ঞ মেজর সহজেই গদগদ হন নি বরং তার চরিত্রের দৃঢ়তা বজায় রেখেছেন।

নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র চলন (মুভমেন্ট)। মঞ্চে ক্রিয়ারত চরিত্রসমূহের বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করে চলন। শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গি, ক্ষেত্র, সমতল এবং স্তরের সাথে মঞ্চ চলনের জন্য রয়েছে কিছু নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট মূল্য। নির্দেশককে অবশ্যই এ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় যাতে কোনো ভুল চলন তাৎক্ষণিকভাবে বুঝাতে ও চিহ্নিত করা যায়। মূল্যের দিক থেকে চলনকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. শক্তিশালী চলন ২. দুর্বল চলন।[১৩] নাটকের অবস্থা বুঝে কখনো শক্তিশালী আবার কখনো দুর্বল চলন সচেতনভাবেই ব্যবহার করা যায়। কখন কোনটা ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে প্রধানত চরিত্রের সংলাপে এবং নাটকের দৃশ্যগত পরিস্থিতির ওপর। মঞ্চে পেছন থেকে সামনে এগিয়ে আসা, বসা থেকে ঋজু হয়ে দাঁড়ানো, সামনের পায়ে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানো, হাত তোলা ইত্যাদি হলো শক্তিশালী চলন। আবার দর্শকের দিকে পিছন ফিরে ওপর মঞ্চের দিকে যাওয়া, মাতালের মতো বা ক্লান্ত ব্যক্তির মতো হাত ঝুলিয়ে ঝুঁকে চলা, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে পেছনে হেলে পড়া, দাঁড়ানো থেকে বসে পড়া, হাত নামানো, গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বা চরিত্র থেকে দূরে সরে যাওয়া ইত্যাদি হলো দুর্বল চলন। নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করা যাক :

চিত্র : হানাদার বাহিনীর মেজর

[১৩] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 190।

উপর্যুক্ত চিত্রে শিয়ালের ডাক শুনে মেজর পিছু হটছেন। মঞ্চে পেছন দিকে হাঁটা দুর্বল চলন হিসেবে বিবেচিত হয়। আলেকজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা মতে– 'A weak movement is stepping backward, slouching, placing the weight on the rear foot, sitting down, lowering the arm, walking backward or turning around and walking away from a figure or object।'[১৪]

চলন চরিত্রের ধরন এবং মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। অতিমাত্রায় অভিমানী, অস্থির চঞ্চল চরিত্রের জন্য বহুমুখী চলনের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন– ওঠা, বসা, বারবার ওঠা-বসা, মঞ্চের একপার্শ্ব থেকে অন্য পার্শ্বে যাওয়া-আসা, অল্প মাত্রায় উত্তেজনা ইত্যাদি চলন সতর্কতার সাথে নির্দেশককে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অন্যদিকে আলস্য বা কুঁড়ে প্রভৃতি চরিত্র অল্প চলন দ্বারা চিত্রিত হতে পারে। তাছাড়া অধৈর্য্য, দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চিত, ভীতু, পিড়ীত প্রভৃতি চরিত্রের প্রকাশের জন্য নির্দেশক মামুনুর রশীদ *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে যথাযথ চলনের ব্যবহার করেছেন।

ছন্দ (রিদম) নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ছন্দের সাথে আমাদের জীবনের একটি সম্পৃক্ততা রয়েছে। আবেগ এবং অনুভূতি সৃষ্টি করতে ছন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মধ্যে যে ছন্দের অনুভূতি রয়েছে সেটা সুস্পষ্টভাবেই শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার ফল। অভ্যন্তরীণ সুস্পষ্ট আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে তা অনুভব করি এবং একের পর এক আমরা বৃদ্ধি করে চলছি সেই সকল ছন্দের সম্পৃক্ততাসমূহকে। ফলশ্রুতিতে আমরা যখন কোনো আবেগাশ্রীত দৃশ্য দেখি তখন সেই দৃশ্যের ছন্দ অনুভব করতে সমর্থ হই। ছন্দ এবং প্রকাশিত আবেগের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সম্পৃক্ততা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করে অভিনেতা-অভিনেত্রী সচেতন বা অবচেতনভাবে আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং এই সম্পৃক্ততার ওপর নির্ভর করে নির্দেশকও দৃশ্যে বা সমস্ত নাটকের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। *টার্গেট প্লাটুন* নাটকটির কাঠামো নির্মিত হয়েছে গীতল সুরে। নাটকে দুটো পক্ষ দেখানো হয়েছে। হানাদার বাহিনী ও সাধারণ মানুষ। উভয় পক্ষের মানুষের চরিত্রায়নে মৌলিক ছন্দেও বৈচিত্র লক্ষণীয়। প্রত্যেক চরিত্রের আলাদা-আলাদা মৌলিক ছন্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে গীতল সুরেও ছিল বৈচিত্র্য। যে স্থান বা পরিবেশে দৃশ্যের ঘটনা ঘটছে সেই স্থান বা পরিবেশেরও একটি নিজস্ব ছন্দ থাকে। নির্দেশককে সেটা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয় এবং সেই অনুযায়ী চলন, সংগীত, দৃশ্যপরিকল্পনা ও বিন্যাস করতে হয়। *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে নির্দেশক মামুনুর রশীদ মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়াবহ ছন্দকে নাটকে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। 'Rhythm is primarily factor which gives lift to the

---

১৪. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 190।

play।'[১৫] ছন্দ মূলত একটি নাটককে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। নাটকের ভাব, ধরণ, প্রকৃতি, নাট্যপরিস্থিতি, স্থান, অবস্থা, চরিত্রায়ণ, আবহ ও পরিবেশ প্রভৃতি প্রকাশ করতে ছন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যা আমরা *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে লক্ষ্য করি। নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করা যাক :

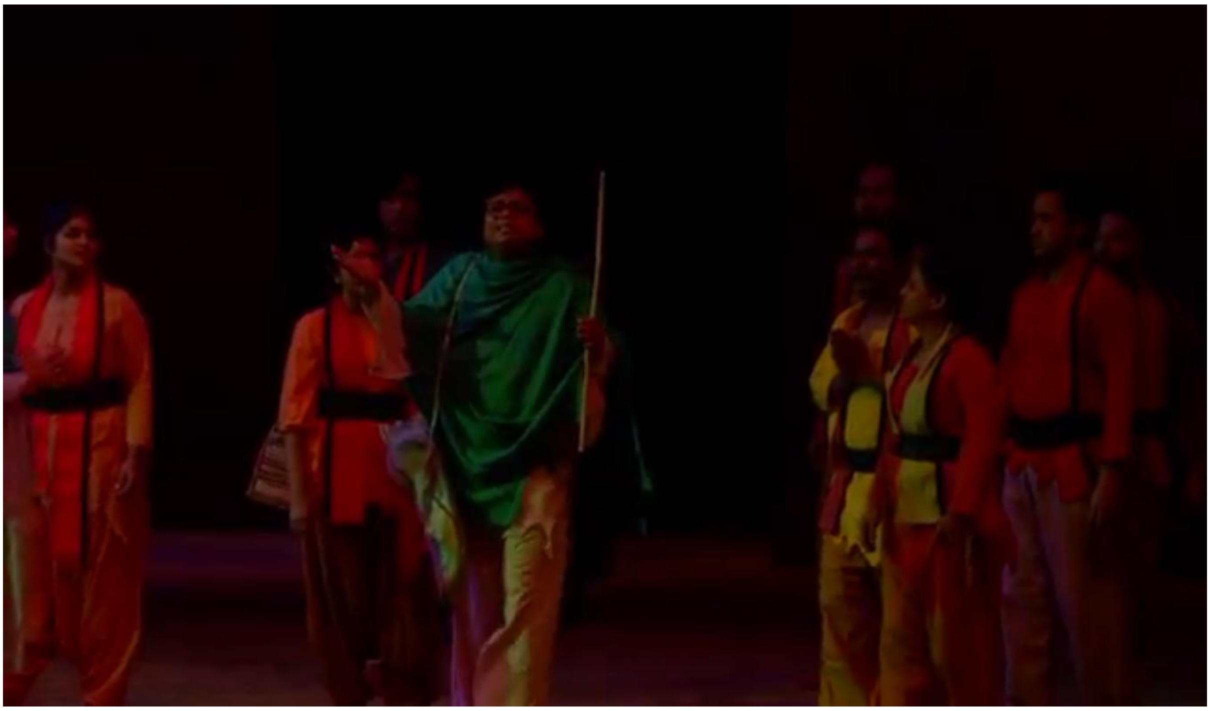

চিত্র : *টার্গেট প্লাটুন*

চিত্রে নিশিকান্ত স্যারকে দেখা যাচ্ছে। প্রৌঢ় এই চরিত্রের বয়স, পেশা, ধর্ম, সামাজিক অবস্থান, উপনীত পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুযায়ী চলন, সংলাপ ও অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে যে লয়ের প্রকাশ দেখা যায় তা অন্য চরিত্রের চেয়ে আলাদা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার হানাদার বাহিনীর চরিত্রসমূহের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। নাট্য-বিশেষজ্ঞ আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন :

> After the basic rhythm of a play has been established, each character should act in a rhythm which is that of the fundamental beat itself, or a multiple or division of it. Certain characters will have relatively fast or slow tempos which will be revealed through movement, speech, and gesture।[১৬]

---

১৫. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 242।

১৬. Ibid, Page 248।

নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের পঞ্চম সূত্র। নির্বাক অভিনয় হলো সংলাপহীন নাট্যক্রিয়া। নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে একটি নাটকের বিষয়, স্থান, চরিত্র প্রভৃতি স্পষ্ট করা সম্ভব। মনে করা যেতে পারে– একটি নাটক মঞ্চায়িত হতে যাচ্ছে, যার ভাষার সাথে দর্শকের কোনোরকম পরিচয় নেই। সেক্ষেত্রে চরিত্র, স্থান ও পরিবেশকে এমনভাবে চিত্রিত করতে হয় যাতে দর্শক তা বুঝতে পারে যে কী ঘটনা ঘটছে। কোনো রকম শব্দ দিয়ে তা বোঝান সম্ভব নয়। তাই সবকিছুই অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখ-ভঙ্গিমা ও চলন দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। একটি নাটকে নির্বাক অভিনয় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। নির্বাক অভিনয় দ্বারা সংলাপ না বলে ভাব, দেহের ভঙ্গি, হাত নাড়া, চলন ইত্যাদি দ্বারা চরিত্র, দৃশ্য, পরিস্থিতি, স্থান, পরিবেশ সার্থকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ করা যাক :

চিত্র : যুদ্ধের প্রস্তুতি

উপরের চিত্রে দৃশ্যের সূচনায় দেখা যাচ্ছে সংলাপ না বললেও অস্ত্র, অভিনেতাদের ক্রিয়া, দৃষ্টি, মনোযোগ ও ভঙ্গি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তারা অস্ত্র চালনা দ্বারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলেকজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– 'Much of the opening situation of an act or scene can be expressed through details of pantomimic business which will tend to make the exposition of the situation much more vivid।'[১৭] দৃশ্যের সূচনায় বিজনেস দ্বারা পরিস্থিতি প্রকাশের এই কৌশল নাটকজুড়েই অব্যাহত ছিল। পূর্ববর্তী

---

[১৭] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 261।

একটি দৃশ্যে যখন অস্ত্র ছিল না, তখন অস্ত্র ছাড়া কেবল শরীর প্রস্তুত দ্বারা যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্বাক অভিনয়ের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করা যাক :

চিত্র : *টার্গেট প্লাটুন*

সুতরাং উপর্যুক্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে *টার্গেট প্লাটুন* নাটকে নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের পাঁচটি সূত্রের প্রয়োগ হয়েছে। নির্দেশক মামুনুর রশীদের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় সহজাতভাবেই কৌশলগুলোর সংযোগ ঘটেছে। তবে সব ক্ষেত্রেই তা সার্থকভাবে হয়েছে এমনটি বলা যাবে না। যেমন চলনের ক্ষেত্রে পেছনে হাঁটা দুর্বল চলন হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু নাটকে বাবুর্চির চলনের এই কৌশল পরিস্থিতির সাথে বেমানান মনে হয়েছে। যা নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা সম্ভব :

চিত্র : *টার্গেট প্লাটুন* নাটক

এছাড়া হানাদার বাহিনীর দৃশ্যসমূহে যে গীতল সুর ব্যবহৃত হয়েছে তা বিগত শতাব্দীর হিন্দুস্থানি সুরের আশ্রয় বা অনুপ্রেরণায় তৈরি। যেখানে হানাদার বাহিনীর দৃশ্যসমূহ তাদের অত্যাচার, শোষণ, কুকীর্তির প্রতি দর্শক মনে বিদ্বেষ সঞ্চারিত হবে, তা না হয়ে সেখানে দর্শক নস্টালজিক হয়ে সুরটাকে উপভোগ করছে। ছন্দ বিঘ্নিত হয়ে নাট্যের মূল উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

সর্বোপরি বলা যায় *বাংলার মাটি বাংলার জল* নাটকের নির্দেশক আতাউর রহমানের মতোই *টার্গেট প্লাটুন* নাটকের নির্দেশক মামুনুর রশীদও আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা প্রণীত পঞ্চ-সূত্রের যা কিছু প্রয়োগ করেছেন তা সহজাতভাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই করেছেন। ডিন ও কারা অনুসরণ করে তা প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয় নি।

নির্দেশক : লাকী ইনাম

নাটক : *বিদেহ*
নাট্যকার : শাহমান মৈশান
প্রযোজনা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বীরাঙ্গনা-বীরমাতাদের অবদান অপরিসীম। 'স্বাধীনতার ৪০ বছর ও শিল্পের আলোয় মহান মুক্তিযুদ্ধ'[১৮] শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর একটি সফল প্রযোজনা *বিদেহ*। এই নাটকের নাট্যকার শাহমান মৈশান নাটকটি সম্পর্কে বলেন :

> ইতিহাসকে নাটকে মোকাবিলার ইতিহাস সামান্য নয়। শেকসপীয়রের ঊর্মিমুখর নাটকের দুনিয়া ইতিহাস-ফলনেই হয়েছে শস্যসঙ্কুল। বার্টল্ট ব্রেখটের মার্কসবাদী শ্রেনিসংগ্রামের রাজনৈতিক খোয়াবনামা ইতিহাসের হাতিয়ারেই হয়েছে বিপ্লবতীর্থগামী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন ও মামুনুর রশীদের বহু নাটকের দেহমনে ঝঙ্কারিছে বাংলার বঙ্কিম ইতিহাসের অনেক কলরোল। একজন লেখকের কাছে ইতিহাস সর্বদাই আকর্ষণীয় বীজভাণ্ডার। কেননা মানুষের আবহমান জীবন ইতিহাসের প্রবাহেই নির্মিত। তবে ইতিহাসের আশ্রয়ে কাহিনি কিংবা নাটকের জন্মবৃত্তান্ত রচনার ক্ষেত্রে লেখকের ফাঁদে নিপতিত হবার ভয়শঙ্কা কখনোই আত্মা ছেড়ে যায় না। ইতিহাসের অধিপতিশীল বয়ান কিন্তু অজ্ঞানসূত্রে লেখককে নসিহৎ করতে চায়, ডিকটেশন দিতে চায়। তবে সৃজনশীল লেখকমাত্রই ইতিহাসের ক্রীতদাস নয়। কাহিনির ভেতরে ইতিহাস পুনর্নির্মিত হয় ভাবাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডিসকোর্স নিপীড়িত বীরনারীর বয়ান কতটুকু হাজির আছে? প্রতাপশালী ডিসকোসর্কে তালাক দিয়ে দলিত নারীর দেহকেন্দ্রিক উৎসর্গের উচ্চারণকে আজকের দর্শকের ভাবনাসূত্রগুচ্ছ কোন প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত করবে–এই প্রশ্নের সুরাহার জন্য নাটক আমাদের জন্য খুব জরুরি এক আশ্রয়ী পাটাতন? ১৯৭১–এর লড়াকু ইতিহাসকে দলিত নারীর চোখ দিয়ে দেখার কিছু অভিমুখ, কিছু মনোভঙ্গির খোঁজ না ঘটাতে পারলে সময়ের মৌলবাদী-পুঁজিবাদী আঘাত মোকাবেলার রাজনৈতিক ভাষা হারিয়ে উপদ্রুত সময়ের করাল গ্রাসে আমরা লুপ্ত হয়ে যাব। এই শঙ্কাকুল প্রশ্নের সাথো-সাথে আরেকটি ইমিডিয়েট ভবনা আমাদের মগজে ফরমান জারি করে। যেমন, ন্যাশনালিস্ট ও পোস্টন্যাশনালিস্ট ডিসর্কোসের প্রেক্ষাপট আমাদের আত্মপরিচয়কে, উত্তরাধিকারকে কোন অভিমুখে ভাসাবে? কারণ, স্বদেশে বিদেশ ও পৃথিবীর নাগরিকত্বের ধারণাগুলোর খোলনল ইন্টারনেটকেন্দ্রিক এক ভারচুয়াল এপিক রিয়েলিটি আমূল উল্টে দিয়েছে। তবু আমরা জানি, ইতিহাস মারফতে অতীত নয়, কথা কয় বর্তমান। সেজন্যই মুক্তিযুদ্ধের কথন আমাদের কাছে হয়ে উঠে ভোরের বার্তাবাহিকা। মুক্তিযুদ্ধ যদি বাংলাদেশের ইতিহাসের দেহ গঠন করে তবে মুক্তিযুদ্ধের 'বীরাঙ্গনা' নারীরা নিপীড়িত হবার ইতিহাস এর

[১৮] বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রযোজনা : *বিদেহ*, রচনা : শাহমান মৈশান, নির্দেশনা : লাকী ইনাম । মঞ্চায়ন ২০১৩।

মাতৃগর্ভ রচিছে। মৌলবাদী-পুঁজিবাদী ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মুক্তিযুদ্ধের নিপীড়িতা বীরনারীদের বয়ান-ভাষ্য-নাটক আমাদের কাছে হতে পারে আগামী দিনের স্বপ্ন ও সাহসের আগুনদ্যুতি।[১৯]

নাট্যকার শাহমান মৈশান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভিত্তি করে *বিদেহ* নাটকে যেভাবে গড়ে তোলেন তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো :

> মেঘনা তীরবর্তী এক চরে হালিমা খাতুন ও শান্তিকুমারীর অধিবাসন। প্রায় ৪০ বছর ধরে একসাথে থাকার ভেতর দিয়ে এই দুই নারী যেন একে অপরের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশে আজ পরিণত। ধর্মবোধের পাথর্ক্য তাদের জীবনবোধকে বিচিত্রগামী করলেও ইতিহাসের এক উত্তাল অধ্যায় দুই জীবনকে এক অভিন্ন চৈতন্যে বেঁধে দিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের 'বীরাঙ্গনা' এই দুই নারী বুকের ভেতরে, দেহের অন্তর্গত রক্তস্রোতে পাক হানাদার ও মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের লালসার দগদগে স্মৃতি ও স্ফুলিঙ্গ বহন করে চলে। জোছনা-আপ্লুক্ত এক রাতে দুই নারীর কথোপকথন, দেহভঙ্গী, সংলাপ-প্রলাপের এক বাস্তব-পরাবাস্তব প্রতীকী আবহে হালিমা ও শান্তি পরস্পরবিরোধী অবস্থানটি হীরকদ্যুতিতে চিনে নেয়া যায়। এর ফলে দৃশ্যত এক মনোজাগতিক সংকটের অবতারণা ঘটে। হালিমা ভাবে, ইতিহাসের বিষপুরাণ যে নারীর দেহ অদ্য স্বাধীনতার বীজমন্ত্র সেই কথা নারীকেই আজ বলতে হবে। আবার, শান্তি অভিমানী। সে ভাবে, মুক্তিযুদ্ধে শত্রুলাঞ্ছিত এই দেহের মনোজাগতিক বিদীর্ণতাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে কেবলি স্বদেশ-সুধায় একদিন মৃত্য হলেই চুকে যাবে। হঠাৎ উৎকণ্ঠার মেঘমুহূর্তের মতো আসে এক তরুণী। সে এক আগন্তুক। উন্মোচিত হয় মেয়েটি একাত্তরের যুদ্ধশিশু। সে আজ পাশ্চাত্যবাসী। শান্তিভাবে, তরুণীটি দেখতে ঠিক হালিমার মতো। কিন্তু মেয়েটি বলে, তার মা আর বেঁচে নেই। স্মৃতি ও বাস্তবের এক অনিশ্চিত স্থানাংক রচনা করে মেয়েটি ঘাটে বাঁধা নৌকায় ফিরে যায়। কেননা এরই মধ্যে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঘটে হালিমার। মেয়েটি অদ্ভুত সব আলাপের ভেতর থেকে ছুটে আসা চিন্তা এবং সর্বোপরি হালিমার মৃত্যু নারী হিসেবে নিপীড়িত দেহের গল্প না বলার ট্যাবু এক প্রত্ন-ঝড়ে ভেঙে যায়। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত যে বাংলাদেশ সেই দেশমুক্তির স্বপ্নির ভেতরে নারীর এই নিপীড়িত দেহের গল্পতো নারীর উৎসর্গেরও ইতিহাস। একাত্তুরের উৎসর্গের গল্প অবশেষে শান্তিকুমারীর আজকের কথনের বিষয়ে পরিণত হয়। অগ্নিগর্ভ মুক্তিযুদ্ধে নারীর উৎসর্গের বয়ান অনেকমুখী। দৃশ্যের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর এই বহুমুখী লড়াইয়েরই এক অন্যসূত্রে হাজির করে নাটক *বিদেহ*।[২০]

নাট্যকার শাহমান মৈশান-এর পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেয়ে নির্দেশক লাকী ইনাম উদ্বেলিত। কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য নিম্নরূপ :

---

[১৯]. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রযোজনা : *বিদেহ*, রচনা : শাহমান মৈশান, নির্দেশনা : লাকী ইনাম । মঞ্চায়ন ২০১৩।

[২০]. প্রাগুক্ত, মঞ্চায়ন ২০১৩।

বাঙালীর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধ আমি দেখেছি। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছি। লাশ দেখেছি, লাশের পচন দেখেছি। দেখেছি কীভাবে দিগ-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে বাংলাদেশের নারীরা সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে। কীভাবে পদদলিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে অসহায় ছোট্ট শিশু। সশস্ত্র লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আর তাদের দোসরদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে বাঙালী নারী। তাইতো মুক্তিযুদ্ধের 'বীরাঙ্গনা' পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেমন আছেন বীরমাতা– রাহেলা, রাজুবালা, কমলা, হাসিনা ও সূর্য বেগমরা? কী কষ্ট আজও তাঁরা বহন করে চলছে? আমরা কি ভাগ করে নিতে পারি না তাদের সেই কষ্ট? নিতে হবে। কারণ আমরা দায়বদ্ধ। স্বাধীনতার চলিশ বছর পরও তাদের সেই ত্যাগের মূল্যায়ন আমরা করতে পারি নি। আমাদের ভূলে গেলে চলবে না ঐ লাল সবুজের পতাকায় ওদের অংশ আছে। জাতীয় সংগীতে ওদের কণ্ঠ আছে। ওরা বীর মুক্তিযোদ্ধা। এ স্বাধীনতা-এ অর্জন তাঁদেরই অবদান।[২১]

অতত্রব, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসনির্ভর *বিদেহ* নাটকে নির্দেশনার মৌলিক পঞ্চ-সূত্র– বিন্যাস (কম্পোজিশন), দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন), চলন (মুভমেন্ট), ছন্দ (রিদম) ও নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে তা নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা দেখা যেতে পারে। নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের অন্যতম বিন্যাস (কম্পোজিশন)। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা Fundamentals of Play Directing গ্রন্থে বিন্যাসের যে কৌশল বর্ণনা করেছেন *বিদেহ* নাটকে তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ অপর পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখা যেতে পারে :

[২১]. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রযোজনা : *বিদেহ*, রচনা : শাহমান মৈশান, নির্দেশনা : লাকী ইনাম । মঞ্চায়ন ২০১৩।

চিত্র : *বিদেহ* নাটকে হালিমা ও শান্তিকুমারী

বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপের জন্য উচ্চতা ও দেহগত অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। মঞ্চে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সোজাসুজি দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় স্বভাবতই দর্শক তার দিকে প্রথম তাকায়। কারো দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকানো মানেই তাকে আকর্ষণ করা। এটা শুধু মঞ্চে নয়, পথে ঘাটে চলতে-চলতেও বহুলোকের মধ্যে কেউ যদি কোনো একজনের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকে তো দেখা যায় অনেক লোকের মধ্যে সেই লোকটি চোখে পড়ছে। তাই তো আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা এই সাধারণ সত্যটাকে মঞ্চে কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। *বিদেহ* নাটকের উপরোক্ত চিত্রে সামনে তাকানো ও উচ্চতায় দাঁড়ানোর জন্য শান্তিকুমারী চরিত্রাভিনেত্রীর ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– ‘Levels present a much used method. The attention of the observer is attracted by what is higher than the regular line of vision।’[২২]

২২. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A,New York, 1965, Page 112।

চিত্র : অভিনেত্রীদ্বয়ের সমান্তরাল বিন্যাস

উপর্যুক্ত চিত্রে দুই অভিনেত্রীর সমান্তরাল বিন্যাসের কারণে ভারসাম্য তৈরি হয়েছে এবং উভয়কে দৃঢ় মনে হয়েছে। চিত্রশিল্প সম্পর্কে ধারণা না থাকলে 'দৃঢ়তা'র ব্যাপারটা উপলব্ধি করা বেশ দুরূহ। তাই দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করার আগে ছবির কথা বলা প্রয়োজন। ছবি আঁকার জায়গা হলো একখানা চারকোণা কাগজ বা ক্যানভাস। যাই আঁকা হোক না কেনো ঐ চারকোণা কাগজের ওপরই আঁকতে হবে। কিন্তু ঐ চারকোণা কাগজের যে কোনো জায়গায় সুন্দরভাবে এঁকে দিলেই তা ছবি হয়ে ওঠে না। ঐ চারকোণা কাগজের চারপাশে একটা ফ্রেম কল্পনা করে নিয়ে এমন জায়গায় এমনভাবে ছবির সাবজেক্ট বা বিষয়টি আঁকতে হবে যাতে ফ্রেমটা ভরাট মনে হয় অর্থাৎ ছবি আর ফ্রেমটা যেনো আলাদা-আলাদা বা বিচ্ছিন্ন বলে কিছুতেই মনে না হয়। ফ্রেমটা অযথা কিছু নয়, ফ্রেমের মধ্যে সাবজেক্ট দৃঢ়বদ্ধ হয়ে অবস্থান করবে। সুতরাং উপরোক্ত আলোকচিত্রে দুই অভিনেত্রী দৃঢ়বদ্ধভাবে মঞ্চের ফ্রেম ভরাট করে সমান্তরাল বিন্যাস সৃষ্টি করেছে।

নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্রের অন্যতম দৃশ্যায়ন (পিক্চারাইজেশন)। *বিদেহ* নাটকে দৃশ্যায়নের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মঞ্চে চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্টকরণ। সংলাপ নয়, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফূট করা। সেহেতু বলা হয়– 'Picturization is the visual interpretation of each moment in the play।'[২৩] এক কথায় দৃশ্যায়ন বা পিক্চারাইজেশন হচ্ছে নাটকের প্রতিটি মুহূর্তের দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। অর্থাৎ নাটকের চরিত্রগুলিকে মঞ্চে এমন ভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে চরিত্রগুলির পরস্পরের প্রতি যে আবেগময় সম্পর্ক ও মনোভিঙ্গ এবং দৃশ্যের যে নাটকীয় পরিস্থিতি রয়েছে তা যেন কোনো সংলাপ বা ক্রিয়া ছাড়াই দর্শকের বোধগম্য হয়। দৃশ্যায়নের কাজ হলো এইভাবে অবস্থান, শরীর ভঙ্গি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে নাট্য কাহিনি প্রকাশে সহায়তা করা। দৃশ্যায়নের মধ্যে গল্পবলার দিকটাও রয়েছে। দৃশ্যায়নের সময় মনে রাখতে হয় যে দর্শক ভাষা বোঝে না বা কানে শোনে না সেও যেন শুধু চোখে দেখেই নাটকের দৃশ্যের অর্থ বুঝতে পারে, আবেগ অনুভব করতে পারে। যা নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা সম্ভব :

চিত্র : হালিমা ও শান্তিকুমারী

২৩. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 173।

উপর্যুক্ত দৃশ্যে চরিত্রদ্বয়ের বসার ভঙ্গিতে তাদের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য স্পষ্ট হয়েছে। চরিত্রের চিন্তা, আবেগ প্রকাশের জন্য দৃশ্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। সুতারং সংল্লাপ নয়, শারীরিক অবস্থান ও ভাব দ্বারা দৃশ্যকে পরিস্ফূট করা সম্ভব।

নির্দেশনা কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছন্দ (রিদম) । নির্দেশকের অন্যতম দায়িত্ব নাটকের অন্তর্গত ছন্দ আবিষ্কার করা। গতিশীল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন ছন্দ বিদ্যমান নাটকের কাহিনি, সংলাপ, প্রতিটি-দৃশ্যাংশ, এমন কী চরিত্রের প্রত্যেক মুহূর্তের গতিবিধিরও ছন্দ আছে। নির্দেশককে এই সমস্ত খণ্ডিত ছন্দসমূহকে একটি সূত্রে গ্রথিত করতে হয়। প্রতিটি দৃশ্যের স্থায়িত্বকাল এবং সংলাপের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ছন্দ। নাট্যাচার্য স্তানিসস্লাভস্কি সঠিক চরিত্রায়ন এবং নাট্যক্রিয়ার সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'Tempo Rhythm'[২৪]–এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নাট্য সমালোকের মতে– 'শারীরিক ক্রিয়ার সময় সততা ও দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে লয়-ছন্দ। নির্দেশকের কাছে গোটা অভিনয়ের সার্বিক ছন্দকে খুজে বের করার গুরুত্ব রয়েছে।'[২৫] ছন্দের গুরুত্ব নাটকের একটি অভিজ্ঞতা এবং তা আসে বিশেষ ঝোঁকের পুনরাবর্তনে এবং এই ব্যাপারটি দৃশ্য এবং শ্রাব্য ক্ষেত্রে একক বা সম্মিলিতভাবে ঘটতে পারে। সংলাপ, গতিবিধি, মঞ্চ-পরিকল্পনা, আবহ সবকিছুতেই তাই ছন্দ থাকে– 'নির্দেশকের দায়িত্ব প্রয়োজনভেধে তাকে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার করা।'[২৬] *বিদেহ* নাটকের গল্পে হালিমা ও শান্তিকুমারীর কথোপকথন দ্বারা দুই বীরাঙ্গনা নারীর এক মনোজাগতিক সংকট তৈরি হয়। দুই নারীর কথোপকথনে তৈরি নাট্যিক ঘটনার আবহে বৈচিত্র্য আসে তরুণী আগন্তুকের উপস্থিতিতে। নাট্যের বুননেই মূলছন্দ রক্ষিত হয়েছে। নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করা যাক :

[২৪]. চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা* (কলকাতা : প্রতিভাস পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ১২০।

[২৫]. '…… It is as important to him to find it as it is for a director to find the right rhythm for a whole performance' Sonia Moore, *The Stanislavski System,* Published by Pocket Books, New York, April 1967, Page 66।

[২৬]. ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮১), পৃ. ১২৮।

চিত্র : *বিদেহ* নাটক

স্থান-কাল ও আবহের ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োগ ছিল যথাযথ। আলেকজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– ‘The locale in which the play is laid becomes an important consideration in determining the rhythm।’[২৭]

চিত্র : *বিদেহ* নাটক

[২৭] Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 241।

নাট্য নির্দেশনায় চলন (মুভমেন্ট) একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। দৃশ্যায়ন আলোচনায় যে সংলাপ ও ক্রিয়াহীন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে– সেই দৃশ্যে চলন যুক্ত হয়ে যে গতিশীল দৃশ্য তৈরি হয় তাই মঞ্চ দৃশ্য। বিন্যাসের ভেতর দিয়ে দৃশ্যায়নের দিকে যেতে হয়। দৃশ্যায়ন ধারাবাহিকভাবে কতগুলো ছবি। ছবিগুলো হয় স্থির। ছবিগুলো তৈরি হয় চলনের মাধ্যমে। প্রতিটি চলনের পরিবর্তনের মাধ্যমে ছবিগুলো বদলে যায়। চলনের কারণে অর্থও পাল্টায়। একটি ছবি থেকে আরেকটি ছবিতে যেতে সাহায্য করে চলন। দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতেও চলনের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি চলনই এক একটি ছবি তৈরি করে। আর প্রতিটি ছবি এক একটি অর্থ প্রকাশ করে। ক্রিয়াশীল মঞ্চে ছবি তৈরি হয় চলনের মাধ্যমে। চলন ও বিন্যাসের মূল পার্থক্য হচ্ছে– চলন প্রকাশ করে মঞ্চে ক্রিয়ারত কোনো চরিত্র বা চরিত্রসমূহের বিশেষ ভাবকে। সমালোচকদের মতে কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীর মঞ্চক্ষেত্রে হাঁটা-চলাই চলনের অন্তর্ভুক্ত নয়। শরীরের সমস্ত রকম ভঙ্গিই চলনের অন্তর্ভুক্ত। চলনের কৌশলগত এবং ভাবগত মূল্য থাকে। আবার এর দৃশ্যগত মূল্যও লক্ষণীয়। তাই নির্দেশক সাধারণত– 'চরিত্রের মূল্য নির্ধারণে, বৈচিত্র্য আনায়নে, ভাব প্রকাশে ও চরিত্রকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য চলনের ব্যবহার করতে পারেন।'[২৮] *বিদেহ* নাটকেও যথারীতি চলনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নিম্নের আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করা যাক :

চিত্র : আগন্তুকের চলন

২৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 189।

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে আগন্তুক চরিত্রের চলন ডান দিক থেকে বাম দিকে রত। ফলে চরিত্রটি গুরুত্ব পেয়েছে। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন :

> When, on the other hand, the figure goes from left to right stage there is a certain clash with the follow-through of our eyes which, as we have seen, naturally travels from right stage to left. This clash, or, resistance in vision makes us feel that the figure is stronger than when it travels along and in harmony with our vision।[২৯]

নির্দেশনা কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন)। প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন বা নির্বাক অভিনয় বলতে কী বোঝায়? সোজা কথায় প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন হচ্ছে সংলাপহীন নাট্যক্রিয়া বা 'action without dialog।'[৩০] 'নাট্যক্রিয়া বা অ্যাকশন হলো মুখের ভাব-ভঙ্গি, দেহের ভঙ্গি, হাত নাড়া এবং চলন। এগুলির উৎস হচ্ছে বাস্তব জীবন। নাটকে এগুলির প্রয়োগ করা হয় চরিত্র, দৃশ্য-পরিস্থিতি, পরিবেশ ইত্যাদিকে প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। মুখে সংলাপ না বলে–এই উপাদানগুলির সাহায্যে বক্তব্য পরিস্ফুট করার নামই প্যান্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন বা নির্বাক অভিনয়।'[৩১] কিন্তু নির্বাক অভিনয়টা নাটকে দরকার হয় কেন? এটা নাটকে দরকার হয় দর্শক মনের চাহিদা মেটাবার জন্য। নাটক দেখতে বসলে দেখা যায় দর্শক যতোটা শুনতে চায় তার থেকে বেশি সে দেখতে চায়। সংলাপটা শোনার বিষয় আর নির্বাক অভিনয় দেখার বিষয়। কাজেই কথার ফাঁকে এই দেখাবার উপাদানগুলিকে হিসেবমতো ব্যবহার করলে নাটকে অনেক বেশি প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব। দক্ষ নির্বাক অভিনয় দ্বারা সংলাপ ছাড়াই গল্প, চরিত্র, পরিবেশ, স্থান কে প্রকাশ করা সম্ভব। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– 'It gives a conviction of reality, showing people living in a definite place, reacting with the responses of life।'[৩২] অপরপৃষ্ঠার আলোকচিত্রটি লক্ষ্য করা যাক :

---

২৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 194।

৩০. Ibid, Page 257।

৩১. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সম্পাদিত, *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৫।

৩২. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 262।

চিত্র : *বিদেহ* নাটক

উপর্যুক্ত চিত্রে হালিমা ও শান্তিকুমারীকে দেখা যাচ্ছে। হালিমা রান্না করছিলেন। শান্তিকুমারী এসে গান শুরু করলে হালিমাও যোগদান করেন। শান্তিকুমারী আসার পূর্বে কোনো কথা বললেও হালিমা চুলার উপর হাঁড়ি, লাকড়ি গুঁজে দেয়া ইত্যাদি ক্রিয়া করছিলেন। সংলাপহীন এধরনের ক্রিয়া দ্বারা– লাকড়ি দিয়ে রান্না করা, বিশেষ একটি স্থান, জীবনযাপনের প্রকৃতি যেমন বোঝানো সম্ভব হয়েছে তেমনি মানবিক বোধের তীব্র উৎসারণের মাঝেও বেঁচে থাকার জন্য খাবার তৈরির বাস্তবতাও উপস্থাপিত হয়েছে। অপরপৃষ্ঠার আলোকচিত্রটি লক্ষ করা যাক :

চিত্র : *বিদেহ* নাটকে আগন্তুক

উপর্যুক্ত চিত্রে আগন্তুকের সংলাপহীন তথাপি নির্লিপ্ততা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে এই স্থানটি তার জন্য নতুন। সুতরাং *বিদেহ* নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট নাটকে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রদত্ত নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি সূত্রের প্রয়োগ হয়েছে। যদিও ডিন ও কারার সূত্র ধরেই নির্দেশনায় এটি প্রয়োগ হয়নি বরং নির্দেশকের অভিজ্ঞতা ও কৌশলে সহজাতভাবে বিষয়গুলো এসেছে। যার দ্বারা নির্দেশকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এর ব্যত্যয়ও চোখে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চলন সহজাত না হয়ে বরং ছকে বাঁধা মনে হয়েছে। আলেক্সন্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার সূত্র যেনে প্রয়োগ করলেই নাটকের চরিত্র, গল্প, পরিস্থিতি, স্থান, পরিবেশ, আবহ ইত্যাদি আরও শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হওয়ার সুযোগ ছিল।

নির্দেশক : ইসরাফিল শাহীন

নাটক : *সিদ্ধান্ত*
নাট্যকার : বর্টল্ট ব্রেখট
অনুবাদ : শাহমান মৈশান
প্রযোজনা : থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসরাফিল শাহীন নির্দেশিত *সিদ্ধান্ত* নাটকে নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্র সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নাটকটির গল্পসংক্ষেপ জেনে নেওয়া যেতে পারে– '*দ্য মেজারস টেকেন* বা *সিদ্ধান্ত* প্রকৃত পক্ষে কয়েকজন বিপ্লবীর এমন এক সঙ্কটাপন্ন পরিণতিকে নির্দেশ করে, যা এক তরুণ কমরেডের মৌহূর্তিক আবেগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্র্যাটেজিক বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হয়ে ওঠে অতি সাংঘর্ষিক। আর পার্টি থেকে বিচ্যুতি কিন্তু জনতার প্রতি মহাজাগতিক মমত্ববোধ সত্ত্বেও এই তরুণ কমরেডকে অন্যান্য কমরেডের সহযোগিতায় স্বেচ্ছামৃত্যুর পরিণতি গুনতে হয়। এই মৃত্যু হত্যা নয়, আবার আত্মহত্যাও নয়, তবে কী? এই প্রশ্নের সাথে মোকাবেলা এই নাটকের নির্যাস।'[৩৩] নির্দেশক ইসরাফিল শাহীন *সিদ্ধান্ত* নাটক প্রসঙ্গে বলেন :

> বার্টল্ট ব্রেখট নাট্যভাষা ও মার্কসিস্ট রাজনৈতিক যৌগিকতার পশ্চিমা দ্রষ্টা। ব্রেখট পাঠ্য বলেই কি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হবে। অভিনয় এমন এক সৃজনযজ্ঞ যা অতীতের হাড়-হাড্ডিকে বর্তমানের রক্তপ্রবাহে সঞ্জীবিত করে তোলে। ব্রেখটের টেক্সট আমাদের সাথে যে যোগাযোগ গড়ে তোলে তা বস্তুগত কর্পোরেট সভ্যতার দ্বন্দ্বের সূত্রকেই শুধু উপজীব্য করে না বরং বাস্তবের এক সাম্যবাদী বিশ্লেষণকে স্নায়ুর ভেতর ছড়িয়ে দেয়, যা দর্শকের দুনিয়া পর্যন্ত দীপ্যমান। ফলে ব্রেখট স্বয়ং রাজনীতির এক রূপক এবং রাজনৈতিক চৈতন্য গঠনের জারকরসে আমাদের সিক্ত করে। পাললিক করে। বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে মতাদর্শিক রাজনীতির মারফতে সূচিত নাট্য ও রাজনীতির যৌথভূমিটি কী-তা আমাদের অনুসন্ধিৎসার গন্তব্য। মহড়ার কর্ষণক্ষেত্রটি প্রথমত আমাদের কাছে ক্ষুদ্রবর্গের রাজনৈতিক ডেমোগ্রাফি হিসেবে চিহ্নিত হয়। অভিনয়শিল্পী ও নির্দেশক/পরিচালিত–এই হায়ারার্কিক্যাল রাজনৈতিক সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করার, নেগেট করার হিম্মত যখন অর্জন করতে ব্রতী তখনি আমরা ক্রমে-ক্রমে 'পরিচালক/নির্দেশক' নামক এক কমান্ডো-অস্তিত্ব ছাপিয়ে নন-ডিরেকশনাল একটি সৃজন প্রসেসকে খুঁজতে শুরু করি। শিল্পী ও মানুষের ভেদ রেখার যে এলিটিস্ট রাজনীতি আছে এর বিপরীতে, জনতার ডিসকোর্সে নাট্যভাষার যে চিহ্নায়ন–একে আমরা অবশেষে করি তালাশ। ব্রেখটীয় রাজনৈতিক নাট্যভাষার তালাশের লক্ষ্যে হেজিমনিহীন এক তরিকা হিসেবে প্রতীয়মান হয়

[৩৩] থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, প্রযোজনা : *সিদ্ধান্ত*, রচনা : বার্টল্ট ব্রেখট, নির্দেশনা : ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ১ ও ২ জুলাই ২০১১।

> যা, তা হলে নিরাভরণ যোগাযোগের লক্ষ্যে নিবিড় সংলাপ রচনার এক নির্বিকল্প স্থানিক, পরিসর, মৃত্যুতুল্য অনিবার্যতায় অডিটোরিয়ামকে যা নাকচ করে দেয়, এমন স্থান, যা হতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন চত্বর, অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ, শ্রমিক অধ্যুষিত সাভার ইপিজেড, ঢাকার সদরঘাট, চট্টগ্রাম বন্দর প্রভৃতি। এর ফলে নাট্যের মধ্যদিয়ে যোগাযোগের রাজনৈতিক কনসেপশনে আত্মীকৃত হয় স্থান ও জনতার এই যৌগিক চিন্তামৌল। আবার জনগণমুখী নাট্যিক যোগাযোগে সংগীতের অবারিত ও উদ্দাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক কিন্তু উপেক্ষণীয় ক্ষেত্র হলো তথাকথিত রাজনৈতিক সংগীতের চিৎকারধর্মী উল্লম্ফন।[৩৪]

অতত্রব, ইসরাফিল শাহীন নির্দেশিত *সিদ্ধান্ত* প্রযোজনায় নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র– বিন্যাস (কম্পোজিশন), দৃশ্যায়ন (পিক্‌চারাইজেশন), চলন (মুভমেন্ট), ছন্দ (রিদম) ও নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে তা নাটকের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা দেখা যেতে পারে। *সিদ্ধান্ত* নাটকের অভিনয় ক্রিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের মঞ্চের বাহির থেকে কোনো প্রবেশ প্রস্থান নেই। নাটকের শুরু থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চেই অবস্থান করেন। প্রতিটি দৃশ্য অভিনয়ের পূর্বে দর্শককে দৃশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করে অতঃপর সেই দৃশ্য অভিনীত হয়। নাটকের শুরুতে সংগীতের পর অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের বিন্যাসে (কম্পোজিশন) সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স লক্ষ্য করা যায়। যা স্পষ্টতই আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত বিন্যাসের (কম্পোজিশন) সূত্র মনে করিয়ে দেয়। ভারসাম্য সম্পর্কে নাট্যবেত্তা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার অভিমত :

> When one part of the stage composition is equalized in weight with the other, the composition is said to have balanc.This is an important factor in giving a pleasurable and satisfying effect — the constant purpose of composition।[৩৫]

---

৩৪. থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, প্রযোজনা : *সিদ্ধান্ত*, রচনা : বার্টল্ট ব্রেখট, নির্দেশনা : ইসরাফিল শাহীন। প্রদর্শনী : ১ ও ২ জুলাই ২০১১।

৩৫. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York, 1965, Page 157।

চিত্র : কম্পোজিশনে সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স

প্রথম দৃশ্যেই বিন্যাসে গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে ‘লেভেল’ বা উচ্চতার প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন নিচের ছবিটি লক্ষ্য করা যাক :

চিত্র : অভিনেতার উচ্চতার ব্যবহার

আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা Fundamentals of Play Directing গ্রন্থে বলেন– 'A scene in which a person is allowed by the content to stand on a chair is one where level is used for emphasis।'[৩৬]

সিদ্ধান্ত প্রযোজনায় বিপ্লবীগণ নানা সমস্যার কথা বর্ণনা করেন। তথাপি এই সমস্যা সত্ত্বেও তারা বাহুবলে চির উদ্যমে জেগে থাকার কথা ব্যক্ত করেন। যেমন নিচের ছবিটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায় :

চিত্র : অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক প্রকাশভঙ্গি

উপরের চিত্রে দৈহিক প্রকাশভঙ্গি দ্বারা চরিত্রগণের দৈহিক প্রকাশ দ্বারা যে দৃশ্য তৈরি হয়েছে তা নাট্য পরিস্থিতি ও গল্পকে প্রকাশ করে। দৃশ্যায়নের দ্বারা তাদের উদ্যম, একতা, দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন– 'In life the relationship of one person to another and the body expression of the person himself have a definite storytelling value।'[৩৭]

---

৩৬. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 112।

৩৭. Ibid, Page 174।

চিত্র : চরিত্রায়ণে ছন্দের প্রয়োগ

কমান্ডার চরিত্রায়ণে বয়স অনুযায়ী ছন্দের (রিদম) প্রয়োগ করা হয়েছে। একজন বয়স্ক মানুষের শ্লথ গতি দেখানো হয়েছে। যদিও চরিত্রায়নে পদযুগলের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ যতখানি সার্থক ছিল হাতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ততখানি নয়। কেবল অভিনয়ে নয় নাট্য কৌশলেও ছন্দের প্রয়োগ ছিল লক্ষণীয়। প্রতিটি দৃশ্যের সূচনায় গীত, শারীরিক ভঙ্গি ও স্বরের বিভিন্ন স্তর থেকে বচন দ্বারা পূর্বের দৃশ্যের মোহ ভেঙে দেয়া হয়। ফলে সম্পূর্ণ নাটক এক অখণ্ড ছন্দের বুননে আবদ্ধ হয়। নাটকে সংগীতের ব্যবহার ছিল। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে সর্দার চালে বস্তা নিয়ে কুলিরা গান গায়– গুন টেনে আমরা কাঁধে বই গ্লানি। নিম্নের আলোকচিত্রে গান গাওয়ার মূহুর্ত তুলে ধরা হলো :

চিত্র : সর্দার দাঁড়িয়ে এবং কুলিরা চালের বস্তা টানছে

এক্ষেত্রে গানের সুরে যে ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে তা অভিনেতা-অভিনেত্রীর শারীরিক ভঙ্গিতেও যুক্ত হয়েছে। কুলীদের শারীরিক কষ্ট এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। অন্যদিকে কিছু সময় পর যখন একজন কুলী প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয় তখন সর্দার কুলীদের প্ররোচিত করেন যে, চালের বস্তা শহরে পৌঁছে দিলেই তাদের জুতো কিনে দেয়া হবে। সর্দারের কথায় কুলীরা কষ্ট ভুলে আনন্দের গান গায়, যদিও স্পষ্টতই তা ব্যঙ্গাত্মকভাবে তাদের নিয়তিকেই প্রকাশ করে।

চিত্র : সর্দার ও কুলিগণ

কুলীরা গান গায়– আমাদের পূর্বপুরুষ এই নদীতে নাও টেনেছে, আমাদের সন্তানেরাও এই নদীতে নাও টানবে। কুলীদের বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তা ও মস্তিষ্ক মন্থনের অক্রিয়তার চেয়ে বরং শারীরিক শ্রমের দ্বারা জীবন নির্বাহ প্রক্রিয়া গানের সুর, কথা, শারীরিক ভঙ্গির ছন্দ দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্য কিংবা দৃশ্যের ভেতরেই ছন্দের এরকম বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ দেখা দেয়। আবার এই চিত্রেই কুলীদের দুর্বল ও ক্লান্তিকর হেঁটে যাওয়া দ্বারা তাদের দুর্বল চলন (মুভমেন্ট) বোঝানো হয়েছে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে কমান্ডারগণের– আমাদের বারতা সারা বিশ্ব জুড়ে, গানের ক্ষেত্রে দুই অভিনেত্রী মঞ্চের উঁচু স্তরে উঠে গানটি শুরু করেন। ফলে চলনটি শক্তিশালী হয়। যেমন নিচের ছবিটি লক্ষ করলেই তা বোঝা যায় :

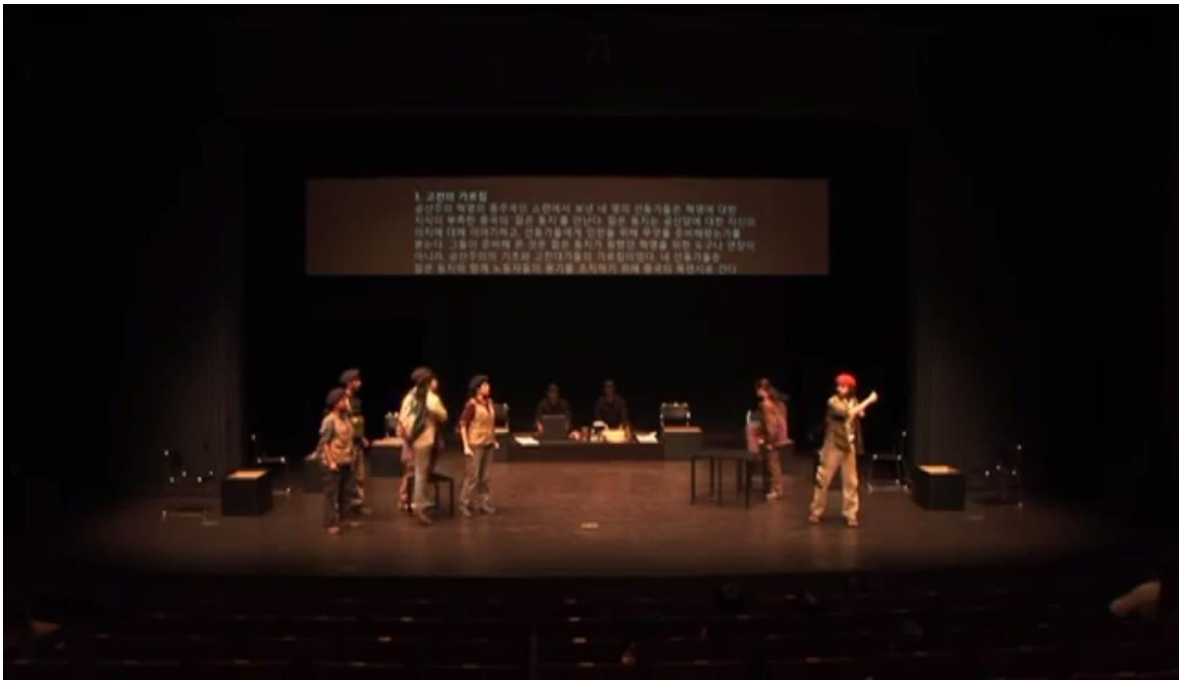

চিত্র : গান শুরুর পূর্বমুহূর্তে দুই অভিনেত্রী

চিত্র : উঁচু স্তরে দুই অভিনেত্রী গান শুরু করছেন

সুতরাং বিপ্লবাত্মক আহ্বান জানিয়ে যে গান সেখানে শক্তিশালী চলন রূপে উঁচু স্তরের ব্যবহার নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ছিল। সেন্টার লেফট এ অবস্থানরত অভিনেত্রী হাত তুলে ধরায় চলনটি অধিকন্তু শক্তিশালী হয়েছে। আবার গানের পরের অংশে– শোষিতের জন্য যারা নিবেদিত প্রাণ, তাদেরই জন্য বাঁধি একতার গান। এক্ষেত্রে মঞ্চের আপস্টেজ থেকে ডাউন স্টেজে অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলন দেখা যায়। আপ স্টেজ থেকে ডাউন স্টেজ এবং সম্মুখে হেঁটে আসা উভয় কারণে এটি চলনের একটি শক্তিশালী প্রয়োগে পরিণত হয়েছে।

চিত্র : কমান্ডারগণ ডাউন স্টেজে হেঁটে এসে শক্তিশালী অবস্থান নিচ্ছেন

আলেকজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা বলেন :

> A strong movement is stepping forward, straightening up, placing the weight on the forward foot, rising from a chair (lower to higher level), raising arm, or walking forward. A weak movement is stepping backward, slouching, placing the weight on the rear foot, sitting down, lowering the arm, walking backward, or turning around and walking away from a figure or object।[৩৮]

৩৮. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 190।

সিদ্ধান্ত নাটকে চলনের বিভিন্ন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শক্তিশালী চলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কৌণিক চলনের প্রয়োগ দেখা দেয়। যেমন লিফলেট বিলির অপরাধে একজন কমরেড প্রহৃত হলে আরেকজন কমরেড তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসা কমরেড সমান্তরাল না এসে কৌণিক চলন দ্বারা এগিয়ে আসেন। যেমন নিচের ছবিটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায় :

চিত্র : কমরেডের কৌণিক চলন

তাছাড়া মঞ্চের বাম দিক থেকে ডান দিকে যাওয়ায় চলনটিকে আরও শক্তিশালী মনে হচ্ছে। ডিন এবং কারা বলেন :

> Repeated experimentation has shown that a figure or group passing from left stage to right stage gives the effect of stronger movement, as well as a greater amount and force of movement of the figure, than movement from right stage to left।[৩৯]

---

৩৯. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 194।

নাট্য-নির্দেশনার অন্যতম মৌলিক সূত্র নির্বাক অভিনয় (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) । সংলাপহীন ক্রিয়াই হলো নির্বাক অভিনয়। *সিদ্ধান্ত* নাটকে সংলাপ ব্যতিরেকেও নির্বাক অভিনয়ের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নিচের আলোকচিত্রটি দেখলেই এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে :

চিত্র : নাটকের প্রথম দৃশ্যে মৃতদেহের সামনে টুপি খুলে শ্রদ্ধা প্রকাশ

উপর্যুক্ত আলোকচিত্রটিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দেহভঙ্গি ও টুপি খোলার 'ক্রিয়া' দ্বারা নাট্য ঘটনা এবং পরিস্থিতি স্পষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়েই কমান্ডারগণ তাদেরই একজনকে হত্যা করে, তথাপি তার প্রতি সবার শ্রদ্ধা কোনো প্রকার সংলাপ ছাড়াই প্রদর্শিত হচ্ছে। নাটকে নির্বাক অভিনয় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দর্শক সংলাপ শোনার বাইরেও ক্রিয়া দেখতে উদগ্রীব থাকে। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার মতে :

> The importance of pantomimic dramatization to the performance of a play is evidenced by the psychological fact that most people are visually minded and therefore are more deeply impressed by what they see than by what they hear।[৪০]

---

৪০. Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing*, Printed in the U.S.A, New York,1965, Page 257।

সুতরাং উপর্যুক্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় *সিদ্ধান্ত* নাটকে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্র– বিন্যাস, দৃশ্যায়ন, চলন, ছন্দ ও নির্বাক অভিনয় নিঃসন্দেহে সার্থকভাবে প্রয়োগ হয়েছে। তবে নাটক জুড়েই ডিন এবং কারা বর্ণিত নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র ধরেই নাট্য কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে বিষয়টি এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রয়োগে, কখনো সহজাতভাবে, কখনো পাঁচটি মৌলিক সূত্রের বাইরেও বিভিন্ন কৌশলের ব্যবহার দেখা যায়। নাটকে প্রবেশ প্রস্থান নেই। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ মঞ্চে থেকে দর্শকের সামনেই পোশাক পরিবর্তন, চরিত্রায়নের ভঙ্গি ইত্যাদি প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপন করে। ব্রেখটের এলিয়েনেশন অনুযায়ী প্রতি দৃশ্যের পরই দর্শককে বিযুক্ত করা হয়। বিপ্লবাত্মক গানের পাশাপাশি সুপরিচিত কিছু সুর নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– আমার ঘুম ভাঙাইয়া গেলরে কিংবা আমি বন্দি কারাগারে ইত্যাদি। নাটকের ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনলেও এই সুরগুলোর প্রয়োগ যথাযথ মনে হয় নি। বাস্তববাদী ঢঙ্গে নাটকটির কাঠামো তৈরি হয় নি ব্রেখটের এলিয়েনেশন অনুসারে হয়েছে তথাপি চরিত্রায়ন কিছু ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মনে হয় নি।

সর্বোপরি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) পরিচালকের চারটি (*বাংলার মাটি বাংলার জল, টার্গেট প্লাটুন, বিদেহ ও সিদ্ধান্ত*) প্রযোজনা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রত্যেক নির্দেশকই বাঙালির ঐতিহ্যবাহি যাত্রা, পাঁচালি, পালাগান এবং লোক কবিদের বিভিন্ন ‘কৌশল’ অনুসরনের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের নির্দেশনা কৌশল তথা, ‘পঞ্চ-সূত্র’ ব্যবহার করে তাঁদের নির্দেশনা পরিচালিত করেন। মূলত একটি মিশ্র রীতিতে নাট্য-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। বক্ষ্যমান অধ্যায়ে নির্দেশনা কৌশলের ‘পঞ্চ-সূত্র’ ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের যে ছাপ, তা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে ইহা উক্ত গবেষণার চারজন নির্দেশকের চারটি প্রযোজনা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উদঘাটিত হয়েছে বলে আশা পোষণ করা সম্ভব। যেমন, আতাউর রহমান-এর *বাংলার মাটি বাংলার জল* প্রযোজনায় আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারা প্রণীত পঞ্চ-সূত্র হুবহু গ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন– ‘একরৈখিক কোনো বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আমি নাট্য-নির্দেশনায় পক্ষপাতি নই। পৃথিবীর শাশ্বত যা কিছু সুন্দর, তা সকল মানুষের, সকল সভ্যতার আর এই সুন্দরকে পৃথিবীর সকল রূপ, রস, রঙের মাধ্যমে যে কেউ প্রকাশ করতে পারেন তার মেধা বিদ্যা-বুদ্ধি আর মনন শৈলির মধ্যদিয়ে।’[৪১] ঠিক সেরকমভাবেই তিনি আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার সূত্র থেকে যা তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় প্রয়োজন তা গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ করে হুবহু প্রয়োগ করেন নি। তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও চর্চার ফল স্বরূপ নিজের মতো করে প্রকাশ

[৪১]. সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারনকৃত নির্দেশক আতাউর রহমানের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ২৭-০৭-২০১৫।

করেছেন। অন্যদিকে মামুনুর রশীদ *টর্গেট প্লাটুন* প্রযোজনায় নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের পাঁচটি সূত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘদিনে কজের অভিজ্ঞতায় সহজাতভাবেই কৌশলগুলোর সংযোগ ঘটেছে *টর্গেট প্লাটুন* প্রযোজনায়। তবে সকল ক্ষেত্রেই তা সার্থকভাবে হয়েছে এমনটি বলা যাবে না। যেমন, চলনের ক্ষেত্রে পেছনে হাঁটা আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার সূত্র মতে দুর্বল চলন হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু *টর্গেট প্লাটুন* প্রযোজনায় বাবুর্চির চলনের ক্ষেত্রে এই কৌশল পরিস্থিতির সাথে বেমানান মনে হয়েছে। মামুনুর রশীদ মূলত পাশ্চাত্যের 'তত্ত্ব-সূত্র' মাথায় রেখে দেশিয় ঐতিহ্যের নাট্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে নির্দেশনা-শৈলি সৃষ্টিতে ব্রত থাকেন। আতাউর রহমানের মতো মামুনুর রশীদও মিশ্র রীতিতে নির্দেশনা শৈলি পরিচালিত করেন। *বিদেহ* নাটকে লাকী ইনাম আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার প্রদত্ত নাট্য-নির্দেশনার পাঁচটি সূত্রের প্রয়োগ করেছেন। তবে চলন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোথাও-কোথাও অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে। তা সত্যেও নির্দেশক পঞ্চ-সূত্র ব্যবহার করে সার্থকভাবে নির্দেশনাকর্মটি সমাধান করেছেন। লাকী ইনামও তাঁর নাট্য-নির্দেশনায় 'তত্ত্ব-সূত্র' বা কোনো নির্দিষ্ট মেথড পুরোপুরি অনুসরণ করেন না। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, নির্দেশনার বহু ক্ষেত্রে ব্রেখটের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। লাকী ইনাম নারী হিসেবে কোনোরকম সীমাবদ্ধতায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান না। 'কূয়ার ব্যাঙ হয়ে থাকতে চান না।'[৪২] তিনি অবগুণ্ঠন ভেদ করে নিজের নাট্যালোয়ে হয়েছেন উদ্ভাসিত। অন্যদিকে ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পাশ্চাত্য তত্ত্ব-সূত্রের গোলকধাঁধায় না ফেলে নাট্য-নির্দেশনার এক নতুন পদ্ধতি অন্বেষণে ব্রতী। তা সত্বেও তাঁর কাজের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার তত্ত্ব-সূত্র ইসরাফিল শাহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর চাপাতে চান না। তিনি মনে করেন অভিনেতা-অভিনেত্রীর দক্ষতা অনুসারে এইগুলো নির্ণয় করবে। তাই ইসরাফিল শাহীন মহড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীগনকে 'পঞ্চ-সূত্র' সম্পর্কে ধারণা প্রধান করেন। যাতে তারা মহড়ায় অনুশীলনের সময় চাপহীন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সূত্রগুলো প্রকাশ করতে পারে। *সিদ্ধান্ত* প্রযোজনার ক্ষেত্রেও ইসরাফীল শাহীন এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। তিনি আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স কারার প্রণীত নির্দেশনার পাঁচটি মৌলিক সূত্র– বিন্যাস, দৃশ্যায়ন, চলন, ছন্দ ও নির্বাক অভিনয় নিঃসন্দেহে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা গেছে। কখনো-কখনো অভিনেতা-অভিনেত্রী সহজাতভাবে এই সূত্রের বাইরের কৌশলও প্রয়োগ করেছেন। এই নাটকে কিছু সুপরিচিত গানের সুর ব্যবহার করেছেন। যেমন– আমার ঘুম ভাঙইয়া গেলরে মরার কোকিলে, কিংবা আমি বন্দি কারাগারে ইত্যাদি, যা নাটকে ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনলেও সুরগুলো প্রয়োগ যথাযথ মনে হয় নি। অতএব উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) পরিচালকই নির্দেশনা-কৌশলে আলেক্সজান্ডার ডিন এবং লরেন্স

[৪২] সূত্র : মাঠ পর্যায়ে তথ্য অনুসন্ধানকালে অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত নির্দেশক লাকী ইনামের দেওয়া বক্তব্য। তারিখ : ১৭-০৪-২০১৬।

কারার প্রণীত পঞ্চ-সূত্রের প্রয়োগ ঘটান। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। কোথাও-কোথাও বাঙালির সংস্কৃতির চর্চার দেশিয় ঐতিহ্যের নাট্য উপকরণকে কাজে লাগাতে দেখা যায়। সুতরাং এই কথা বলতে পারি যে, গবেষণায় চারজন পরিচালকই নাট্য-নির্দেশনায় 'পঞ্চ-সূত্র' প্রয়োগের পাশাপাশি হাজার বছরের বাঙলা নাট্যের ঐতিহ্যের সম্মিলন ঘটিয়ে মিশ্র রীতির নাট্য নির্মাণ ভাবনায় প্রভাবিত।

উপসংহার

বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা কৌশলের রূপরেখা নির্ণয় করা ও পাশ্চাত্য নাট্য-নির্দেশনা অর্থাৎ নির্দেশনায় যে পঞ্চ-সূত্রের বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের ছাপ, তা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে?

অবতরণিকা অংশে উত্থাপিত উদ্দীপনামূলক গবেষণা-প্রশ্নটিকে পুনরায় উল্লেখ করে এই পর্যায়ে একটি উপসংহার রচনা করা যেতে পারে। অতঃপর এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের সূত্র ধরেই 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' শীর্ষক গবেষণা কর্মটির সামগ্রিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দিকে পুনরায় ফিরে তাকানো যেতে পারে। অবতরণিকা অংশে উত্থাপিত উদ্দীপনামূলক এই গবেষণা-প্রশ্নটির উত্তর অন্বেষণের নিমিত্তেই কার্যত গবেষণা কর্মটিকে তিনটি অধ্যায় বিভাজনে সম্পাদন করা হয়। এবং এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে 'পঞ্চ-সূত্র' ও বাংলাদেশের চারজন নাট্য-পরিচালকের 'নির্দেশনা-পদ্ধতি', 'কৌশল' নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা-প্রশ্নের প্রথম পর্যায়ের উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তুলনামূলক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা নিরূপণের মাধ্যমে উত্থাপিত প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম দুটি অধ্যায় যথাক্রমে প্রথম অধ্যায় 'নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র', যেমন– ১. 'বিন্যাস' (কম্পোজিশন), ২. 'দৃশ্যায়ন' (পিক্চারাইজেশন), ৩. 'চলন' (মুভমেন্ট), ৪. 'ছন্দ' (রিদম), এবং ৫. 'নির্বাক অভিনয়' (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) সূত্রগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়। মূলত একজন নাট্য-নির্দেশক উক্ত কৌশল বা সূত্রগুলোর অবলম্বনে কীভাবে নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন করবেন তাই এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়। এবং দ্বিতীয় অধ্যায় 'বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' অন্বেষণই মূল প্রতিপাদ্য। চারজন নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব 'কর্ম-কৌশল', 'পদ্ধতি' ও 'প্রক্রিয়া' সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানই বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম এবং ইসরাফিল শাহীন) পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত নাট্য-নির্দেশকের 'নির্দেশনা-কৌশল' বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তাঁদের নির্দেশনা-শৈলী এবং তার আলোকে নির্দেশকদের নাট্য-নির্দেশনা 'সূত্র' ও 'তত্ত্ব' অনুসন্ধানের বিষয়টি অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে উঠে আসে বাঙলা বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যধর্মী অভিনয়রীতির মিশ্রণ। কোথাও-কোথাও পাশ্চাত্যধর্মী থিয়েটার প্রবণতার বিরুদ্ধে নিরাভরণ একটি শিল্পমাধ্যম আবিষ্কারের প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৈহিক অবয়বকেই

প্রাধান্য দিয়ে নির্দেশকগণ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আবার কোথাও-কোথাও নৃত্য, গীত এবং অভিনয়-এই ত্রয়ী শিল্পের সমন্বেয়ে গড়ে ওঠে এদেশের নাট্য-নির্দেশনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশক চরিত্রাভিনয়ের সমান্তরালে সংগীতকেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন নাটকের কাহিনিবস্তু উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে। আবার সংলাপ নির্ভর চরিত্রাভিনয়ের বিশুদ্ধ একটি রূপ নির্মাণে নাট্য-নির্দেশকদের অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত 'পঞ্চ-সূত্রে'র মধ্যদিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নাট্য-নির্দেশকের শৈল্পিক নাট্যকর্মের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি, এই সকল বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার প্রচলিত ধারা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ গবেষণার চারজন নাট্য-নির্দেশকের নির্দেশনা-পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে পঞ্চ-সূত্রের 'তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা' সম্পন্ন হয়। নির্দেশনা কৌশলের 'পঞ্চ-সূত্র' ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের যে ছাপ, তা বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় কী প্রভাব বিস্তার করছে তা উক্ত গবেষণার চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নির্দেশকের চারটি প্রযোজনা সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার প্রচলিত ধারা, রীতি, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সর্বোপরি নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র', 'বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল' অন্বেষণসূত্রে চারজন নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব 'কর্ম-কৌশল', 'পদ্ধতি' ও 'প্রক্রিয়া' আলোচনাসূত্রেই অবতরণিকাংশে উত্থাপিত গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের 'তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সমন্বিত পর্যালোচনা' মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় 'পঞ্চ-সূত্র' কী প্রভাব বিস্তার করছে তা নির্ণয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণার সার্বিক অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে একদিকে যেমন নাট্য-নির্দেশনার 'পঞ্চ-সূত্র'-এর গুরুত্ব ও সম্ভাবনা তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে, অপরদিকে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনায় 'পঞ্চ-সূত্র' কী প্রভাব বিস্তার করছে তা নির্বাচিত চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নির্দেশকের চারটি প্রযোজনা সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করে এর প্রয়োগ-সম্ভাবনা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্ব-সূত্রের মেলবন্ধন এবং আত্তীকরণের নতুন দিক উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে বলে বিশ্বাস করি। কেননা এই গবেষণাকর্মটি কেবল 'পঞ্চ-সূত্র' উপস্থাপন করার বিপরীতে বাংলাদেশের চারজন নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব 'কর্ম-কৌশল', 'পদ্ধতি' ও 'প্রক্রিয়া'র পথ উন্মুক্ত করেছে।

একজন নাট্য-নির্দেশকের নিজস্ব কর্ম-কৌশল, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই নাট্যকারের পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা থাকে মঞ্চে তা জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাশাপাশি নির্দেশকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অভিযোজন সংযোগে যে দর্শন ও শিল্পবোধ সৃষ্টি হয় তার মধ্যদিয়েই গড়ে ওঠে নতুন-নতুন নাট্যভাষ্য। আর এই নিজস্ব কর্ম-কৌশল, পদ্ধতি ও

প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই সৃষ্টি হয় একটি নির্দেশনা-শৈলীর। যেখানে সময়ের পরিক্রমায় নানাবিধ পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্যদিয়ে নির্দেশনা-শৈলীটি একসময় নাট্য-নির্দেশকের একান্ত 'পদ্ধতি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যদিয়ে নাট্যজগৎ কখনো-কখনো 'তত্ত্ব-সূত্রে'র সন্ধান পায়। সেক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ গবেষণার চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নাট্য-নির্দেশক এককভাবে নির্দেশনার কোনো 'তত্ত্ব-সূত্র' অবিষ্কার করতে সক্ষম না হলেও তাঁদের নির্দেশনার এটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়। যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনাসূত্রে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

একজন নাট্যকর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই একটি অপূর্ণতা এবং অভাববোধ বহন করে চলেছিলাম যে, বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশকগণের নিজস্ব বা সৃজনশীন কোনো নাট্য-নির্দেশনা 'পদ্ধতি' বা 'কৌশল' নেই? না কি পাশ্চাত্য নির্ভরতাই তাঁদের প্রধান সূক্ষ্মতা। এই রূপ এক অপূর্ণতার বোধকে পূর্ণ করার লক্ষ্যেই মূলত এই গবেষণাকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আশাকরি পঞ্চ-সূত্র ও বাংলাদেশের চারজন নাট্য-পরিচালকের নির্দেশনা-পদ্ধতি, কৌশল বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার একটি চিত্র ও অবস্থান প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। যদিও বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশকের সংখ্যার তুলনায় মাত্র চারজন (আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, লাকী ইনাম ও ইসরাফিল শাহীন) নির্দেশকে সার্বিক গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরও ক'জন নাট্য-নির্দেশককে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলে নাট্য-পরিচালকের নির্দেশনা-পদ্ধতি, কৌশল ও প্রক্রিয়া বৈচিত্র্যে, উপযোগিতার মানদণ্ডে আরও অধিক সমৃদ্ধ করা সম্ভব হতো বলে বিশ্বাস করি। বস্তুত মাত্র চারজন নাট্য-নির্দেশক এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করায় অধিকাংশ পরিচালকই এই গবেষণা পরিধির বাইরে থেকে যায়। ফলে সংখ্যা, বৈচিত্র্য এবং উপযোগিতার বিচারে এই অভিসন্দর্ভকে অধিক সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া গবেষণার নির্দেশকগণের সময়ের বাধ্যবাধকতা, নির্দেশকদের নাটক মঞ্চস্থ না হওয়া, কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ না করতে পারা প্রভৃতি ব্যর্থতার কারণে নির্বাচিত চারজন নাট্য-নির্দেশকের বেশ কিছু তথ্য এই গবেষণার অন্তর্গত করা সম্ভব হয়নি। এগুলো যেমন এই গবেষণার একটি বড় সীমাবদ্ধতা, অপরদিকে আবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও ইঙ্গিত বহন করে। কেননা বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রায়োগিক কার্যকারিতা বিবেচনায় এনে ভবিষ্যতে আগ্রহী কোনো গবেষক হয়তো বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করি। তথাপিও বক্ষ্যমাণ গবেষণার চারজন নাট্য-নির্দেশকের নির্দেশনা-শৈলীর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনার ধরণ, রীতি ও কৌশলের রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণার মধ্যদিয়ে লব্ধ ফলাফল, তত্ত্ব ও তথ্যনির্দেশ নাট্য-নির্দেশনার পদ্ধতি ও কৌশল অন্বেষণকারীদের ভবিষ্যত নাট্য-নির্দেশনা ভাবনার পথকে আরও সুদৃঢ় ও সুগম করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

অসিত বসু, *পরিচালক উৎপল দত্ত,* (নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত, উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৫

আহমেদুল কবির, নাট্য-পরিচালনায় চলন, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (সদরুল আমিন সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২

আহমেদুল কবির, নাট্য পরিচালনায় কম্পোজিশন বা বিন্যাস, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (আফরোজা পারভিন সম্পাদিত), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঊনত্রিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ ২০১১

আহমেদুল কবির, নাট্য নির্দেশনায় ছন্দ, *সাহিত্য পত্রিকা* (সিদ্দিকা মাহমুদা সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫০, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২

আহমেদুল কবির, সৃজনশীল নির্দেশক : দায়িত্ব-কর্তব্য, *দর্শন ও প্রগতি* (আজিজুন্নাহার ইসলাম সম্পাদিত), ২৯শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১২

আতাউর রহমান সম্পাদিত, *নাটক করতে হলে,* বিদ্যা প্রকাশনা, ঢাকা ১৯৯২

আতাউর রহমান, নাট্য নির্দেশনা ও আমার ধারণা, *নাগরিক নাট্যাঙ্গন নাট্যপত্র : শুধু নাটক* (ইনামুল হক সম্পাদিত), জুলাই-ডিসেম্বর, ঢাকা ১৯৯৯

আতাউর রহমান, নাট্য ভুবনের জ্যোতিষ্ক লাকী ইনাম, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ,* (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

আতাউর রহমান, নির্দেশকের কথা, *বাংলার মাটি বাংলার জল,* পালাকার প্রযোজনা, রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঞ্চায়ন, ঢাকা ২০১১

ইসরাফিল শাহীন (সম্পা.), *পরিবেশনা শিল্পকলা,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৭

ইসরাফিল শাহীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ, *অভিনয় তত্ত্ব*

ইসরাফিল শাহীন, নির্দেশকের কথা, থ্রি সিস্টার্স, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, এপ্রিল ২০০৫

ইসরাফিল শাহীন, নির্দেশকের কথা, সিদ্ধান্ত, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, জুলাই ২০১১

ইসরাফিল শাহীন, নির্দেশকের কথা, সাঁঝবেলার বিলাপ, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ প্রযোজনা, অক্টোবর ২০১৬

এস, এম, ফারুক হোসাইন, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনা : সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শিল্পভাবনা ১৯৭২-২০০০*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যলয়ের অপ্রকাশিত এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯-২০০০

গোলাম শফিক, লাকী ইনামের যুযুধান অঙ্গুলিগুচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (সম্পাদিত, মাহমুদুল ইসলাম সেলিম), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

চন্দন সেন, *নাটক সৃজন : নাট্যচর্চা*, প্রতিভাস পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৪

নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোর্তিময় তোমারই জয়, *আতাউর রহমান ৭০তম জন্মদিবস উদযাপন পরিষদ*, জুন ২০১১

নওরিন সাজ্জাদ, *অভিনয়ে একক, উপস্থাপনে বৈচিত্র্য : একজন অভিনেতৃর বহুরূপ নাট্যপ্রকাশ*, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অপ্রকাশিত এম. এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫

ফয়েজ জহির ও হাসান শাহরিয়ার, *মামুনুর রশীদ : থিয়েটারের পথে*, বাঙলা পাবলিকেশনস্, ঢাকা ২০১৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ, পুষ্পিত এক নাট্যজীবন, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

বেগম রাজিয়া হোসাইন, শুভ হোক সম্মুখযাত্রা, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

বিপ্লব বালা, *বাংলাদেশের নাগরিক থিয়েটার : অনেকান্ত অবলোকন*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা ২০১৫

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (সম্পা.), *নাট্য পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা ১৯৮৫

মোঃ আরশাদ হোসেন, *বাংলাদেশের নাট্য নির্দেশনা : পদ্ধতি ও প্রয়োগ–১৯৭২-২০০৪*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ ২০১৩

মফিদুল হক, নাট্যসারথীর প্রতি অভিবাদন, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

মনীন্দ্রলাল কুণ্ডু, *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ*, সাহিত্য লোক, কলকাতা ২০০০

মাহমুদুল ইসলাম সেলিম (সম্পা.), গুরু বন্দনা, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

মামুনুর রশীদ, নির্দেশকের কথা, টার্গেট প্লাটুন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রযোজনা ২০১২

রতন সিদ্দিকী, সাহিত্যের নাটকে লাকী ইনাম, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

রশীদ হারুন, নির্দেশকের ব্যবহারিক কৌশল, *থিয়েটার স্টাডিজ* (মু: মঈন উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত), জা.বি., সংখ্যা : ১, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, সাভার ১৯৯২

রশীদ হারুন, *সেলিম আল দীনের নাট্যনির্দেশনা : নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি*, ইছামতি প্রকাশনী, ঢাকা, ফাল্গুন, ১৪১৮

শফি আহমেদ, জয়তু লাকী ইনাম, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

শাহমান মৈশান, থ্রি সিস্টার্স : বাক ও বিদীর্ণতা, *ভোরের কাগজ*, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০০৫

শাহমান মৈশান, দি লেডি ফ্রেম দি সি : পাণ্ডুলিপি থেকে প্রযোজনা, *ভোরের কাগজ*, ঢাকা ১৯ মে ২০০৬

শাহমান মৈশান, বিদেহ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রযোজনা ২০১৩

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র* (৪র্থ খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯৫

সাধন কুমার ভট্টাচার্য, *প্রযোজনা ও পরিচালনা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮১

সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৬

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, লাকী সিক্স, *নাট্যালোকে ৪ দশক : অনুভব গ্রন্থ*, (মাহমুদুল ইসলাম সেলিম সম্পাদিত), নাগরিক নাট্যাঙ্গন, ঢাকা ২০১২

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮

Alexander Dean and Lawrence Cara, *Fundamentals of Play Directing,* Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York 1965

Francis Hodge, *Play Directing- Analysis, Communication and Style,* Prentice-Hall, Inc, New Jersey 1994

Sonia Moore, *The Stanislavski System,* Pocket Books, New York 1967

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অজিত কুমার ঘোষ, *নাটকের কথা*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা ১৯৮৬

অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস*, কলকাতা ১৯৯৮

আতাউর রহমান, *নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৮

আফসার আহমেদ, *মঞ্চের ট্রিলজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, গ্রন্থিক, ঢাকা ১৯৯২

কবীর চৌধুরী, *প্রসঙ্গ নাটক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮১

কবীর চৌধুরী, *সাহিত্য-কোষ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৪

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা ১৯৯৫

জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫

জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯০

জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা ৩য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪

জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা ৪র্থ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৬

জিয়া হায়দার, *নাট্য-বিষয়ক নিবন্ধ*, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮১

জিয়া হায়দার, *নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫

দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা ১৯৯৫

দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্য আন্দোলন*, অনুষ্টপ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৪

পবিত্র সরকার, *নাটকের সন্ধানে*, প্রতিভাস পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৮

পবিত্র সরকার, *নাট্য মঞ্চ নাট্যরূপ*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৮

মোবাশ্বের আলী, *গ্রীক ট্র্যাজেডি*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রঙ্গমঞ্চ*, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, বিশ্বভারতী কলকাতা ১৯৭৬

রামেন্দু মজুমদার, *বিষয় : নাটক*, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৭

লুৎফর রহমান, *নৃ-গোষ্ঠী নাট্য ঃ গারো*, বাংলা একাডেমী ১৯৯৭

শম্ভু মিত্র, *নাটক রক্তকরবী*, শমিত সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯২

শামসুদ্দিন চৌধুরী অনূদিত, *মাইকেল চেখভের অভিনয় পদ্ধতি*, পড়ুয়া, ঢাকা ২০০৩

শেখর সমাদ্দার ও মিলি সমাদ্দার সম্পাদিত, *থিয়েটারের জলহাওয়া*, প্যাপিরাস পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৭

শেখর সমাদ্দার, *পিটার ব্রুক : ভূমি থেকে আকাশে*, নবগ্রন্থ কুটির, কলকাতা ১৯৯৬

শিশিরকুমার দাশ, *কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল*, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৭৭

সৈকত আজগর, *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯

সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,
ঢাকা ১৯৯৫

Alison Hodge (Edited), *Twentieth Century Actor Training,* Routledge, New York 2002

Augusto Boal, *Theatre of the Oppressed,* Pluto Press, London 1979

Constantin Stanislavsky, An *Actor Prepares,* Routledge, London 1989

Constantin Stanislavsky, *Building a Character,* Max Reinhardt Ltd, Great Britain 1989

Constantin Stanislavsky, *Creating A Role,* Theatre Arts Books Ltd, USA 1997

Constantin Stanislavsky, *My Life in Art,* Penguin, UK 1967

Jerzy Grotowski, *Towards a Poor Theatre,* Odin Theatre Holstebro, Denmark 1968

Linda Pinnell, *Getting Started in Theatre,* National Textbook Company, USA 1995

Lioyd Anton Frerer, *Directing for the Stage,* NTC Publishing Group, USA 1996

Oscar G. Brockett, *The Theatre, An Introduction,* Holt, Rinehart And Winston, Inc, New York 1979

Richard Schechner, *Performance Studies: An Introduction,* Second edition, Routledge, USA 2007

Robert Cohen, *Theatre,* Mayfield Publishing Company, California 1981

Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity:Indigenous Theatre of Bangladesh,* The University Press Limited, Dhaka 2000

সাক্ষাৎকার

আতাউর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২০-০৭-২০১৫, বাড়ি এ/৩, ফ্লাট ২৫, সেগুনবাগিচা এস্টেট, ঢাকা ১২১৭

আতাউর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৭-০৭-২০১৫, বাড়ি এ/৩, ফ্লাট ২৫, সেগুনবাগিচা এস্টেট, ঢাকা ১২১৭

মামুনুর রশীদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ০৪-০৬-২০১৬, বাড়ি ৯৭, রোড ৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

মামুনুর রশীদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ০৬-০৬-২০১৬, কলাভবন, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

মামুনুর রশীদ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১১-০৬-২০১৬, বাড়ি ৯৭, রোড ৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

লাকী ইনাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৩-০৩-২০১৬, সি-১১ বেইলী রিজ, ১ নাটক সরণী (নিউ বেইলী রোড), ঢাকা ১০০০

লাকী ইনাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭-০৪-২০১৬, সি-১১ বেইলী রিজ, ১ নাটক সরণী (নিউ বেইলী রোড), ঢাকা ১০০০

ইসরাফিল শাহীন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৯-০৭-২০১৬, বাড়ি ১৯/ডি, দক্ষিণ ফুলার রোড আবাসিক এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ইসরাফিল শাহীন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৩-০৮-২০১৬, বাড়ি ১৯/ডি, দক্ষিণ ফুলার রোড আবাসিক এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ইসরাফিল শাহীন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫-০৮-২০১৬, বাড়ি ১৯/ডি, দক্ষিণ ফুলার রোড আবাসিক এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

পরিশিষ্ট-১

আতাউর রহমান নির্দেশিত নাট্যের নির্বাচিত আলোকচিত্র :

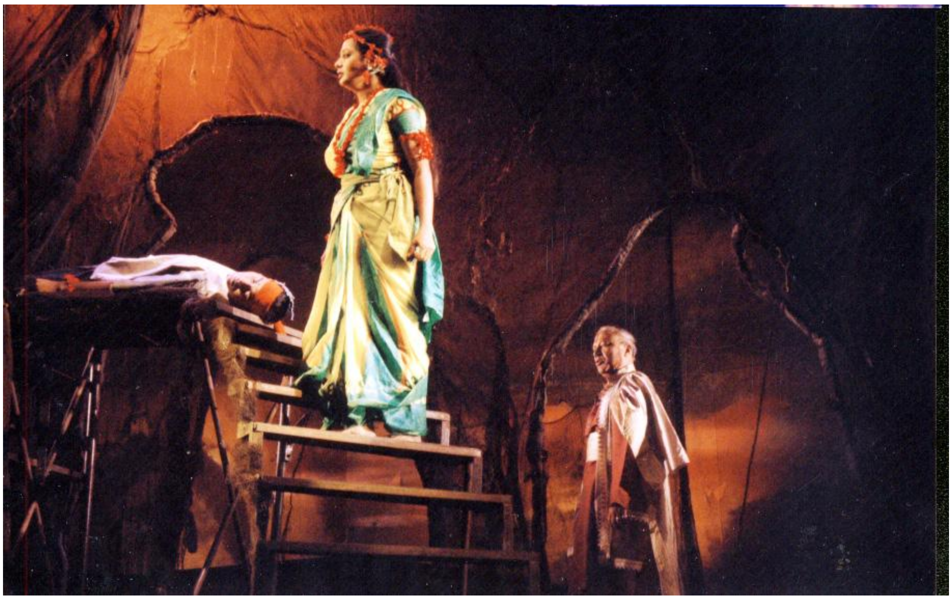

চিত্র : *রক্তকরবী*

চিত্র : *হিম্মতী মা*

চিত্র : *ঈর্ষা*

চিত্র : *বাংলার মাটি বাংলার জল*

চিত্র : গডোর প্রতীক্ষায়

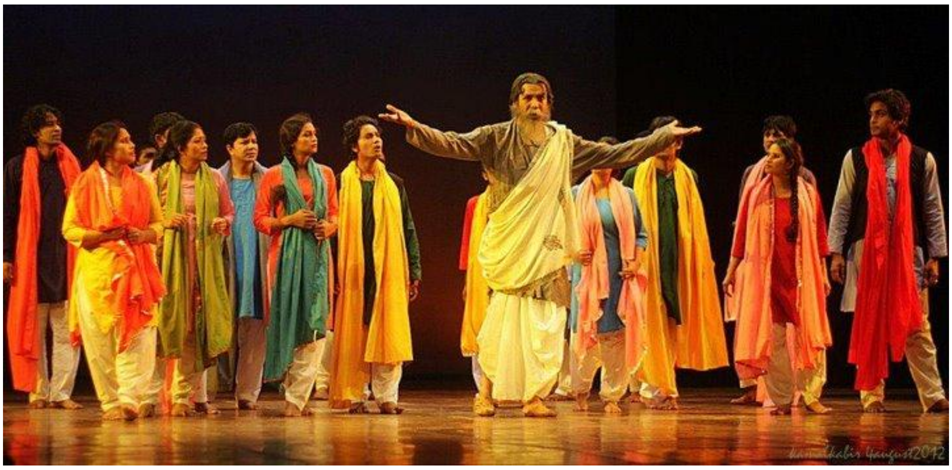

চিত্র : রুদ্র রবি ও জালিয়ানওয়ালাবাগ

চিত্র : ত্রয়লাস ও ক্রেসিদা

চিত্র : অপেক্ষমান

চিত্র : *গ্যালিলিও*

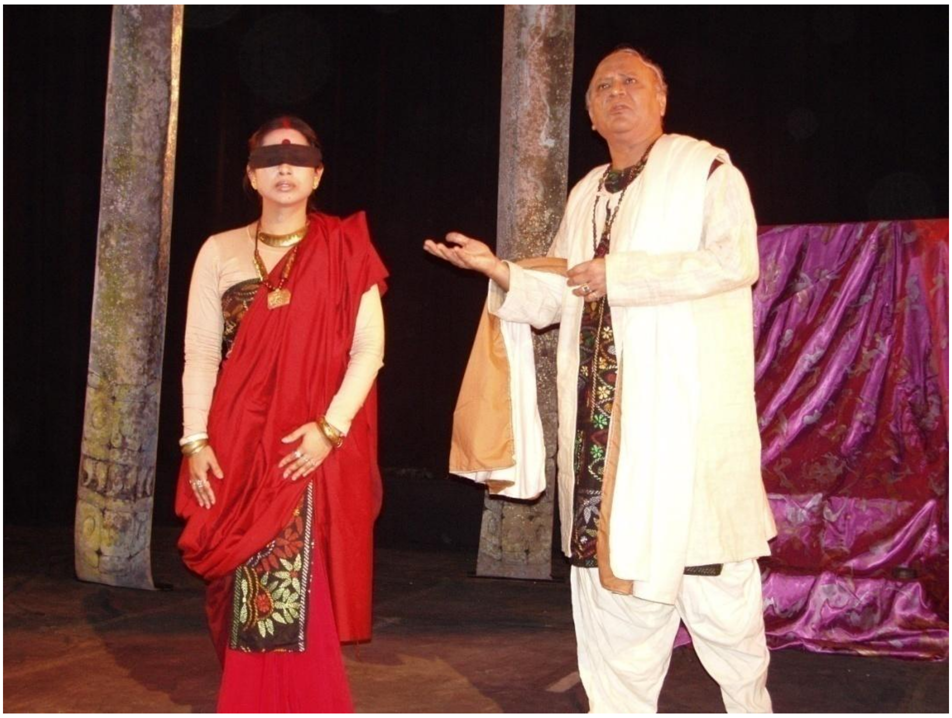

চিত্র : *নাট্যত্রয়ী*

মামুনুর রশীদ নির্দেশিত নাট্যের নির্বাচিত আলোকচিত্র :

চিত্র : *চে'র সাইকেল*

চিত্র : *কোরিওলেনাস*

চিত্র : *নানকার পালা*

চিত্র : *প্রাকৃতজনকথা*

চিত্র : সমতট

চিত্র : কবর

চিত্র : ওরা কদম আলী

চিত্র : সঙক্রান্তি

চিত্র : *রাঢ়াঙ*

চিত্র : *শত্রুগণ*

লাকী ইনাম নির্দেশিত নাট্যের নির্বাচিত আলোকচিত্র :

চিত্র : *গৃহবাসী*

চিত্র : *বিদেহ*

চিত্র : সরমা

চিত্র : পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ

চিত্র : *প্রাগৈতিহাসিক*

চিত্র : *ক্রীতদাসের হাসি*

চিত্র : *প্রাগৈতিহাসিক*

চিত্র : *পুসি বিড়াল ও একজন প্রকৃত মানুষ*

ইসরাফিল শাহীন নির্দেশিত নাট্যের নির্বাচিত আলোকচিত্র :

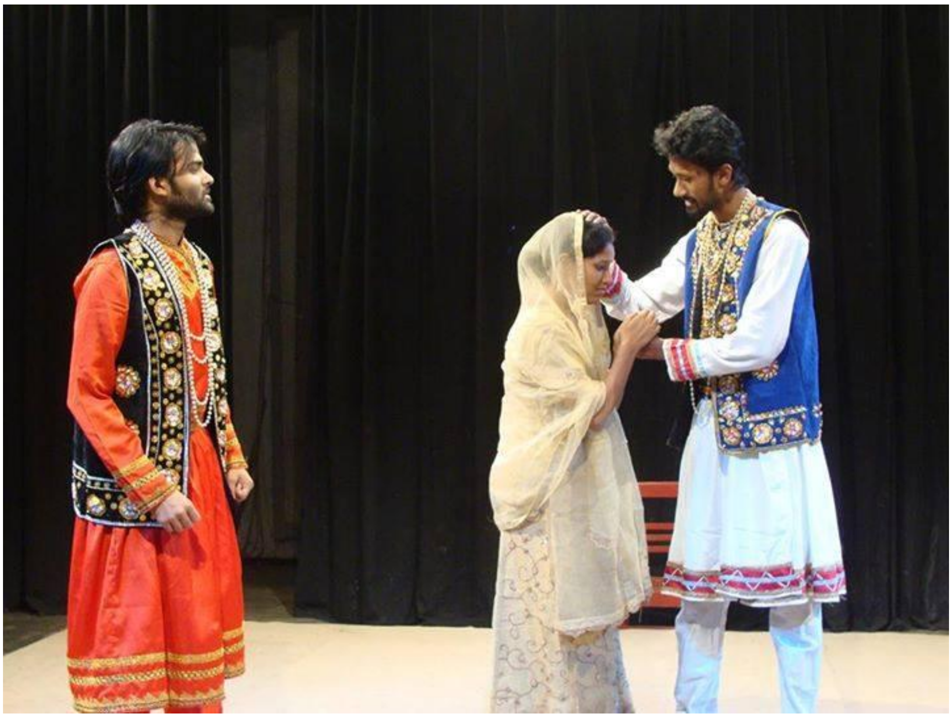

চিত্র : *সোহরাব রুস্তম*

চিত্র : *থ্রি সিস্টার্স*

চিত্র : ওয়েটিং ফর গডো

চিত্র : সাজাহান

চিত্র : *সিদ্ধান্ত*

চিত্র : *ম্যাকবেথ*

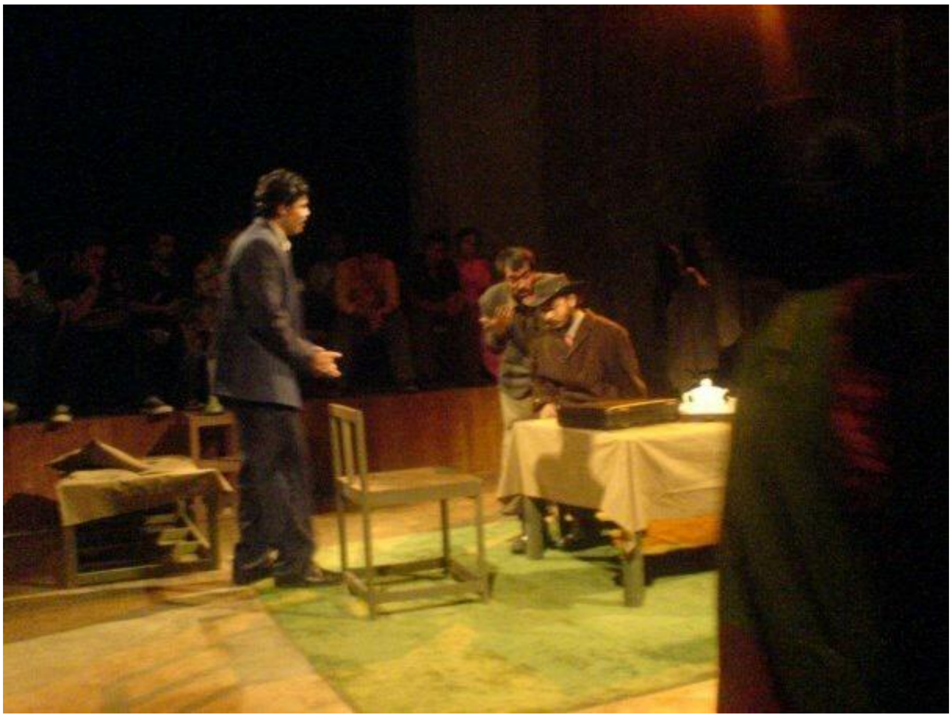

চিত্র : *দ্য বার্থডে পার্টি*

চিত্র : *গোলমাথা চোখামাথা*

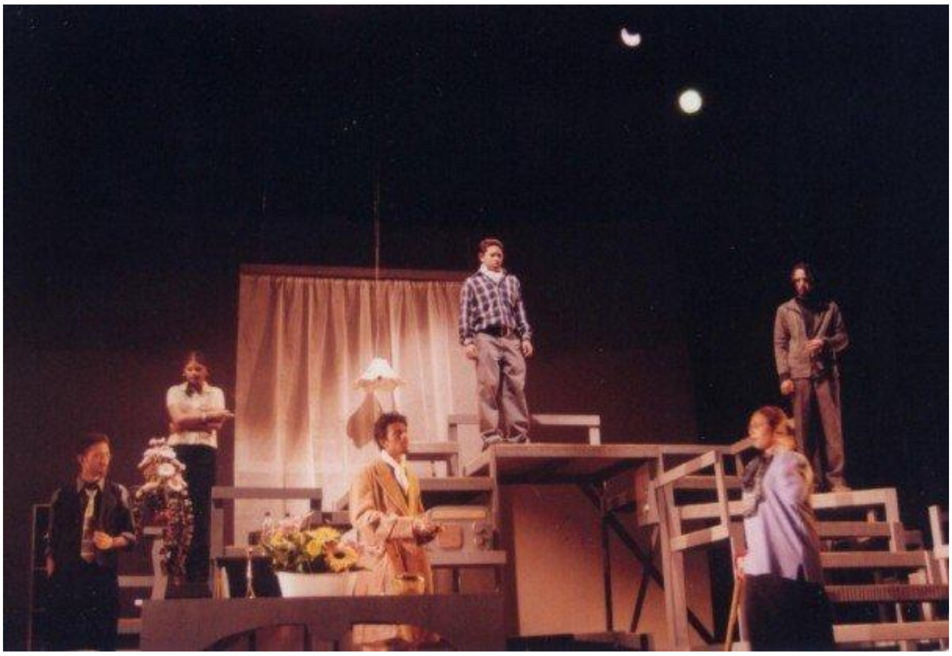

চিত্র : *দ্য মাউসট্রাপ*

চিত্র : *দ্য স্ক্যাপিন*

চিত্র : *সাঁঝবেলার বিলাপ*

চিত্র : *এ ডলস হাউজ*

পরিশিষ্ট-২

পিএইচ. ডি. গবেষণার জন্য বাংলাদেশের চারজন পরিচালকের নির্দেশনা-কৌশল অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালা :

গবেষণার সুবিধার্থে প্রশ্নমালাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন :

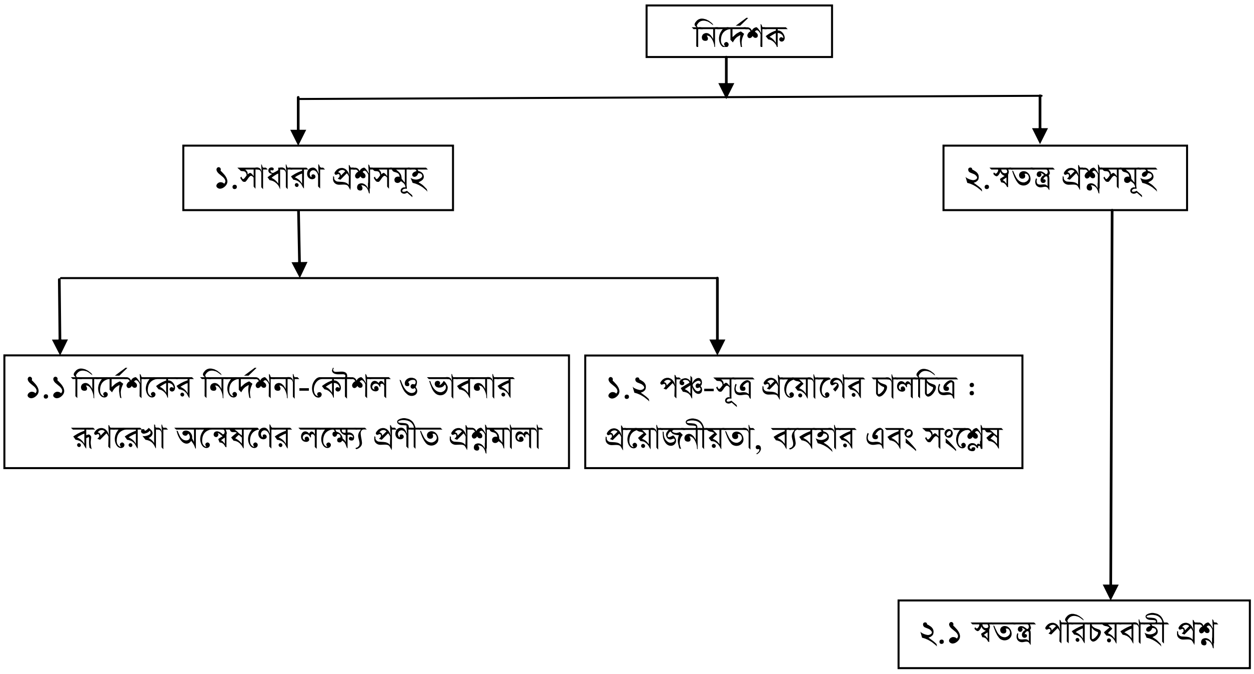

নিম্নের ছক অনুসারে প্রশ্নমালা উল্লেখ করা হলো :

১. সাধারণ প্রশ্নসমূহ

১.১ নির্দেশকের নির্দেশনা-কৌশল ও ভাবনার রূপরেখা অন্বেষণের লক্ষ্যে প্রণীত প্রশ্নমালা–

১. একজন নাট্য-নির্দেশক হিসেবে আপনার শিল্পভাবনা বা দর্শন কী?

২. আপনার নাট্য-নির্দেশনার ভাবনায় জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া কীভাবে ঘটে?

৩. কীভাবে একজন নাট্য-নির্দেশক হয়ে উঠলেন?

৪. নির্দেশক হিসেবে আপনি কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৫. আপনার শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মূল্যায়ন কী?

৬. নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে অন্যান্য নাট্য-নির্দেশকদের চিন্তা বা পদ্ধতির কোনো প্রভাব বা আত্মীকরণ পড়েছে/ঘটেছে কি আপনার কাজের প্রক্রিয়ায়?

৭. আপনার নাট্য-নির্দেশনার কৌশল ও দর্শন উত্তর-প্রজন্মের নির্দেশকদের অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করেছে বলে কি মনে করেন?

৮. বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা ও দর্শকের মনস্তত্ত্বের সাথে আপনার নাট্য-নির্দেশনার প্রক্রিয়া বা আপনার নির্দেশিত নাটক কীভাবে সম্পর্ক রচনা করে?

৯. নির্দেশক হিসেবে আপনি শিল্পের প্রতি, থিয়েটারের প্রতি, জনগণের প্রতি অথবা কোনো ভাবাদর্শের প্রতি– কি কোনো দায়বদ্ধতা অনুভব করেন?

১০. নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বা পাণ্ডুলিপির তাৎপর্য কী?

১১. লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় (ইম্প্রোভাইজেশন ডিভাইস্) মহড়াকক্ষে আবিষ্কৃত বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনটিকে আপনি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন? এই দুটোর কি কোনো সমন্বয় ঘটে আপনার কাজে?

১২. নাটক বা পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের পদ্ধতি কী?

১৩. একটি নির্দিষ্ট নাটক নির্বাচনের পর মহড়া প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে নির্দেশক হিসেবে আপনার প্রস্তুতির কি কোনো দিক থাকে? যদি থাকে তাহলে এ সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা কী?

১৪. চরিত্রভিত্তিক অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের (ট্রাই-আউট এন্ড কাস্‌টিং) ক্ষেত্রে আপনি কি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন?

১৫. মহড়াকক্ষে বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিক উন্মোচন ও চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে আপনি কীভাবে ভূমিকা পালন করেণ?

১৬. মহড়া প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব এবং মহড়ার সময়-সীমা, স্থান, অভিনয়, শিল্পীদের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে

আপনার অভিজ্ঞতা কী?

১৭. নাট্য-নির্দেশক ও নাট্যকারের সম্পর্কের স্বরূপ কী?– আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলেন।

১৮. নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্ক কাজের প্রক্রিয়ায় কেমন থাকে সেই অভিজ্ঞতা যদি বলেন। নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্কের কোনো আদর্শরূপ কি থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

১৯. নির্দেশক হিসেবে ডিজাইনিং কোন প্রক্রিয়ায় পুরো নাট্য-নির্মাণের সাথে মিলিয়ে নেন/সাঙ্গীকৃত করেন/অভিযোজিত করেন– এর ধাপগুলো সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কী?

২০. নির্দেশক ও ডিজাইনারের সম্পর্ক নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা ও অভিমত কী?

২১. প্রথম প্রদর্শনীর পূর্বে কারিগরি প্রদর্শনী এবং তারও পূর্বে রান-থ্রু বা অন্যান্য প্রস্তুতির ধাপগুলো কীভাবে সম্পন্ন করেন?

২২. মহড়া প্রক্রিয়ায় নির্দেশক হিসেবে আপনি কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন? সেই পদ্ধতি কীভাবে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতি কি অনড় নাকি বিবর্তিত হয়েছে? আপনাদের কাজের পদ্ধতির প্রতি অভিনয়শিল্পীদের সাড়া/প্রতিক্রিয়া কেমন, সেটা আপনার অভিজ্ঞতায় কী বলে?

২৩. মহড়ার পর দর্শকের সমীপে নাটকের প্রথম প্রদর্শনী হয়ে যাবার পরও কি নির্দেশক হিসেবে আপনার কাজ থেকে যায় বলে মনে করেন? সেক্ষেত্রে দর্শকের প্রতিক্রিয়া এবং সমালোচক বা বিদগ্ধ রসিকজনের ভাবনা-চিন্তা কি পরবর্তী প্রদর্শনীতে যাবার পূর্বে নতুন সংযোজন-বিয়োজন/সংশোধন-পরিমার্জনে কোনো ভূমিকা রাখেন? নাকি নির্দেশক হিসেবে দর্শক সমালোচকের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আপনার অন্য অবস্থান/দৃষ্টিভঙ্গি আছে?

২৪. মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা, প্রযোজনা-ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ, দর্শক সমাবেশকরণ, প্রচারণা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে কীভাবে কাজ করেন?

২৫. বাংলাদেশের নাট্য-নির্দেশনা বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ কী?

১.২ পঞ্চ-সূত্র প্রয়োগের চালচিত্র : প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার এবং সংশ্লেষ–

১. আপনার নাট্য-নির্দেশনার ফলাফল হিসেবে যে প্রযোজনার রূপ দর্শক প্রত্যক্ষ করে সেটিতে নির্দেশনার কোন সূত্রাবলি প্রতিফলিত হয়? যেমন পাশ্চাত্যের নাট্য-পদ্ধতি/আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারার মৌল-সূত্রগুলোর কোনো সংশ্লেষ আপনার নাট্য-নির্মাণে কী ভূমিকা রাখে?

২. যদি পাশ্চাত্যের নাট্য-পদ্ধতি বা আলেক্সজান্ডার ডিন ও লরেন্স কারা প্রযোজ্য না হয় তাহলে কোনো সূত্র বা পদ্ধতি কি আছে?

৩. আপনি একটি নাটকের বিন্যাস (কম্পোজিশন) বলতে কী ধারণা পোষণ করেন? বিন্যাসের গুরুত্ব আপনার নির্দেশনার ক্ষেত্রে কতটুকু তাৎপর্য বা গুরুত্ব বহন করে? বিন্যাস সংক্রান্ত ভাবনা কীভাবে প্রয়োগ করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৪. আপনি একটি নাটক নির্মাণের স্তরে দৃশ্যায়ন (পিক্‌চারাইজেশন) ধারণাটিকে কীভাবে উপলব্ধি করেন? নাট্য-নির্মাণে এর প্রয়োজনীয়তা আপনার কাছে কতটুকু? আপনি যখন নির্দেশনা দেন তখন কীভাবে দৃশ্যায়িত করেন?

৫. চলন (মুভমেন্ট) সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী? একটি নাট্যসৃজনে চলনকে কি আপনি অপরিহার্য মনে করেন? অভিনেতা-অভিনেত্রী চলন নির্ণয়ে আপনি কোন-কোন প্রেক্ষিতে কাজ করেন?

৬. নাটক (পাণ্ডুলিপি) থেকে প্রযোজনার সৃজন-স্তরে ছন্দ বা সামগ্রিক জীবন-স্পন্দন (রিদম)-কে কীভাবে চিহ্নিত করেন। একটি নাট্যের ছন্দ/সম্পূর্ণ জীবন-স্পন্দন বলতেই-বা কী বোধ করেন আপনি? নাটক থেকে নাট্যে রূপান্তরে ছন্দের নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক প্রয়োগের তাৎপর্য কী? আপনি একটি নাট্যের ছন্দ বা জীবন-স্পন্দন কী প্রক্রিয়ায় সৃজন করেন? সেক্ষেত্রে চরিত্রায়ণের মধ্যে নিহিত ছন্দকে কি বাড়তি মূল্যারোপ করার প্রয়োজন পড়ে?

৭. সরবতা অর্থাৎ সংলাপের বাইরে নির্বাক অভিনয়ের (পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) প্রতিফলন ঘটে আপনার কাজে– সেই 'নির্বাক অভিনয়' ধারণাটিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন? মূকাভিনয় ও নির্বাক অভিনয়ের পার্থক্য আপনার কাজে কীভাবে প্রতীয়মান হয় বা সেই পার্থক্য আদৌ আছে বলে কি আপনি মনে করেন? সংলাপভিত্তিক অভিনয়ের সমান্তরালে কিংবা পূর্বাপর এই নির্বাক অভিনয়ের তাৎপর্য কী? আপনি এর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করেন?

৮. এই পাঁচটি মৌল সূত্রের (কম্পোজিশন, পিক্‌চারাইজেশন, মুভমেন্ট, রিদম, পেন্টোমাইমিক ড্রামাটাইজেশন) পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে নিরূপণ করেন আপনার নাট্য-নির্দেশনায়?

২.স্বতন্ত্র প্রশ্নসমূহ

২.১ স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী প্রশ্ন–

আতাউর রহমান

১. বিশ্ব নাটকের চর্চা অর্থাৎ নির্দেশনার মধ্যে দিয়ে নির্দেশক হিসেবে আপনার একটি স্বতন্ত্র শিল্পসত্তা চিহ্নিত করা যায়– বাংলাদেশের একজন নির্দেশক হিসেবে বাংলা নাটকের বিশ্ববলয়ে বিচরণ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কী? বিশ্ব-নাটকের চর্চা আপনার নির্দেশনাকে কীভাবে নির্মাণ-বিনির্মাণ করে?

২. আপনি বার্টল্ট ব্রেখটের নাটকও নির্দেশনা দিয়েছেন। ব্রেখটের নাটকের রাজনৈতিক তাৎপর্য অতিক্রম করে কেবলি নান্দনিক আনন্দ-বিনোদনের দিকটি অধিকতর মুখ্য হয়ে উঠেছে কি আপনার নির্দেশনায়?

Dhaka University Institutional Repository

৩. রবীন্দ্র-নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে আপনার কৌশল ও ভাবনাসূত্রগুলো কী?
৪. আমরা জানি যে, আপনি চলচ্চিত্র ও সংগীত ভুবনেও বিচরণ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার নাট্য-নির্দেশনায় এই শিল্পমাধ্যমগুলো কি কোনো প্রভাব রাখে? যেমন মহড়াকক্ষে কাজের সময়ে কোনো বিশেষ মূহুর্তের দৃশ্যায়ণে কি ওই সব শিল্পমাধ্যমের প্রতিফলন ঘটে– এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা কেমন?

মামুনুর রশীদ

১. আপনি একজন নাট্যকার। নাটক রচনার ক্ষেত্রে নির্দেশকসত্তা কি উপস্থিত থাকে? আবার, স্বরচিত নাটক নির্দেশনার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিশেষ সুবিধা/অসুবিধা অনুভব করেন?
২. নাটককে শ্রেণিসংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার মনে করেন আপনি। আপনার নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রণে মার্কসবাদী মতাদর্শ স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়। এই নাটকগুলো নির্দেশনার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মঞ্চে যখন চলনে, ছন্দে, দৃশ্যায়নে ও সামগ্রিক বিন্যাসে নাট্যবস্তু মূর্ত করে তোলেন, তখন আপনার কৌশল ও ভাবনাগুলো কী?
৩. নাট্যকার ছাড়াও আপনি একাধারে অভিনেতা, দলপ্রধান, সংগঠক, টিভি-কথক–এই বহুবিধ বৈশিষ্ট্য আপনার নির্দেশনার কাজকে কি আরো লক্ষ্যমুখী করে, না কি প্রতিবন্ধকতাও তৈরি করে– এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী?
৪. মুক্তনাটক চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে আপনি একটি বিশিষ্ট মাত্রা যুক্ত করেছেন। মুক্তনাটকের নির্দেশনা প্রক্রিয়া কী? এর সাথে নাগরিক নাট্যচর্চার পরিসরে আপনি যে নির্দেশনা দেন তার সাথে কৌশলগত ও ভাবনাগত কোনো বৈসাদৃশ্য আছে কী? এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

লাকী ইনাম

১. আপনার নির্দেশিত নাটকগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও নারী– বিশেষত বীরাঙ্গনা নারীদের জীবনালেখ্য একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে। এ ধরনের নাটক নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে আপনার নির্দেশনা-কৌশল ও ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২. একজন নারী হিসেবে নির্দেশনা দিতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনার অভিজ্ঞতা কী হয়েছে? যেমন, নারী হিসেবে একটি নাটকের কোনো দৃশ্যায়নে, চরিত্র-চিত্রণ বা মুভমেন্টে পুরুষ-নির্দেশকের সাথে পার্থক্য হতে পারতো বা হয় বলে কি আপনার কখনো মনে হয়েছে ? নিজের নির্দেশনা-অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলেন?

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাফিল শাহীন

১. আপনার নির্দেশনা-প্রক্রিয়ায় অভিনয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ লক্ষ্য করা যায়। অভিনেতার বহুমাত্রিক সম্ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে আপনার প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে? অভিনয় ও নির্দেশনাকে কীভাবে আপনি একসূত্রে গ্রথিত করেন? পঞ্চ-সূত্র কি সেক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নাকি অভিনয়ের চূড়ান্ত প্রকাশে ভিন্নভাবে তা পরিপূরক ভূমিকা রাখে? যদি রাখে তবে এর নিহিত কৌশল কী?

২. বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্য-নির্দেশনা ও গ্রুপথিয়েটারকেন্দ্রিক নাট্য-নির্দেশনার ক্ষেত্রে আপনার প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা কী?

৩. নাট্য-নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র সম্পর্কে আপনি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রুপ-থিয়েটারে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে নির্দেশনা দিচ্ছেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি কি মনে করেন যে একজন নির্দেশকের পঞ্চ-সূত্র সম্পর্কে পদ্ধতিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

৪. স্তানিস্লাভস্কি ছাড়াও গ্রটস্কি, পিটার ব্রুক, বাদল সরকার, কানহাইলাল বা অন্য কোনো নাট্য-নির্দেশকের কোনো বিশেষ চিন্তা ও কৌশল দ্বারা কি অনুপ্রাণিত?

৫. আপনার নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় প্রসেনিয়াম মঞ্চ, এমন কি অডিটোরিয়াম থেকেও নাটককে বের করে নিয়ে এসে মুক্ত অঙ্গনে বা জনজীবনের বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা থাকে। সেক্ষেত্রে নির্দেশনার তত্ত্ব বা পঞ্চ-সূত্রগুলোকে আপনি কীভাবে মোকাবিলা করেন?

৬. দর্শকের একটি নাটক অনুধাবনের প্রক্রিয়ায় নির্দেশনার পঞ্চ-সূত্র কি কোনো বিশেষ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে?